বহুত্ববাদী পালনবাদী সমাজের অভিভাবক

মহান চির আধুনিক মানব

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)

মাটির মানুষ
সমাজের মানুষ
মোজাদ্দেদ
খোদার মানুষ

নুরের মানুষ
দেশের মানুষ
লোক শিক্ষক
জনগণ দার্শনিক
পৃথিবীর মানুষ

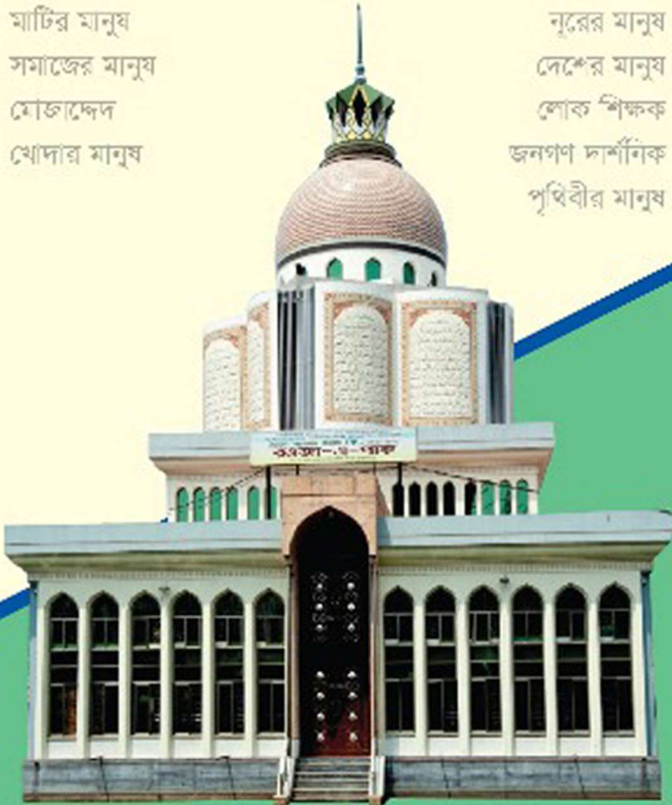

মোঃ মাহবুব উল আলম

বহুত্ববাদী পালনবাদী সমাজের অভিভাবক মহান চির আধুনিক মানব গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা **"আলোকধারা বুক্স"**-এর পক্ষে

প্রকাশক :
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ,
ডাক- ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ :
১০ মাঘ ১৪৩০ বাংলা, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

মুদ্রণ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম– ৪২১২।

পরিবেশনায় আলোকধারা

ISBN: 978-984-8083-35-2

মূল্য: ৫০০ টাকা
মার্কিন ডলার 10 $

Published by Syed Mohammed Hasan on behalf of Alokdhara Books, a concern of Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari Trust, Gausia Huq Manzil, Maizbhandar Sharif. Po. Bhandar Sharif, Fatikchari, Chittagong-4352

উৎসর্গ

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.)
বেলায়ত বাগানের ‘গোলে গোলাব’,
‘সাহেবে জালাল’, ‘আলম-এ-আরওয়াহ্’
ছায়ের করনেওয়ালা গাউসুল আযম
বিল বিরাসত, কুত্‌বুল আকতাব হযরত মওলানা
শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারীর (ক.)
পবিত্র স্মৃতির আলোকধারায়

ঐতিহাসিক প্রত্যয়ন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ্ (ক.) ছাহেবের জীবন ইতিহাস আলোচনায় ও তাঁহার জীবনের অমুল্য কেরামতাবলী এবং রূহানী তাছার্রোফাত প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্য তথ্য সংগ্রহে যাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বইখানা লিখিতে মৌলানা মহাং ফয়জুল্লাহ ভুঁইয়া আমার সংগৃহীত নোট মুলে লিখিয়া দিয়াছেন। মৌং আফছার উদ্দিন আহমদ বি-এল ছাহেব এবং মাষ্টার খায়ের-উল-বশর ছাহেব ভাষা সংশোধন–প্রভৃতি কাজে বইখানায় সক্রিয় সাহায্য করিয়াছেন, তাহারা সকলের প্রতি আমি আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক
১লা চৈত্র, ১৩৭৩ বাংলা

[সঙ্কলন ও প্রকাশনায় মৌলানা শাহ ছুফী ছৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৬৭ ইং]

সহৃদয় পাঠকবর্গ বইখানা পাঠে উপকৃত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি-

ঐতিহাসিক প্রত্যয়ন

ভূমিকা

বিশ্বভুবনের একমাত্র প্রভু পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সমস্ত সৃষ্টজগতকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন করিতেছেন। সকলের উদ্দেশ্য তিনি। সমস্ত প্রশংসা কীর্ত্তন তাঁহার, তাঁহারই প্রতি সকলের গতি ও প্রত্যাবর্তন।

তাঁহারই নূরে সৃজিত প্রিয়তম মানব তাঁহার প্রণয় সংশ্রব হইতে বহুদূরে পর্দার আড়ালে পতিত হওয়ায় পুনঃ সঙ্গলাভে উভয়ের মধ্যে ভীষণ বিচলিত ভাব। তাই পর্দা উন্মোচনে তাঁহার সুমধুর শান্তিময় মিলন অর্জনের জন্য তাঁহার মনোনীত নবী অলি হাদীর একান্ত প্রয়োজন।

কালের দূরত্বে মহান প্রভুর অদর্শনে মানব যখন তাঁহার পরিচিতিজ্ঞান ও প্রেম প্রীতি ভুলিয়া বসে, তখন এই হাদীরাই মানব জগতকে তাঁহার স্মৃতি প্রীতি ও প্রেম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার মিলন পথে পৌছাইয়া দেন।

তাই যুগে যুগে এই মহান নবী অলি-পীর হাদীকূল নানা প্রকার যুগোপযোগী চিত্তাকর্ষক সবল কৌশলি ভাবধারা, কার্য্যকলাপ ও রীতিনীতি দ্বারা মানব জাতীকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রেম পথে আহ্বান করিয়া মানবের সর্বপ্রকার মুক্তি পথের সন্ধান দান করিয়া আসিতেছেন।

কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী জনাব শাহ্ ছুফী হজরত মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.), বিশ্বগুরু তৌহিদ পথের অদ্বিতীয় বাহক, ও মিলনদ্বার উদ্ঘাটক, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ

মুজতবা (দ.) এর প্রতীক, সর্ব্বগুণাধিকারী “আহমদি বেলায়েত” ক্ষমতার ঝাণ্ডাবাহী একমাত্র নিরপেক্ষ বিশ্বজনিন পীরেফায়াল মুক্ত যুগনায়ক।

বিশ্বমানব জগতে পরম করুণাময় খোদাতা'য়ালার অপূর্ব কৃপার নিদর্শন এই মহান গাউছুল আজমের পরিচয় একান্তই দরকার। খোদা সন্ধানী মানব ও এই সহজ সরল আধ্যাত্মিক পথের বাহক সফলকাম যুগহাদীর অনুসন্ধানে ও অনুসরণে, তাঁহার মহত্ত্ব মাহাত্ম্য ভাবধারা জানিতে উদগ্রীব।

এই মহান অলি আল্লাহের পরিচয় দিতে বহু খোদা তত্ত্বজ্ঞানী ভাষাবিদ ভক্ত সহচরগণ আরবী, উর্দু, ফারসী ও বাংলা ভাষায় নানা ভাবে নানা ছন্দে তাঁহার পরিচয় গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। তাই নানা দেশ হইতে হজরতের বাংলায় জীবন চরিত তল্লাসী পত্রসমূহ মাইজভাণ্ডার গাউছিয়া আহমদিয়া মনজিল অফিসে আসিতেছে এবং প্রতিদিন বহু উপস্থিত আগত অভ্যাগত ভক্তবৃন্দ উহা সংগ্রহে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। ভক্ত জায়েরিনগণের উপরোক্ত চাহিদা এবং অনুরোধ, হাদীয়ে কাওনাইন পীরে কামেল সোলতানে আজম হজরতের শুভ ছোহবত প্রাপ্ত সহচর এবং হজরতের একমাত্র উত্তরাধিকারী সাজ্জাদানশীন পৌত্র গাউছে জমান হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন ছাহেবের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি বহুদিন পূর্বে এই দুঃসাহসিক মহান কার্য্যে দৈবযোগে আদিষ্ট হইলেও সুযোগ না ঘটায় উহা কার্যকরি করিতে সক্ষম হই নাই। একদা আমার পীরে তরিকত উক্ত হজরত কর্তৃক প্রকাশ্যে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুমতি ও ইঙ্গিতবাহী হিসাবে তাঁহার সংগৃহীত হজরত আকদাছের অসংখ্য কেরামত ও অলৌকিক ঘটনাবলী হইতে অতি বিশ্বস্ত দীনদার সাহচর্য্য প্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলির বর্ণিত এবং জন সমাজে সুবিদিত কয়েকটী ঘটনার অবিকল সংক্ষিপ্তসার নমুনা আদর্শ স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া হজরতের পবিত্র পরিচয় দেওয়ার চেষ্টায় অত্র গ্রন্থখানি জ্ঞান ও ভাষাহীন অবস্থায় অতি বিনয় ভীত সঙ্কোচিত মনে সম্পাদিত করিয়া হজরতের তথ্য অনুসন্ধানী ভক্ত অনুরক্ত ও সুধী মণ্ডলী সমীপে উপস্থিত করিতে সাহস করিলাম।

খোদাতত্ত্বজ্ঞানী পাঠকগণ তত্ত্বজ্ঞানে উপকৃত হইলে, হজরতের অসীম অনুগ্রহে ও আদর্শবাদী ভক্তগণের শুভ আশীর্বাদে নিজকে ধন্য ও সাফল্য মনে করিব।

এই পবিত্র গ্রন্থখানি, কুতুবে রব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী–জনাব শাহ্ ছুফী হজরত মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) এর উত্তরাধীকারী আমার মুর্শিদে কামেল গাউছে জামান হজরত শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ দেলাওয়ার হোছাইন কেবলার পবিত্র করকমলে সর্বসত্ত্বে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার ও মহান দয়ালু হজরতের অনুমোদনীয় কৃপাবারিতে দোজাহানীয় সফলতা ও চিরদাসত্ব কামনা করিতেছি। আমিন।।

খাদেম–
বিনীত–গ্রন্থকার
মৌলানা মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ ভূঁইয়া
(এম এম গোল্ডমেডালিষ্ট, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা)

* ১৯৬৭ ইং সনে প্রথম প্রকাশকালে লিখিত ভূমিকা

পেশ কালাম

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন ধাপে ধাপে কুল মখলুকাতের বস্তুনিচয় বা ‘কুল্লু শাইয়ুন’ সৃষ্টি করার পর পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে প্রথমে মানুষ সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে ভালো-মন্দের জ্ঞান ইলহাম করেন (৯১ : ৮), অতঃপর তিনিই নিজ অনুগ্রহে আসমান ও জমিনের সব কিছুকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দেন (৪৫ : ১৩); অতঃপর পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য আদর্শ বা ‘শরিয়া’ দান করেন, অতঃপর পার্থিব কাল-পরিক্রমার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে ‘পর্যায়ক্রমে’ নবী-রাসুল প্রেরণ করেন। অতঃপর নবুয়ত-রিসালত ধারার সমাপ্তিতে কালিক চাহিদা পূরণে ‘তাঁর নির্দেশনানুগ মুজাদ্দেদিয়াত সম্পাদনে ‘হাদি’ বা দিশারী (৩২ : ৪২) প্রেরণ করেন। ঈসায়ী ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ (ক.) এই আলোকধারার মহান উত্তরাধিকারী।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এমন এক সময়কালের মানুষ, যখন পৃথিবী অতীতের রোমান উপনিবেশ, পারসিক কায়সারতান্ত্রিক উপনিবেশ, সামন্ততন্ত্র, যাজকতন্ত্র প্রভৃতি অ-গণমুখী শাসন পর্যায় অতিক্রম করে যন্ত্রশিল্পজাত স্ফীত-পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ-প্রশাসন, সংস্কৃতির বন্যায় প্লাবিত পৃথিবীতে মানব সমাজ-সংস্থার নয়া যাত্রার সূত্রপাত ঘটে। স্বৈরতান্ত্রিকতার প্রাচীর বিচূর্ণ হয়ে অন্তত প্রশাসন ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অভিযাত্রার প্রবল সূত্রপাত ঘটে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে উদ্‌গত বর্ণ-ভাষা-বিশ্বাস নির্বিশেষে বহুত্ববাদী কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণের নতুন উদ্যোগ বিশ্বের সর্বত্র উপ্ত হতে থাকে।

বেলায়ত বা মারেফাতের আসন থেকে এর প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার তাগিদ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তিনি এই বেলায়তের মহান ঝাণ্ডাবরদার।

সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয় যে, ত্রিবিধ বেলায়তী ধারা, নবুয়তী ধারার সমন্বয়ে অর্থাৎ জাহের-বাতেন তা'লীমে এরশাদীসহ শরিয়ত, ত্বরিকত, হাকিকত ও মারেফাতের সংমিশ্রণে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা বা বেলায়তরূপী মহাসাগরের উৎপত্তি ঘটেছে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীরূপী উৎস থেকে। এটা ইসলামের মর্মবাদ ও কর্মবাদ প্রকৃতির সমাবেশকারী। জাহেরী-বাতেনী উভয় মানদণ্ডে তিনি জমানার 'যুগ-আওলিয়া বা মোজাদ্দেদ এবং ফরদুল আফরাদ আওলিয়া হন'। বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে জানবার ও উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য মহৎ ব্যক্তিবর্গ, ওলী-আল্লাহ্দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে নব নব রূপে উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত হয়। এই ক্ষেত্রটিতে নির্দিষ্ট সময়ের বিচারে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আমার প্রত্যাশা– বাংলাভাষী তথা বিশ্বের নবতর প্রজন্ম মানবিক জিসমানী ও রুহানী ভূমণ্ডল–নভোমণ্ডলে গবেষণা–কর্ষণ–অভিযান চালিয়ে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র-দিগন্ত আবিষ্কারে সক্ষম হবেন। আমি এই গ্রন্থের গবেষণামূলক অধ্যয়ন বাসনা করি। আমীন!

তারিখ: ২৫.১২.২০২৩ ইং
গাউসিয়া হক মন্জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ,
চট্টগ্রাম।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

প্রাক-কথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১. হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং তাঁকে কেন্দ্র করে বিকশিত মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ তথা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা কেবল হিমালয়ান উপমহাদেশে নয়, এশিয়া তথা বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে অধ্যাত্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি, মানবসমাজ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় প্রভাব বিস্তারকারী লোকমুখী সমকালীন উপযোগী দর্শন ও জীবনবোধ হিসেবে গুরুত্বসহকারে আলোচিত ও চর্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ও বাংলাভাষাভাষী পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়াও গোটা উপমহাদেশে আধুনিক প্রগতিশীল বহুত্ববাদী জীবনবোধের পরিপূরক একটা সমাজ-দর্শন হিসেবেও স্থান করে নিয়েছে। বর্তমান বিশ্ব জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে একটা ভারসাম্যমূলক ও সংঘাতমুক্ত বিশ্ব মানবসমাজ নির্মাণে উদগ্রীব, যা সপ্তম শতকের প্রথম সিকিতে প্রণীত মদীনা-সনদের মর্মবাণী। হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আচরিত জীবন-পদ্ধতি এ-যুগেও প্রত্যাশিত ঐ সমাজ নির্মাণের দার্শনিক, নৈতিক ও ধর্মীয় উপাদান যোগায়। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিরচিত তাসাওউফ দর্শন-গ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্লাকা' এবং তৎকর্তৃক সঙ্কলিত-সংগৃহীত 'হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থে বিংশ-একবিংশ

শতাব্দীর সমাজ ও চেতনার স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য, দৃষ্টান্ত ও পরামর্শ পাওয়া যায়; যা বহুত্ববাদী ভারসাম্যপূর্ণ আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিশা নির্দেশ করে। বর্তমান গ্রন্থটা বিন্যস্ত করতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি দাওরা বা যুগের এই সামাজিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে।

২. (ক) গ্রন্থটা পাঁচ অংশে বিন্যস্ত হয়েছে :

* বর্তমান কালোপযোগী সমীক্ষণমূলক আলোচনা * জীবনী-সংক্ষেপ * হযরতের শানে মহান সাধক-কবিদের শব্দ ও কবিতা পুষ্পাঞ্জলি : মাইজভাণ্ডারী বহুমুখী সাহিত্যের সূচনাপর্ব * শাশ্বত শিক্ষা, * কারামত (আল-কোরআনের বয়ানের আলোকে সংক্ষিপ্ত পটভূমিসহকারে)।

(খ) হযরত আকদাস বলতে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.), 'অছিয়ে গাউসুল আযম' বলতে খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) বলতে গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী বলতে শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে বুঝানো হয়েছে।

(গ) অছিয়ে গাউসুল আযম প্রণীত 'বেলায়তে মোত্লাকা' [তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৭৪ইং তথা 'আলোকধারা বুক্স' কর্তৃক ১১ অক্টোবর ২০২১ইং এই সংস্করণের পুনঃপ্রকাশ] এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনী ও কেরামত গ্রন্থকে [প্রথম প্রকাশন, মার্চ ১৯৬৭ইং তথা 'আলোকধারা বুক্স' কর্তৃক ১১ অক্টোবর ২০২১ইং এই সংস্করণের পুনঃপ্রকাশ] বিভিন্ন তথ্য, ঘটনা ও বিশ্লেষণের আকরগ্রন্থ হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে। এসব তথ্য ও ঘটনার শিক্ষাকে আমাদের বর্তমান সময়ের মানস ও চাহিদার আলোকে প্রক্ষেপণের চেষ্টা করা হয়েছে। অছিয়ে গাউসুল আযম বিরচিত ১১টি (এগারটি) গ্রন্থ ও পুস্তিকার প্রতি আমরা আমাদের ঋত ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ধন্য হতে বাসনা করি। তিনি যে বিশাল প্রেক্ষাপটে হযরত আকদাসকে উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও প্রক্ষেপণ করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে গতিপথ নির্মাণ করেছেন, এই গ্রন্থ তা অনুসরণ

এবং সম্প্রসারণে ব্রতী। বরং বলা যায়, ফলো-আপ বা অনুবর্তন মাত্র। হযরত আকদাসের জীবনী-অংশের বেশ কিছু তথ্য খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী প্রণীত "জীবনী ও কেরামত এবং বেলায়তে মোত্‌লাকা" গ্রন্থ [আলোকধারা বুক্‌স প্রকাশিত, ১১ অক্টোবর, ২০২১ইং] থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে এসব সংবেদনশীল গুরুত্বপূর্ণ জাহেরী ও বাতেনী তথ্যের বয়ানের ধারাবাহিকতা অবিকৃত অবস্থায় পাঠকদের জন্য মওজুদ থাকে। এতে সাফল্য, সার্থকতা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের রহমত, রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহেরবাণী এবং হযরত আকদাস, অছিয়ে গাউসুল আযমসমেত মহান ওলী-আল্লাহ্‌দের দোয়ার মুখাপেক্ষী।

৩. গ্রন্থের 'কারামত' অংশের সূচনায় মুজিজা ও কারামত সম্পর্কে আল-কোরআন, হাদিস শরিফ এবং মহান দার্শনিকদের বিশ্লেষণমূক বয়ান সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে, যাতে মহান ওলী-আল্লাহ্‌দের কারামত সম্পর্কে কোন কোন মহলে বিদ্যমান অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির অপনোদন ঘটানো সহজতর হয়। বিশ্বাস, বাস্তবতা তথা বিজ্ঞান, বাতেনী জ্ঞান ও কল্যাণময়তার বিস্ময়কর সমাহার 'কারামত'। আল-কোরআনের বয়ান অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার কোন সৃষ্টি যেমন অনর্থক, অকারণ ও উদ্দেশ্যহীন নয়; তেমনি 'কারামত' যেহেতু যথোপযুক্ত বান্দার প্রতি তাঁরই সবিশেষ অনুগ্রহ, সেহেতু তা কল্যাণময় উদ্দেশ্যে অর্থপূর্ণ অবদান, অনুগ্রহ।

৪. মূল গ্রন্থের বয়ানে যাবার পূর্বে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের দর্শন, সংস্কৃতি, আচার, শিক্ষা, ব্যবহারিক দৈনিন্দিন জীবনের রূপরেখা বিনির্মাণে অছিয়ে গাউসুল আযমের পরিশ্রম ও সাধনাসাপেক্ষ অনবদ্য অবদানের বিষয় আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে আবার স্মরণ করছি। হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে এই বিশাল সড়ক নির্মাণের তাত্ত্বিক, দার্শনিক, প্রয়োগিক উপাদান-উপকরণ সরবরাহকল্পে তিনি যে বহুমাত্রিক সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোই আমাদের মতো নবীনদের ও আগামী প্রজন্মের নবাগতদের বাতিঘর হিসেবে বিরাজ করবে। আল্লাহ্ তাঁকে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের মাটিতে বাংলা ভাষায় এমন ওজনদার মৌলিক সৃষ্টির 'যাযাউল এহসান' বর্ষণ করুন।

উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আকদাসের জাহেরী ও বাতেনী উভয় সত্তার সম্যক চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর জাহেরী জীবনের যে সব বৈশিষ্ট্য, কর্ম ও আচরণ এই একবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রশিল্প, ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল সমাজ জীবনেও বাঞ্ছিত মানবিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়, সেগুলোকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে:– (ক) তাইয়্যে আরদ্ ও তাইয়ে যমান (দূরত্ব ও কাল সঙ্কোচন) এস্তেমালের আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ (বাতেনী সত্তা); (খ) মানব সমাজের দুরারোগ্য ক্যান্সার, যথা স্থূল নফ্সানী প্রবৃত্তি, প্রবল ভোগ-বিলাস প্রবণতা তথা প্রবৃত্তিপূজা প্রত্যাখ্যান (উসুলে সাবআ: জাহেরী শিক্ষা-সত্তা তথা জেহাদে আকবরের অনুশীলন)। প্রবৃত্তি পূজাই তো সকল কুফরের দুর্গ। (গ) রবুবিয়াত বা পালনবাদী নীতি চর্চা, যা আধুনিক বহুত্ববাদী অসাম্প্রদায়িক, অভাবমুক্ত, মানবতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্র রচনা করে (জাহেরী); (ঘ) মানবিক-সামাজিক সমতাবাদ (egalitarianism) চর্চা (জাহেরী), (ঙ) পবিত্র ও মানসিক উন্নয়নমুখী সঙ্গীত চর্চা (জাহেরী); (চ) প্রয়োজনীয় মাসায়েলা শিক্ষা ও চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ (জাহেরী), (ছ) শরিয়তের পায়রবী করার সতত তাগিদ (জাহেরী), (জ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কল্যাণমূলক নীতিমালা শিক্ষা ও চর্চা এবং আর্থিক-সামাজিক শ্রেণিগতভাবে অসহায়-শ্রমজীবী উম্মি মানুষের প্রতি ঈমানী ও দুনিয়াবী কর্তব্যবোধ (জাহেরী)।

এসব বিষয় সংক্ষেপে এ পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ), হিমালয়ান উপমহাদেশ ও বিশ্বের রাজনীতি-সমাজনীতির প্রেক্ষাপটে ও অভিজ্ঞতার আলোকে হযরত আকদাসকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাজানো সূত্রাবলীর অনুসরণে আমাদের বর্তমান সময়কার সম্প্রসারিত পটভূমিকায় তাঁকে অধ্যয়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অনুসারী-অনুরাগীরা নিজেরাই নিজেদের আক্ল ও বিবেচনা অনুসারে ত্বরিকতের পথে চলার সহজ দিশা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন। 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত' মুহাম্মদী শরিয়তের উপরই জোর দেয় ও নির্ভর করে। 'শরিয়তের খোসা'র মোড়কে মারিফতের 'শাঁস' সুরক্ষিত'–আল-কোরআনের এই সূক্ষ্ম অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষার দুয়ার উন্মোচনের কর্তব্য পালন করে গেছেন হযরত আকদাস এবং তাঁর সার্থক ভাষ্যকার অছিয়ে গাউসুল

আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তথ্যের মূল উৎসের যথার্থতা ও অবিমিশ্রতা রক্ষার জন্য বিশেষ করে অছিয়ে গাউসুল আযম কর্তৃক বিরচিত/ প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে অনুসৃত বাংলা সাধু/চলিত ক্রিয়ারীতিতেও কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি।

৫. এখনো আমার চোখে ভাসে, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের পূর্ব-দুয়ারী খোলা বারান্দায় অর্ধশায়িত অবস্থায় শুভ্র ফতুয়া পরিহিত এক জ্যোতির্ময় মানব অপলক চোখে সম্মুখস্থ হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রওজা মোবারক, ঊর্ধ্বে বিস্তৃত অন্তহীন আসমান এবং নিম্নে মাটির পৃথিবী ও তার উপর সঞ্চরমান প্রাণসত্তাগুলোকে নিবিষ্ট, অচঞ্চল, ধ্যানী চিত্তে নিরীক্ষণ ও অধ্যয়ন করছেন। দর্শন জগতে ক্ষণজন্মা বঙ্গজ সন্তান, নির্মোহ, স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর সাধনাপরাছু ফকির লালন সাঁইয়ের (১৭৭৪/১৭৭৭-১৮৯০ খ্রি.) ৭০ বছর পর ১৯৬০ খ্রি. ইং সনে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের চেরাগ হাতে ভারিক্কি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় কণ্টকিত দর্শনের সড়কের অভিযাত্রী হিসেবে দৃশ্যমান হলেন আরেক বঙ্গজ সন্তান খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তাঁদের অনির্বাণ সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা-ভাবনা বাংলা হরফে সুবিন্যস্ত হয়ে আলো ছড়াচ্ছে।

বিস্ময়ের সাথে স্বীকার করতে হয় যে, হযরত আকদাসের ওফাতের দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর পরে প্রামাণ্য তথ্যসহকারে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বর্ণিত ওয়াকেয়া বা ঘটনা বা কারামতসমূহ নিরেট বাস্তবতার মানদণ্ডে প্রামাণ্যভাবে উত্তীর্ণ। কারামতের কিছু তথ্য তিনি নিয়েছেন মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (র.) প্রণীত 'আয়নায়ে বারী' গ্রন্থ থেকে। এসব ঘটনার তথ্য সংগ্রাহক ও সঙ্কলক তিনি নিজেই। এমনকি যুক্তিশাস্ত্র ও প্রতিবেদন-বিবরণে আইনী কোন বিচ্যুতি কিম্বা ফাঁক-ফোকড়ের অবকাশ তিনি এখানে রাখেননি। জনান্তিকে সংঘটিত এসব কারামত নিটোল তথ্যসহকারে চয়ন করা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। এতে তাঁর নিষ্ঠা, পরিশ্রম, মারেফাতের বিজ্ঞান জগতে তাঁর বিচরণের ব্যাপকতা, তাঁর রূহানী উরুয, হযরত আকদাসের প্রতি তাঁর প্রবল নিষ্ঠা, আনুগত্য, শ্রদ্ধাবোধ এবং জ্ঞান-অন্বেষার উজ্জ্বল পরিচয় বিম্বিত। এই মহৎ কাজের আঞ্জাম দিয়ে মারেফাত জগৎ, বাংলাদেশের

অধ্যাত্মভুবনের যে খেদমত তিনি করেছেন, তা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত সজীব ও ক্রিয়াশীল থাকবে। আমরা বর্তমান প্রজন্ম তাঁর এই মহতী অবদানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁর এই মহান কর্মের দ্বারা উপকৃত হবে।

এই মহান 'হাস্তির' গভীরতা ও ব্যাপকতা অপরিমাপ্য। প্রকাশ্যে, তিনি অতি সাধারণ এক দুনিয়াদার সংসারী মানুষ! একই সাথে অন্যদিকে হযরত আকদাসের রেখে যাওয়া আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত-সম্পদের কঠোর, বিশ্বস্ত আমানতদার। 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থ রচনায় তাঁর অন্যতম দার্শনিক উৎস শায়খুল আকবর হযরত মহীউদ্দিন ইবনু আরাবীর (র.) 'আওয়ারিফ' পুস্তকে বর্ণিত ঈষৎ আলোকচ্ছটা প্রক্ষেপণে তাঁর সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা হয়তো সম্ভব: "কারামত ও খাওয়ারেক আল্লাহ্র দান। কখনো কখনো এরূপ হয় যে, কোনো কোনো ব্যক্তিকে তিনি কাশ্ফ ও কারামত দ্বারা সম্মানিত করেন এবং এই নিয়ামত দান করেন। কখনো কখনো এমনও হয় যে, তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি বড়ই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কাশ্ফ ও কারামত সাধারণ লোকচক্ষুতে অপরিদৃষ্ট থাকে। কেননা, কারামত দান করা হয় ইয়াকিন (হক্কুল ইয়াকিন বা ধ্রুব সত্য) অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য। যিনি খাঁটি ইয়াকিন হাসিল করেছেন, তার জন্য কারামতের কী প্রয়োজন?"[১] অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে নিরীক্ষণে হযরত শায়খুল আকবরের এই পর্যবেক্ষণ অন্যতম কষ্টিপাথর বটে।

এই পুস্তক প্রণয়নে বিভিন্ন বিষয়ের কালোপযোগী প্রক্ষেপণের ব্যাপারে পরামর্শ এগিয়ে দিয়েছেন গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম. জি. আ.)। প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে পরিমার্জন, প্রুফ নিরীক্ষণ প্রভৃতি আনুষাঙ্গিক কাজে আন্তরিকতা সহকারে অংশ নিয়েছেন অধ্যাপক জহুর উল আলম, মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান টুটুল, মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

আমার ক্ষুদ্র অনুল্লেখযোগ্য কর্মজীবনে আনাড়ী চলার পথে বহু চড়াই-উতড়াই অতিক্রম শেষে পেশাগত ক্ষেত্রে ১৯৭০ইং সনে সাংবাদিকতায় থিতু হবার প্রায় ৪৫ বছর পর ২৮-০২-২০১৫ ইং সনে অপ্রত্যাশিত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে ছিটকে পড়ার পর নিবিড় অধ্যয়ন এবং মনোমত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে সকল

প্রকার বঞ্চনা-বেদনার যাতনা দূরে ঠেলে রাখার ব্রত গ্রহণ করি। সাংবাদিকতা আমার অধ্যয়ন স্পৃহা, গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে নয়া দিগন্ত সৃজনের অবলম্বন হিসেবেও বিদ্যমান থেকেছে। প্রত্যক্ষ পেশাবিহীন এ অবস্থায় নিরন্তর অধ্যয়ন ও গবেষণামূলক সৃজনশীল পরিশ্রম-পরিচালনায় যে প্রশান্ত স্থিতিশীল অবস্থা ও পরিবেশ প্রয়োজন, তার অব্যাহত যোগান দিয়েছিলেন আমার শান্ত বিনয়ী স্বল্পভাষী ধৈর্য্যশীলা পরিমিতিপূর্ণ জীবনাচারী জীবনসঙ্গীনি লুৎফুন্নাহার বেগম, যিনি অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে ২৬ আগস্ট ২০২৩ইং মোতাবেক ১১ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ০৮ সফর ১৪২৫ হিজরী রোজ শনিবার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছায় দুনিয়া ত্যাগ করে জান্নাতবাসিনী হন। প্রচলিত মানদণ্ডে রত্নগর্ভা এই মহিলার তিন সন্তানের মধ্যে প্রথমজন ড. হাসনে আয়মুন, অর্থনীতিতে পিএইচডি; দ্বিতীয়জন অ্যাডভোকেট জাকিয়া আয়মুন এম. এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, একমাত্র পুত্র প্রফেসর মোহাম্মদ জিবরান আলম এম. ফিল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, একমাত্র পুত্রবধূ প্রফেসর ফাহমিদা বিনতে ওয়ালী, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম-(ইউএসটিসি) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ; (এস এস সি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে মেধা তালিকায় শীর্ষতম স্থানে থাকার গৌরব অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদকে ভূষিতা) এবং সন্তানপ্রতিম অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম সাদী ও মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাসান সি. এম. এ-এর নীরব-নিস্তব্ধ ধৈর্য্যপূর্ণ, সর্বক্ষেত্রে প্রমিত সহযোগিতা ব্যতীত 'শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)' তথা মাইজভাণ্ডার শরিফের তত্ত্ব ও দর্শনের' নব নব সূক্ষ্ম আলোককণার সন্ধানে লেগে থাকা হয়তো সম্ভব হতো না। হয়তো পারতাম না মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সারবস্তু 'ফজিলতে রব্বানী', 'খেলাফতে রব্বানী' প্রভৃতি দুরূহ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে। আমার পত্নীসহ তাঁরা সবাই আমার অনিশ্চিত ঝুঁকিপূর্ণ সংকটকালে যেন বাস্তবে আমার 'সঞ্চয়ী-চলিত হিসাব' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার পত্নী আজ আমার পাশে নেই। তবে এই মহৎ পুস্তকের প্রকাশনা ক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর রুহের মাগফেরাত করি। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাত নসিব করুন; আমিন!

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন, সরোয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মুজতবা (দ.), হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.), হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন, আমিন!

মোঃ মাহবুব উল আলম
কুলসুমা ভিলা,
৩৪, চট্টগ্রাম সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটি,
বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ–৪২১০।
ই-মেইল m.alam71@yahoo.com

টীকা: ১. (ক) "হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহে (১ম খণ্ড)", পৃ: ২৭২, প্রফেসর এ. এফ. এম, আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান, দ্বিতীয় (ইফাবা প্রথম) সংস্করণ, ২০০১, ঢাকা।

(খ) ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ; কারামত: পৃ: ৪৫৭, কাশ্‌ফ: পৃ: ৫৯৭।

সূচীপত্র

প্রাক-কথন ১৩

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও অর্জন ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বহুত্ববাদী পালনবাদী সমাজে কল্যাণময়তার হলোগ্রাম হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

মুজাদ্দেদিয়াতের মহাসড়কে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্যান্সার প্রবৃত্তি-পূজা বিলোপন কর্মসূচি ৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

বহুত্ববাদী সমাজের অনুশীলন ক্ষেত্র ৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল-কোরআন, হাদিস শরিফের মহৎ শিক্ষার সজীব সক্রিয়াতাই তাঁর তাসাওউফ ও ব্যবহারিক জীবন-সাধনা ৮৭

দ্বিতীয় ভাগ

জীবনী-সংক্ষেপ

পবিত্র আগমনী পূর্বাভাস ৯৯
শিক্ষা জীবন ১০১
পেশাগত কর্মজীবনে প্রবেশ ১০২
মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (র.)-এর জীবন ধারার সাথে সাযুজ্য ১০৩
হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক উরুজ অর্জন ১০৫
কঠোরতর রিয়াজত ১০৬
বিবাহ-সংসার জীবন ও সন্তান-সন্ততি ১০৭
দুনিয়াবী বঞ্চনা ১০৯
বেলায়তের প্রথম প্রকাশ ও ফতুহাত আরম্ভ ১১০
'তাওয়াক্কুলের সুদৃঢ় রজ্জুই তাঁর উপার্জনের একমাত্র প্রচেষ্টা ১১০
নুরানী ব্যক্তিত্ব ও কারামত সম্পন্ন আউলিয়া সত্তার বিস্তার, পার্থিব কল্যাণময়তার ঢল ১১২
শরিয়তের পায়রবী ১১৫

ব্যবহারিক জীবনের কিছু নমুনা

পারিবারিক "মোয়ামেলাতে" হযরতের আপোষ ভাব ১১৭
অতিব্যয়, অতি আনন্দ, গতানুগতিক সংসার ধর্মে অনাসক্তি এবং আল-কোরআনের নীতি অনুযায়ী সঞ্চয়ে অনাসক্তি ১১৮
হযরতের পরদুঃখ কাতরতা ১১৮
সকলের প্রতি হযরতের দয়ার্দ্রচিত্ততা ও শিষ্টাচারিতা ১২০
বিলাসী পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধানে হযরতের অসম্মতি ১২০
হযরত আকদাসের শারীরিক বিবরণ ১২১
সময়মত আবশ্যকীয় সওগাত ১২১
হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ১২১
হযরতের নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবাজান কেবলার প্রতি ফয়েজ বর্ষণ ও খেলাফত স্বীকৃতি ১২২
একমাত্র পৌত্র শাহ্ সুফি মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রতি আধ্যাত্মিক সু-নজর এবং অনুরাগ ও প্রীতির নিদর্শন ১২৩

(হযরতের) পৌত্রের শানে রহস্যপূর্ণ ভবিষ্যতবাণী ১২৪
হযরতের গাউসিয়ত স্বীকৃতি ১২৪
হযরতের উত্তরাধিকারী খলিফা নির্ণয় ও গদী অর্পণ ১২৫
হযরতের পৌত্রের মর্যাদা নির্দেশে তাঁর নবী অবয়বতার পরিচিতি ১২৬
শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অধ্যাত্ম উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ১২৬
হযরতের ওয়ারেছ ১২৭
হযরতের ওফাত ও আল্লাহ্তায়ালার মহাজাতে মিলন ১২৮
হযরতের সানে মৌলানা জুলফিকার আলী সাহেবের নাতিয়া ১৩১
হযরত আকদাসের বেলায়তপ্রাপ্ত প্রধান খলিফাদের নাম ১৩৪
হযরত আকদাসের ত্বরিকত পরিচয় ১৩৯
বিশ্বময় তাসাওউফসহ দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন স্তরে নিত্য ব্যবহৃত কতিপয় আরবি-ফার্সি পরিভাষার বাংলা অর্থ ১৪৩

তৃতীয় ভাগ
মাইজভাণ্ডারী বহুমুখী সাহিত্যের সূচনাপর্ব

হযরতের শানে মহান সাধক-কবিদের শব্দ ও কবিতা পুষ্পাঞ্জলি ১৪৭
অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জবানীতে মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য উদ্যানের উদ্গাম প্রসঙ্গ ১৫০
মৌলভী আছুব আলীর অপূর্ব কবিতা ১৫১
আজ তোফায়েল আহমদ নাইয়র রেঙ্গুনি ১৫২
উকিল বাবুর প্রেরিত কলা রাখিয়া দুগ্ধ ফেরত ১৫৭
প্রসিদ্ধ গায়ক গুরুদাস ১৫৯
হযরতের শানে মৌলানা জুলফিকার আলী সাহেবের নাতিয়া ১৬০
মওলানা শাহ্ সুফি ছফীউল্লাহ্ ১৬০
মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী ১৬১
মওলানা আমিনুল হক ফরহাবাদাবী ১৬৪
মওলানা ছৈয়দ আজিজুল হক আলকাদেরী শেরে বাংলা ১৬৬
মওলানা মোহাম্মদ শফী ১৬৯
মৌলবী নজির আহমদ সাহেব ১৭০

আবদুর রহমান তেলাওয়ালা ১৭০
হাফেজ দৌলত খাঁ ১৭১
মওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মদনী (র.) ১৭২
মৌলানা হাফেজ সৈয়দ আহমদ ছিরিকুটি (র.) ১৭৩
মৌলানা আবদুল হক মরিয়ম নগরী ১৭৩
মাওলানা হাফেজ আহমদ, মৌলানা শাহাবুদ্দিন, গাজীপুরী শাহ্ ছাহেব ও মোহাজেরে মক্কী ১৭৪
তৈলঙ্গ স্বামী, তারাচরণ সাধু ১৭৪
শ্রদ্ধাস্মারক প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা ১৭৫
মমতাজুল মোহাদ্দেসীন মৌলানা ওবায়দুল আকবর এম.এ কলিকাতা ১৭৬
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র সিংহ ১৭৭
এম. নুরুল ইসলাম ফাজেলে আলীম (১ম শ্রেণি) ১৭৮

চতুর্থ ভাগ
শাশ্বত শিক্ষা

উসুলে সাবআ [সপ্ত পদ্ধতি] ১৮৫
হযরতের কিছু শাশ্বত শিক্ষ.. ২০২

পঞ্চম ভাগ
কারামত

কারামত [তত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত] ২০৭
আল- কোরআন, হাদিস এবং চাক্ষুষ প্রামাণ্য বাস্তব ঘটনার নিরিখে কারামত ২১৩
এবার হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন-ক্ষেত্র অবলোকন করা যাক ২১৮
তাইয়্যে যমান ও তাইয়্যে আরদ্ সংশ্লিষ্ট কারামতের আরও কয়েকটা বাস্তব ঘটনা ২২০
হযরত কর্তৃক স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হইতে নিরাপদ রাখার আভাস ও অভয়দান ২৩৬
উপসংহার ২৩৯

প্রথম ভাগ

(সমীক্ষণমূলক আলোচনা)

প্রথম অধ্যায়

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও অর্জন

১. হযরত আকদাসের বৈশিষ্ট্য

হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) [হযরত আকদাস]-এর মধ্যে বেলায়তের চার প্রকার বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান বলে বিজ্ঞ আলেম-উলামা-মাশায়েখ–ধর্ম তাত্ত্বিক দার্শনিক মহলের সমীক্ষণ সঞ্জাত অভিমত। সেগুলো হলো: (ক) তিনি বেলায়ত-বিল-আসালত, অর্থাৎ মাদারজাত বা জন্মগতভাবেই ওলী, (খ) বেলায়ত-বিল-বিরাসত বা খেলাফত প্রাপ্তিমূলে ওলী [পীরানে পীর দস্তগীর গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (র.) বংশধর ও কাদেরিয়া ত্বরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত গাউসে কাওনাইন হযরত সৈয়দ আবু শাহ্মা মোহাম্মদ সালেহ কাদেরী লাহোরী (র.) ও তাঁর অগ্রজ চিরকুমার শাহ্ সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (র.) সূত্রে ফয়েজ ও কামালিয়াত অর্জন]; (গ) বেলায়ত-বিদ-দারাসাত বা জাহেরী বিদ্যালব্ধ জ্ঞানসমৃদ্ধ ওলী, [সমকালীন প্রথম কাতারের মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্ররূপে সপ্রমাণিত এবং এর অগ্রধাপ হিসেবে রূহানী উৎসে প্রাপ্ত জ্ঞানমূলে ফয়েজে এত্তেহাদী ও ইল্মে লাদুন্নী হাসিল, অর্থাৎ যথোপযুক্ত বহুমাত্রিক শিক্ষার ফসলরূপী বেলায়ত-বিদ-দারাসাত অর্জন], (ঘ) বেলায়ত বিল-মালামত বা স্থূল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণপূর্বক মোখালেফাতে নফ্স হাসিলকারী মোজাহেদা-মোশাহেদার কঠোর সংযম সাধনাসিদ্ধ ওলী।[১] অতএব, তিনি বেলায়ত-বিল-আসালত, বিল-বিরাসত, বিদ্-দারাসাত, বিল-মালামাত অর্থাৎ সকল মানদণ্ডে স্বীকৃত মহান ওলী-আল্লাহ্।

২. মানব সমাজের ক্যান্সার ‘স্থুল প্রবৃত্তি’ পূজার মোকাবেলা

উপরোক্ত চারটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম দুটো নিতান্তই রূহানী ব্যাপার। তৃতীয়টা জাহেরী বিষয় সংশ্লিষ্ট। তবে এর শেকড় রূহানী মূলের সাথে যুক্ত। মানুষ দৃশ্যতঃ সমান হলেও সততা, বিদ্যাবত্তা বা জ্ঞানই গুণগত পার্থক্য ও বিভিন্নতার সূচক। চতুর্থ বিষয়টা জাগতিক ব্যাপার। তবে ধূলিমলিন বৃক্ষের শিরোপরি সুশোভন সুন্দর অমলিন পুষ্পের মতো বিশেষ একটা ব্যাপার, যা আকর্ষণীয় এবং মঙ্গলার্থে অনুসরণীয়।

ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, চলমান একবিংশ শতাব্দীর মানব সমাজই কেবল নয়, মানব সমাজের প্রতিটা অধ্যায়ে প্রয়োজন বহির্ভূত স্রেফ ভোগপ্রবৃত্তি প্রবণতার তাড়না মানব সমাজকে অবক্ষয়, বিপর্যয়, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-জুলুম-পীড়নের আবর্জনায় দূষিত ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। মহান নবী-রাসুলগণ, স্বার্থলেষকূন্য দার্শনিকবৃন্দ, সমাজ-সেবকগণ সততা ও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সহাবস্থানের বাণী প্রচার করেছিলেন এবং নৈতিক-সমাজ (moral society) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ ‘নিজামে হাস্তি’ (order of life) কামনা করেছিলেন। কিন্তু মানবজাতির পার্থিব প্রাচুর্য ও সুখভোগী অংশ নিতান্তই আত্মসর্বস্ব ভোগবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে যুগপৎ নিজের ও বিশ্ব সমাজের ক্ষতি করছে। আল-কোরআনের ভাষায় এরা নিজেকে ‘অমুখাপেক্ষী’ মনে করে সীমালংঘন করেছে (৯৬:৭)। তারা পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকালের স্বতঃসিদ্ধ সীমাবদ্ধতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পার্থিব জগৎটাকে জাহান্নামে পরিণত করে যায়। মহান নবী-রাসুল-সিদ্ধ-পুরুষদের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন এই ভোগবাদী লিপ্সা ও প্রবণতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম ও প্রতিকারের দলিল। তারা নিজেরা পার্থিব সম্বলহীন থাকা সত্ত্বেও সমকালে নিজ সমাজের কাছে তাঁদের কর্মের কোন বিনিময় চাননি। আল-কোরআনের সাক্ষ্য মতে, তাঁরা সবাই একই স্বরে ও সুরে বলেছেন যে, “আমরা তোমাদের নিকট কিছু বিনিময় চেয়ে থাকলে তা তোমাদের জন্য রইল। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে এবং তিনি সব বিষয়েই প্রত্যক্ষ সাক্ষী (৩৪: ৪৭ ও অন্যান্য)”। নবুয়ত অধ্যায় সমাপ্তির পর নবীদের আদর্শের উত্তরাধিকারী ওলী-দরবেশ-সিদ্ধ পুরুষ; তাঁদের মহৎ শিক্ষা ও চেতনায় উজ্জীবিত দার্শনিকবৃন্দ এই ক্ষতিকর ভোগ-প্রবণতার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভোগসর্বস্বতা তথা ক্ষমতা ও বিত্তলোলুপতা দুর্বলচিত্ত লোকদেরকে অন্ধ করে ফেলে, বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে দেয়, যার প্রাথমিক ফলশ্রুতি হচ্ছে, সে নিজের ভোগ ও স্বার্থের জন্য অন্যের এমনকি নিজ পরিবারের সদস্যদের তথা ভ্রাতা, ভগ্নি, সন্তান, স্ত্রীর অধিকার হানিকর আচরণ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা ও সংকোচবোধ করে না। ভোগ-সর্বস্ব জীবনের মোহ বর্জনপূর্বক ছিমছাম পবিত্র সংসার নির্মাণকল্পে নিরবচ্ছিন্নভাবে লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাগিদ প্রদানকে ওলী-দরবেশরা এ জন্যই তাঁদের জাহেরী কর্মসূচির তালিকার শীর্ষে রাখেন। হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই ধারার ঊনবিংশ/ বিংশ খ্রিস্টীয় শতকীয় মহান ঝাণ্ডাবরদার। সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মূলতঃ ভোগবাদী প্রবণতা অর্থাৎ স্রেফ নফ্সানিয়াত কবলিত হবার দরুন মানবজাতির একটা অংশ পৃথিবীতে আল্লাহ্র বাঞ্ছিত প্রতিনিধিসুলভ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। এই ভোগবাদ তথা ক্ষমতা ও বিত্ত নির্ভর প্রবৃত্তিপূজা বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও দুরারোগ্য ক্যান্সার হিসেবে বিরাজ করছে। 'প্রবৃত্তি-দমন প্রশিক্ষণ' তাঁর অন্যতম জাহেরী কর্মসূচি, যা উসুলে সাবআ'র কাঠামোতে সহজে আচরণযোগ্য হিসেবে বিন্যস্ত। স্থূল প্রবৃত্তিপূজার নিরসন তাঁর প্রকাশ্য সামাজিক কর্মসূচির অন্যতম অনুষঙ্গ। এটা ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের পর 'জেহাদে আকবর' অর্থাৎ প্রবৃত্তি দমনপূর্বক আত্মিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে নীরব সাধনা-সংযমে আত্মনিয়োগ করার জন্য নবীজীর (দ.) পরামর্শের পূর্বানুবৃত্তিও বটে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাববাদী-বস্তুবাদী নির্বিশেষে একশ্রেণির মহান দার্শনিকরাও এই স্থূল প্রবৃত্তিপূজার কঠোর বিরুদ্ধবাদী।

৩. হযরত আকদাসের (ক.) তালিম ও আমল পুরোপুরি শরিয়ত নির্ভরঃ আল-কোরআনে 'শরিয়া' শব্দটা একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন মহান নবী-রাসুলদের সমকালীন কর্মনীতি-পদ্ধতি বুঝাতে এই সহজ শব্দটা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারেরও সদস্য। বিজ্ঞ আলেম ও ভাষা বিশেষজ্ঞগণ আল-কোরআনের পটভূমিকায় 'শরিয়া' বলতে 'নীতিমালা' (principles) এবং 'কানুন' বলতে 'আইনকে নির্দেশ করেন। নবুয়তে মোহাম্মদী পরিমণ্ডলে শরিয়া বলতে মোহাম্মদী শরিয়াকে বুঝানো হয় এবং এই শরিয়ার ফলিত দিকসমূহ নিয়ে বিজ্ঞ ইমাম, উলামা, ফকীহ্ ও মুফাস্সিরগণ

অজস্র মূল্যবান গ্রন্থ ও ভাষ্য রচনা করে সমকালীন সমাজকে বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যথার্থ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। 'কানুন' বিভিন্ন বিষয় ও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রশাসন কর্তৃক প্রণীত আইন, যা স্থান-কাল-পরিবেশ বিশেষে প্রশাসন কর্তৃক পরিবর্তন ও সংশোধনযোগ্য। কিন্তু **'শরিয়া' বা নীতিমালা** তা নয়; এর শাশ্বত (universal) স্বরূপ আল-কোরআনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দৃষ্টান্তসহকারে বর্ণিত হয়েছে। বিধানসমূহের নীতিমালা দাতা হিসেবে আল্লাহ্-এর সাথে এটা অনুবদ্ধ (adjunct)। এ প্রসঙ্গে শরিয়া শব্দের একেবারে সাধারণ অর্থের উল্লেখ করা যাক, যাতে শব্দটার বিবিধ ব্যবহারিক মর্মার্থ অনুধাবন সহজতর হবে। শরিয়াত অর্থ : পানি পান করার জায়গা বা ঘাট অভিমুখী রাস্তা। আনুগত্য বা অনুসরণের জন্য সোজা ও সাফ রাস্তা। 'লিসানুল আরব' অভিধান মতে : আরবগণ শুধু সেই পানিকে 'শরিয়াত' নামে অভিহিত করতেন, যা **উন্মুক্ত ঝর্ণা আকারে প্রবাহিত হতো। কখনো বন্ধ হতো না এবং যেখানে কোন দুলচি বা রশি ব্যতিরেকে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করা যেতো। এই গ্রন্থে আরো বলা হয় যে, দ্বীন, মিল্লাত, মিনহাজ, রাস্তা-উপমা, নমুনা ও মাযহাবকে-ও শরিয়াত বলে।**[২]

উপরোক্ত বিবরণীর আলোকে মুহাম্মদী শরিয়া ও তদনুসারে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত, এই বেলায়তের প্রায়োগিক কাঠামো 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' এবং এর অনুসারীদের আত্মপরিশুদ্ধির অনুশীলন বা আমল-সূচি 'উসূলে সাবআ'র মর্মবাণী উপলব্ধি করা সহজ হবে।

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিরচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' এবং জীবনী ও কেরামত-এ হযরত আকদাসের যে শব্দচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা নিতান্তই শরিয়ত নির্ভর। তাঁর জীবন ও কৃতি, ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক ব্যবহারিক জীবনাচার সব কিছু শরিয়তের পায়রবীমূলক। তিনি সদা-সর্বদা সর্বক্ষেত্রে শরিয়তি জীবন যাপনের জন্য সকলকে তালিম প্রদান ও নসিহত করে গেছেন। কারণ; শরিয়তই ত্বরিকত, হাকিকত, মারিফতের একমাত্র ভিত্তি। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আকদাসের দ্বীন ইসলামের মুহাম্মদী ও আহম্মদী সত্তার যে সহজ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে সুস্পষ্টভাবে পার্থিব বৈষয়িক (mundane) এবং অপার্থিব, আধ্যাত্মিক (transcendal) ক্ষেত্রে মানবীয় করণীয় সম্পর্কে সহজে

ধারণা লাভ করা যায়। দ্বীন ইসলামের মুহাম্মদী ও আহমদী রূপ তথা যথাক্রমে পার্থিব বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক নীতিমালার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ঐতিহাসিক মদীনা সনদে। এতে 'মদীনা বহুত্ববাদী, পালনবাদী কল্যাণ-রাষ্ট্রের' নাগরিক নগদান বহির (cash book) নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস নির্বিশেষে ভালো-মন্দ সব মিলিয়ে পার্থিব অধিকার বা প্রাপ্তির যোগ-বিয়োগের মুহাম্মদী শরিয়ার গণিত বিন্যস্ত। একই সাথে আহমদী শরিয়ার বহুত্ববাদী, বিশ্ব-মানবতার সংরক্ষণ ও পালনবাদী নীতিমালার জ্যামিতি বিধৃত। মুহাম্মদী-নিয়মবদ্ধ জাগতিকতা এবং আহমদী সর্বকল্যাণবাদী উন্মুক্ত পালনবাদের সহাবস্থানমূলক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মদীনা সনদে, যার বাহ্যিক বা জাগতিক অবয়ব মোহাম্মদী সুন্নাহ্‌র রূপরেখা নির্দেশক।

মদীনা ফেডারেশনভুক্ত ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকা, বনু নাজির, বনু কুরাইজা এই সংবিধানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে পৃথিবীর ইতিহাস ও সামগ্রিক কল্যাণমূলক মানব সংস্কৃতির ভুবন উন্নত ও সুখকর রূপ ধারণরে পথে বহুদূর এগিয়ে যেতো অনেক শতাব্দী আগেই।

বলা বাহুল্য, হযরত আকদাসের জীবনে এই মুহাম্মদী ও আহমদী ধারা অভিন্ন ছন্দে প্রবাহিত। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণে তা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি যুগপৎ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও অর্জনে সমৃদ্ধ। দুনিয়া ও আখিরাতের উভয়মণ্ডলের কল্যাণের ভাণ্ডারের অন্যতম নির্বাচিত 'অছি' তিনি। আল-কোরআনে মানবজাতিকে যে অপূর্ব মুনাজাত শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে; রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাছনা-তাঁও ওয়া ফিল আখিরাতে হাছনা-তাঁও ওয়া কিন্না আজাবান্নার (হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন, আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আগুনের আজাব থেকে আমাদেরকে বাঁচান)। এই ত্রিমুখী কল্যাণ বর্ষণের উপযুক্ত পাত্র হিসেবে মানুষ যাতে নিজেকে গঠন করতে পারে, সে জন্য প্রয়োজনীয় 'ইসলাহ্‌' বা সংশোধন-পরিমার্জনের এবং 'তাজদীদ বা নবায়ন ও সংস্কারের মিশন নিয়ে স্ব-কালে হযরত আকদসের (ক.) ঐতিহাসিক আবির্ভাব। শাশ্বত মোহাম্মদী ও আহমদী কল্যাণধারা অর্থাৎ গাউসিয়াত (ত্রাণ-কর্তৃত্ব) ও কুত্‌বিয়াত (কর্ম-কর্তৃত্ব) স্রোতের সম্মিলন ঘটেছে তাঁর অস্তিত্ব বা হাস্তির মহাসমুদ্রে।

রূহানী ও দার্শনিক দর্পণে সুস্পষ্টরূপ প্রতিভাত যে, হযরত আকদাস বেলায়তে ওজমা (কোবরা) দ্বারা রাব্বুল আলামিন কর্তৃক পুরস্কৃত ও সম্মানিত। কুত্‌বিয়ত (কর্ম-কর্তৃত্ব) ও গাউসিয়ত (ত্রাণ-কর্তৃক) উভয়মণ্ডলে সৃষ্ট জগতের কল্যাণার্থে খোদাদাদ ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ওলী-আল্লাহ্ তিনি। মুহাম্মদীউল মশরব এবং আহমদিউল মশরব সঞ্জাত শক্তি ও সমাহারে গাউসিয়ত ও কুত্‌বিয়তের যুগপৎ সংমিশ্রণে তিনি সমৃদ্ধ। তৌহিদ, সততা-নৈতিকতাপূর্ণ ন্যায়-নীতি, সমাহারে সাম্যচেতনা, দয়া প্রভৃতি সৎগুণে সমৃদ্ধ মুহাম্মদীউল মশরব জ্ঞান-দর্শন-যুক্তিমত্তা সমৃদ্ধ, যা দৃশ্যতঃ পার্থিব বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশে প্রয়োগ-আচরণ ও ব্যবহারযোগ্য। আর আহমদীউল মশরব বা রূহানী বলয় আরদ্ বা ভূ-মণ্ডল ও পার্থিব জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে ধারণাতীত বিস্তারসম্পন্ন। প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবেই নিজের মধ্যে ও চেতনায় এই রূহানী বলয়ের তরঙ্গ অনুভব করেন। হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ক্বলবে মুহাম্মদী ও আহমদী স্পন্দন সমান্তরালভাবে স্পন্দিত, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে তৌহিদী কেন্দ্রবিন্দুতে সম্মিলিত।

টীকা: প্রথম অধ্যায়

১. বিশদ বিবরণের জন্য অছিয়ে গাউসুল আযম প্রণীত বেলায়তে মোত্‌লাকা, (তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৭৪ ইং তথা 'আলোকধারা বুক্‌স কর্তৃক, ১১ অক্টোবর, ২০২১ ইং পুনঃ প্রকাশিত)

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩শ খণ্ড, শ'-অংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বহুত্ববাদী পালনবাদী সমাজের কল্যাণময়তার হলোগ্রাম হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)

১. এক চির আধুনিক মানবঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আল-কোরআনের একাধিক আয়াতে নবী-রাসুলগণ সম্পর্কে এই মর্মে প্রত্যয়ন করেছেন যে, তাঁরা তাঁদের খেদমতের আঞ্জাম প্রদত্ত অন্য কোন মানুষের কাছে 'বিনিময় প্রত্যাশী' নন। নবীদের ওয়ারিস হিসেবে মহান ওলী-আল্লাহ্রাও মানুষ তথা পৃথিবীর কাছ থেকে কোন প্রকার বিনিময় প্রত্যাশী নন। নবী-ওলীদের জীবনচরিতই তার প্রমাণ। অতএব, নবীরা যেমন শাশ্বত আধুনিক মানব, তেমনি মহান ওলী-আল্লাহ্রাও তাঁদের ওয়ারিস হিসেবে জীবন-বৈশিষ্ট্যগুণে শাশ্বত আধুনিক মানব। উল্লেখ্য, 'আধুনিকতা' শব্দটার অন্তর্গত ব্যঞ্জনা এই যে, সমকালে সর্বজনীন কল্যাণময়তা বিশেষ করে দুর্গত মানবতার মুক্তি ও মঙ্গল কর্মসূচি আর কর্মই 'আধুনিকতা' হিসেবে লোকসমক্ষে আবির্ভূত হয়। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত : 'হিত কামনা করা ও মঙ্গল কর্মই ধর্মীয় ক্রিয়াভুক্ত' (বোখারী শরিফ প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায় : ঈমান, ৪৯নং হাদিস, বাংলা তরজমা, ১৯৫৭ইং; হামিদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা)। হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জাহেরী জীবন সর্বজনীন কল্যাণের পথে দিশারী আলোকচ্ছটার মতো, সমাজের বিশুষ্ক রুঠা মাঠে প্রত্যাশিত কল্যাণময় বৃষ্টির মতো লোক-সমাজে উদ্ভাসিত। তাই তাঁকে 'চির-আধুনিক মানব' হিসেবেই গ্রহণ, বরণ ও মূল্যায়ন করতে হবে, যিনি সতত

কল্যাণময়তার আঁধার। তাঁর একটি মহান বাণী: "যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে, তাকে আমি উন্মুক্ত সাহায্য করবো। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক্ চলতে থাকবে।"

মহান নবী-রাসুলদের রেওয়াজ ও ঐতিহ্য অনুসারে সাধারণ মানুষদের অতি সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত তাঁর এই ধরনের উক্তি বা কালামগুলোকে বৃহত্তর দার্শনিক, রূহানী ও সামাজিক আয়নায় অবলোকনপূর্বক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করলে অনুদ্‌ঘাটিত বহু তথ্যে ভর্তি মহান সৃষ্টি-প্রকল্পের অনেক গভীরে প্রবেশ করা সম্ভবপর। একই সাথে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব ও অস্তিত্বের শাশ্বত প্রকৃতি ও সজীব ক্রিয়াশীলতাকে।

২. জীবন-সাধনার গুরুত্বপূর্ণ ফসল ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেলায়তে মোত্‌লাকা তথা রবুবিয়াত বা পালনবাদী নীতির পর্দা উন্মোচন:

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কঠোর জীবন-সাধনার সর্বাধিক সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ফসল হলো বেলায়তে মোত্‌লাকা তথা রবুবিয়াত বা সর্বজনীন পালনবাদের নীতির যুগপৎ জাহেরী ও রুহানী সক্রিয়তার পর্দা উন্মোচন, যা দ্বন্দ্ব-অসাম্য-জুলুম বিক্ষত পৃথিবীতে সমতাবাদী, সহনশীল, বহুত্ববাদী পারস্পরিক সহাবস্থানমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের সহজ পথ-নির্দেশক। মানুষকে পৃথিবীতে শুধু তাদের নিজেদের ভোগ-স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি লাভের মধ্যে সীমিত থাকার জন্য পাঠানো হয়নি; সকল মানব, প্রাণীকুল এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যশীল করেই পাঠানো হয়েছে। গণমুখী ইসলাম ধর্মসমেত সকল ধর্মের এটাই মৌলিক দার্শনিক মর্মবাণী।

তিনি শাশ্বত আধুনিক, পরিশীলিত, পবিত্র একজন পরিপূর্ণ মানব। নিজের ও নিজের সংসারের চেয়ে দুনিয়া জোড়া প্রতিবেশীদের কল্যাণই তাঁর প্রধান কর্মসূচি, যা সম্পাদনে সাফল্য তাঁকে গাউসিয়াত ও কুত্‌বিয়াত উভয় শিরোপার অধিকারী করেছে, যা মানব রুহের অমর গতিশীলতা বিধানের সূত্র ধরে দুনিয়াদারী ও দুনিয়াগিরির প্রথম পর্বের উপসংহার রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। মহাজাগতিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির আলোকে এসব অধরা বিষয় বিশ্লেষণ করলে মূল সত্য সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

৩. শিক্ষা এবং জীবনের অভীষ্ট স্থিরকরণঃ

তীক্ষ্ণ মেধাবী ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানব হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১২৬০ হিজরী সনে কোলকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১২৬৮ হিজরী সনে কৃতিত্বের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন অত্যন্ত উজ্জ্বল। সব পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। মাসিক বৃত্তি, বিবিধ মেধা পুরস্কার তাঁর শিক্ষার ব্যয় সংস্থানে সহায়ক হয়। কোরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ্, মন্তেক, হিকমত, বালাগত, উসুল, আকায়িদ, ফিলসফা, ফরায়েজ যাবতীয় শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। আরবী, উর্দু, বাংলা, ফার্সী ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল চমকপ্রদ।

বর্ণাঢ্য শিক্ষা জীবনের পটভূমিকায় তিনি “হক্কুল ইবাদ” অর্থাৎ বান্দার অধিকার সংরক্ষণকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন। আইন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন মানসে তৎকালীন ‘মুন্সেফী’ অধ্যয়নে ব্রতী হন এবং যশোহর জেলায় ১২৬৯ হিজরী সনে বিচার বিভাগে কাজী পদে নিয়োজিত হন। এর মধ্যে শিক্ষকতাকে তিনি অধিকতর কল্যাণপ্রসূ বিবেচনা করে ১২৭০ হিজরী সনে কাজী পদে ইস্তাফা দিয়ে কোলকাতায় মুন্সী বুঁ-আলী (র.) মাদ্‌রাসায় প্রধান মোদার্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, মহৎ চরিত্র, জ্ঞান-গরিমায় আস্থাশীল হয়ে বহু পরীক্ষা-সমীক্ষা শেষে হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) অধঃস্তন পুরুষ ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী সৈয়দ আবু শাহ্‌মা মোহাম্মদ সালেহ্ আল-কাদেরী লাহোরী (র.) তাঁকে মারেফাতের ‘লাল’ হস্তান্তর করেন এবং খলিফা রূপে অভিষিক্ত করেন। এর পাশাপাশি প্রায় একই সময়ে হাজীউল হারামাইন হযরত শাহ্ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (র.) [হযরত আবু শাহ্‌মা সালেহ্ লাহোরীর (র.) জ্যেষ্ঠভ্রাতা] থেকে ইত্তেহাদী ফয়েজ অর্জনে ধন্য হন। এই দুই বিশাল গুরুভার খোদায়ী আমানত সংরক্ষণ এবং বহন-শক্তি অর্জনের জন্য তিনি কঠোর রিয়াজতে মগ্ন হন। এর মধ্যে তাঁর উপর দিয়ে প্রচণ্ড সাংসারিক ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়। আর্থিক টানা-পোড়েনের মধ্যে শুরু হয় তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। তিনি প্রবল ধৈর্য্য, তাওয়াক্কুল অবলম্বন করে জাহেরী-বাতেনী উভয় ময়দানে সংগ্রামে কামিয়াবী অর্জন করেন

এবং উভয় বুরুজের মর্যাদাসম্পন্ন অধিবাসী হিসেবে আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের মেহেরবাণীতে সিক্ত হন।

৪. হক্কুল ইবাদ : মানব তথা জীবের অধিকার সচেতনতা

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন পথে অভিযাত্রা শুরু হয় হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার সংরক্ষণের ব্রত নিয়ে। হক্কুল ইবাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রবুবিয়তের (পালনবাদের) সুবিন্যস্ত, সুপরিকল্পিত মহা-প্রশাসনের প্রধান বিভাগ। তাসাওউফ বিজ্ঞান মতে, এই বহুমুখী গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় প্রবল রুহানী শক্তিসম্পন্ন ওলী-আল্লাহ্‌দের উপর। হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) তেমনই এক প্রবল কল্যাণশক্তিসম্পন্ন ওলী-আল্লাহ্। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য; তাসাওউফ মতে, মুসলিম ওলী-আল্লাহ্‌রা যেহেতু যে-কোন সমীক্ষণমূলক বিবেচনা ও বাস্তব কাজে পূর্ণ মাত্রায় সামাজিক মানুষ হিসেবে বিরাজ করেন, সেহেতু তাঁদের জীবন ও কর্মের বিশ্লেষণ বাস্তব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল মহান ওলী-আল্লাহ্‌র জীবন-কর্ম-সংগ্রাম এই রূঢ় বাস্তবতারই দৃষ্টান্ত বহন করে। তাঁরা সর্বজনীন রবুবিয়াতের জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ্ অর্পিত এই দায়িত্বের প্রতি অতি-সংবেদনশীল। মানব সমাজ ও জীবনের সাথে তাঁদের সম্পৃক্ততা অহোরাত্র সার্বক্ষণিক। আগেই বলা হয়েছে, ওলী-আল্লাহ্‌রা জীবন-ঘনিষ্ঠ মানব। হযরত গউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিদ্ধ হচ্ছিলেন যুগ-যন্ত্রণায়। চারপাশের নিম্নবর্গীয় মানুষদের সার্বিক দুর্দশা তাঁকে পীড়িত করছিল এবং তাদের জন্য 'হক্কুল ইবাদ' প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল, যা আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী লাভে সমর্থ হয়।

তিনি জীবনকে দেখেন এক অন্তহীন কাফেলারূপে। এর শুরু-শেষ কোথায়, তা কেবল আল্লাহ্ই জ্ঞাত। পৃথিবী সেই অন্তহীন কাফেলা-পথের একটা অংশ মাত্র। সেই কাফেলার একজন 'সাধারণ অভিযাত্রী' হিসেবেই তিনি বেঁচেছিলেন সবার জন্যে, সবার সাথে ও মাঝে একজন হয়ে। অতি সাদামাটা মমতাময় তাঁর জীবন। আড়ম্বর, সঞ্চয়, বৈভব, প্রতিপত্তি সব কিছুই কৃত্রিম, বুদবুদের মতো। তাই তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলতে পেরেছেন– 'দুনিয়া দারুল রেহালত। পান্থশালা। এখানে আড়ম্বরের দরকার কী?' একবিংশ শতাব্দীর দারিদ্রক্লিষ্ট দুনিয়ার তথা পৃথিবীর ইতিহাসের অভাবী মানুষদেরকে, যারা সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠ; সম্যক অনুভব করতে সক্ষম প্রজ্ঞাবান মানবই এই সহজ কথাটা এভাবে সহজে ব্যক্ত করতে পারেন।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনে ওলী-আল্লাহ্গণের শাশ্বত রুহানী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর জাহেরী জাগতিক প্রদীপ্ত বিচ্ছুরণ বর্ণাঢ্য। তাঁর সুবিশাল মহৎ জীবনে সংযোগ, সংশ্রব, উঠা-বসা, দৈনন্দিন আচার ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে। স্রেফ দার্শনিক, বিদ্বজ্জন, জ্ঞানী-পণ্ডিতদের সাথে ওলী আল্লাহ্দের মোটা দাগে তফাত এখানেই। জ্ঞানী-গুণী-দার্শনিকরা সাধারণতঃ থাকেন তাঁদের মহৎ গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, সৃজনশীল রচনাবলীর সারিতে। আর ওলী-আল্লাহ্দের কারবার, জীবন, ধ্যান চলে দিবারাত অবিরাম সাধারণ উর্মি মানুষ নিয়ে, মানুষের কল্যাণের ময়দানে। অগণিত চিত্র প্রতিফলিত হয় তাঁদের জীবন-পর্দায়, যেগুলোর রকম বা প্রকারের শ্রেণী বিন্যাস করা অসম্ভব। তাঁরা দর্শনের তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় প্রক্রিয়ার নিদর্শন। এই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কথাই ধরা যাক; তাঁর জীবন গ্রন্থের অধ্যায় বেশুমারঃ সকলের প্রতিপালন-দায়িত্ব, ধর্মীয় সহাবস্থান, নির্বিলাস সাধনা, শুচি স্নিগ্ধ জীবন, দর্শন, শিক্ষা ও ধর্মীয় তালিম প্রদান, সামাজিক-পারিবারিক বিবাদ-ভঞ্জন, রাজনীতি-সমাজনীতির গতি প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। সর্বজনীন কল্যাণময়তা, মানব-সমতার নীতি সুরক্ষা, কল্যাণমূলক প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা, বর্ণবাদ-ধনবৈষম্যবাদ-সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রতিরোধের তালিম প্রদান ইত্যাদি ছোট-বড়ো এমন কোন বিষয় ও সমস্যা নেই, যেখানে তাঁর কল্যাণ পরশ লাগেনি। তাঁর এই জীবন, এই কর্তব্য, এই দায়িত্ব সর্বাংশে অনুকরণীয় আমাদের একবিংশ শতকের একজন সৎ, সৃজনশীল নাগরিকেরই জীবন যেন। তিনি একজন শিক্ষক, তিনি ত্রাতা, তিনি ছায়া, তিনি আশ্রয়—একজন মহান ওলী-আল্লাহ্। তিনি মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতিভূ। আধুনিক বিশ্লেষণে তিনি বহুত্ববাদী সংসারের দার্শনিক অভিভাবক, এক চির আধুনিক মানুষ।[১]

তাঁর কর্ম-কৃতি সর্বাংশে রুহানী প্রকৃতির ও সর্ববেষ্টনকারীঃ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কর্ম-কৃতি সর্বাংশে রুহানী প্রকৃতির এবং অদৃশ্য বাতাসের মতোই চারপাশের জীবন ও পরিবেশকে সুরক্ষা দিয়ে চলমান থাকতে অকৃপণ সহায়তা যোগাচ্ছে। হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর (ক.) বেলায়তে 'মোকাইয়াদা' ইসলাম ও মুসলিম সমাজের এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায়ে অচলায়তন ভেঙ্গে গতিশীলতা এনেছিল সমাজের বিদ্যমান বহু অন্যায়,

অনাচার প্রতিহত ও অপসারণ করে। তাঁর প্রায় ছয়শত বছর পর বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, যন্ত্রপ্রকৌশলে উন্নত বিশ্বে ইসলাম তথা আল-কোরআন এবং নবীজীর (দ.) শিক্ষাকে সমকালে তাৎপর্যপূর্ণ ও উপযোগী হিসেবে প্রয়োগ করার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উপর সেই গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে। হযরত বড়পীরের (ক.) অধস্তন উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে তিনি যেমন মারেফাতের 'লাল' পেয়েছিলেন, তেমনি 'বেলায়তে মোত্‌লাকা'র উদ্ভব ও সচলতার দায়িত্বও যেন পেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হিসেবে। মানব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ও চাহিদা পূরণ করতে আল-কোরআন ও নবীজীকে (দ.) তিনি অধিকতর সম্প্রসারিত স্বরূপে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে উদার, মুক্ত বা মোত্‌লাকার তশ্‌তরীতে বিশ্ব সমাজের সামনে পেশ করেন এবং তা 'বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের' বিবরণ অনুযায়ী রব্বানিয়াত বা রবুবিয়াত হিসেবে নীরবে-নিঃশব্দে জগতে বিস্তার লাভ করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে যুদ্ধমুক্ত শান্তিমণ্ডিত বিশ্ব নির্মাণের যে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া সূচিত হয়, তার সাথে তাঁর বেলায়তে মোত্‌লাকা দর্শনের সামাজিক রূপকল্প 'রবুবিয়াতের' নিবিড় সাযুজ্য বিদ্যমান। পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দুই-দুইটা ভয়াল বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত বুকে নিয়ে অবশেষে বিশ্ব মানব সমাজ জাতিসংঘের মতো ছত্রছায়ার উদ্ভব ঘটিয়েছে, যা সর্বজনীন পালনবাদের আংশিক রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ বটে।

তাঁর নীরব সৃজনশীল প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর স্বদেশ বাংলা মুল্লুকের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে। শোষিত, নিপীড়িত চাষী-মাঝি অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বৈদেশিক পরাধীনতা ছিন্ন করার ধারা সূচিত হয়, যখন তিনি কোলকাতায় নিজের অঞ্চলের মানুষদের দুর্দশা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন: "সিয়াসতকে আমি পূর্ব দিকে নিয়ে যাব।" বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ–আসাম প্রদেশ গঠন, বৃটিশের বিদায় ও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠন এবং অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তানী নয়া ঔপনিবেশিক কব্জা ছিন্ন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয়, যেন তাঁর সেই বাণীরই ধাপে ধাপে সম্মুখ পানে দৃঢ় অভিযাত্রা। ভবিষ্যতে এর গতিময়তার স্বরূপ কি হতে পারে, তা ভবিতব্যই জানেন।

হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানীর (ক.) বেলায়তে মোকাইয়াদার কালোপযোগী সম্প্রসারিত রূপ 'বেলায়তে মোত্‌লাকা'র তত্ত্ব ও দর্শনকে বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য সামাজিক প্রকল্পরূপে বিন্যস্ত করার গুরু দায়িত্ব পালনকারী হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আবির্ভাব ও কর্মকাল হিসেব করলে মুসলিম ঐতিহ্যানুযায়ী (tradition) তিনি 'মোজাদ্দেদ' মর্যাদায়ও প্রাকৃতিক নিয়মে অভিষিক্ত। মানব সভ্যতার আগামী দিনগুলোতে এ তথ্যের আরো প্রস্ফুটন ঘটাবে।

তাঁর বেলায়তী জীবনের প্রতি মুহূর্ত অসংখ্য কারামত বা সৃষ্টজীবের কল্যাণময়তায় নিবেদিত ছিল। এগুলোর হিসেব-নিকেশ সম্ভব নয়। তাঁর অস্তিত্ব, পদচারণা, চলন-বলন, ইশারা-ইঙ্গিত সব ছিল সক্রিয় কারামতময়। **'কারামত' তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই আটপৌরে ব্যাপারের মতো** অর্থাৎ তাৎক্ষণিক কর্তব্য-করণীয়ের যথার্থ বাস্তবায়ন মাত্র। এ ব্যাপারে কোন সংশয় কিম্বা প্রশ্নের অবকাশও তিনি রাখেননি। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন: "যব কুন্‌ কাহা, ছব তো হো গেয়া। ফের গায়েব কাঁহা হ্যায়?"[২] সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়া তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত! তিনি শুধু 'সৃষ্টের' পূর্ব নির্ধারিত অবস্থাটার গ্রন্থি খুলে দিচ্ছেন মাত্র! এমনই তাঁর মর্তবা।

না! এতে চোখ কপালে তুলবার কিছুই নেই। মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার কোরআনী দর্শনে বিশ্বাসীরা ছাড়াও যারা মানুষকে অনন্ত সম্ভাবনাময় সৃজনশীল প্রাণী হিসেবে স্বীকার করেন, তাঁরা যুক্তি-বিজ্ঞান মতে যেমন এটা অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনি পদার্থ বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নয়ন ও বিকাশ সমগ্র মহাজগৎকে জ্ঞানের অভিন্ন এক কুলুঙ্গিতে স্থাপন করে চলেছে। তা বুঝবার ও অবলোকনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিপক্ক জ্ঞান-চক্ষুর। হাদিসে কুদ্‌সীতে যেমনটা বলা হয়েছে: "আমি ফকীরের ভিতর এবং ফকীর আমার ভিতর। যখন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে। তখন আমি তাঁকে বন্ধু বলে জানি। যখন আমি তাঁকে বন্ধু বলে জানি, তখন আমি তাঁর কর্ণ হই, যদ্বারা তিনি শ্রবণ করেন, আমি তাঁর চক্ষু হই যদ্বারা তিনি দর্শন করেন, আমি তাঁর হস্ত হই, যদ্বারা তিনি ধারণ করেন। আমি তাঁর পদযুগল হই, যদ্বারা তিনি হাঁটেন।" হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই মহান বাণীরই অন্যতম নিদর্শন!

এ প্রসঙ্গে আরো চিন্তানীয় আল কোরআনের বাণীঃ "তিনিই নিজ অনুগ্রহে আসমান ও জমিনের সব কিছুকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল কওমের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে" (৪৫:১৩)।

৬. স্থূল ভোগবাদী প্রবৃত্তি-পূজা পৃথিবীতে সকল অনাসৃষ্টির উৎসঃ

নিবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত হযরত সাহেব কেবলার বাণীতে ভোগবাদী প্রবৃত্তি-পূজা প্রত্যাখ্যানের তাগিদ রয়েছে। তিনি অত্যন্ত সরল ভাষায় ভোগবাদ তথা প্রবৃত্তিপূজাকে নাকচ করে দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের প্রবণতা সক্রিয়। প্রবৃত্তিপূজা নিয়ন্ত্রণহীন, দানবীয়। পৃথিবীর ইতিহাসের কালো অধ্যায়গুলো প্রবৃত্তিপূজার অভিশাপ ও কলঙ্কে জর্জরিত। তৌহিদ ব্যতীত অন্যসব পূজা ও উপাসনার মধ্যে জঘন্যতম হলো প্রবৃত্তিপূজা। অন্য সব সাকার-নিরাকার পূজা-অর্চনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংযম, নীতিকথা প্রভৃতি সু-বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভোগবাদী প্রবৃত্তি-পূজায় সৎ কোন লক্ষ্য নেই। আছে শুধু ভোগ, বাসনা ও রসনা তৃপ্তি। স্থূল ভোগবাদ, ভোগবাদী সংস্কৃতি আজ পৃথিবীকে জাহান্নামে পরিণত করে ফেলেছে। এর পরিণতি মানব সভ্যতা সংস্কৃতি, এমনকি অস্তিত্বের জন্য ভয়াবহ। সাম্প্রতিক ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সূচিত কোভিড-১৯ মহামারীর ব্যাপকতায় এর কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলেছে। আল- কোরআনের সূরা নজম ও সূরা জাসিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রিয় প্রবণতা, ভোগপ্রবৃত্তি, খাহেশকে ঘৃণ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এ বিষয়ে মানব সমাজকে শালীন ভাষায় সতর্ক করেছেন এবং উৎকট ভোগবাদ পরিহার করার তাগিদ দিয়েছেন যা কার্যতঃ সুষম স্নিগ্ধ কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম মূলসূত্র।

বস্তুতঃ পৃথিবীর ইতিহাসের যে বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ-ভিত্তিক কিম্বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ভিত্তিক, যাই হোকনা কেন; তাতে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, কালে-কালে যুগে-যুগে উৎকট ভোগ-বিলাস প্রবণতাই মানব সমাজের পতন ও সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আল-কোরআনে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ বেশ কিছু বয়ান মানবজাতির জন্য সতর্কতামূলক বার্তা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বহু গবেষণায়ও তুবা, সাবা, সাদ, আদ, সামুদ, মাদইন, আইকাহ্, আদুম, হিময়ার প্রভৃতি কোনও না কোন

জাতির করুণ পরিণতির স্কেচ উঠে আসছে। আমাদের এই একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে মোট সম্পদের কোন ঘাটতি দেখা যায় না। প্রতি মুহূর্তে জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় বিপুল খাদ্য সামগ্রী অপচয় হচ্ছে। অথচ এই একবিংশ শতকের প্রথম পাদে উন্নত পশ্চিমা দুনিয়াই বলি, আর প্রাচ্যের দারিদ্র্য জর্জরিত অনুন্নত দেশগুলোই বলি; ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে সকল পদ্ধতির সমাজেই বঞ্চিত, অভাব-প্রপীড়িত মানুষের হাহাকার। প্রায় প্রত্যেক দেশেই হাজার হাজার কোটি ডলারের বাজেট প্রণীত হয়। নতুন নতুন মারণাস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতা হয়। মানবতার শান্তি, সুখ, নিরাপত্তার পরিবর্তে হনন ও ধ্বংসের মহড়া চলছে প্রতিনিয়ত। এই কোভিড প্যানডেমিককালেও তাতে বিরতি নেই।

আগের জমানায় নবী-রাসুলগণকে এই অনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা গেছে। এখন নবুয়ত-রেসালাত বন্ধ। মানবজাতির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে ঐশী নবুয়তি-রেসালতি তালিমের কল্যাণে। আমরা বহন করছি তারই বিকাশশীল ঐতিহ্যের। প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রতি বছর উন্নয়নের বর্ণাঢ্য ফিরিস্তি প্রকাশিত হয়। অথচ কোটি কোটি মানুষের অত্যাবশ্যকীয় আহার্য ও বাসস্থানের অভাব প্রকট। সবই কাগুজে বাকসর্বস্বতা ও শুভঙ্করের ফাঁকিতে পর্যবসিত হয়। **'মানুষ মানুষের মতো প্রত্যাশিত জীবন যাপন করতে পারছে না। মানুষকে মানুষের মতো বাঁচবার পরিবেশ দিতে হবে।'** হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দুনিয়া ও মারেফতী জীবনের অন্যতম প্রধান মিশন এটাও।

এ প্রসঙ্গে উৎকট ভোগবাদ অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূজার ধূম-ধারাক্কা সম্পর্কে আল-কোরআনের হুঁশিয়ারীগুলোর কয়েকটা আয়াত পাঠ করা যাক : (ক) যারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতোই। বরং, আরো অধিক পথভ্রষ্ট (১৫: ৪৩–৪৪)। (খ) তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির তাবেদারী করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হেদায়েতের পরিবর্তে স্বীয় প্রবৃত্তির তাবেদারী করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে (২৮:৫০)? এমন অপদার্থরা এলো, যারা সালাতের খেলাপ করলো এবং কুপ্রবৃত্তির তাবেদারী করলো (১৯:৫৯): আপনি তার প্রতি লক্ষ্য করেননি, যে তার প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্যে পরিণত করেছে! (৪৫:২৩); ...যার নিকট নিজের মন্দকর্মগুলো উত্তম বলে মনে হয় এবং সে নিজের খেয়াল-খুশির তাবেদারী করে (৪৭:১৪)...এবং নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে (৪৭:১৬); তারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তির তাবেদারী করছে

(৫০:২৩)। এগুলো ছাড়াও আল-কোরআনে মানুষের জন্য উপযুক্ত পটভূমিকায় যথার্থ বার্তা ও তথ্য রয়েছে। স্থূল ভোগপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আল-কোরআনের এই নিরাপোষ অবস্থান ভোগবাদীদেরকে ইসলামের চরম প্রতিপক্ষ করে তুলেছে। যুগের অন্যতম মুজাদ্দেদ এবং মনোনীত 'হাদী' হিসেবে স্বীয় সমাজ ও পৃথিবীর প্রতি নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে গেছেন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

৭. হযরত আকদাসের (ক.) কারামত প্রসঙ্গঃ

হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জাহেরী ও বাতেনী উভয় আকাশ অসংখ্য কারামতের নক্ষত্রে ভরা। সাদা-মাটা পার্থিব নজরে কারামতকে আটপৌরে দৈনন্দিনতার স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম বলে মনে হলেও মূলতঃ এই বিষয়টা রুহানী এবং বিজ্ঞানময় ঘটনা বা ওয়াকেয়ার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মহান পল্লী কবি জসীম উদ্দিন তাঁর বিখ্যাত 'মুর্শিদা গান' গ্রন্থে হযরত আকদাসের ৪৪টা কারামত বা দৃশ্যতঃ 'অলৌকিক ঘটনার' শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেছেন। [অবশ্য হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সংকলিত-সংগৃহীত জীবনী ও কারামত গ্রন্থে ১০২টি ওয়াকেয়ার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ বিবৃত হয়েছে]। এসব ঘটনা রূঢ় বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক বিযুক্ত কোন 'হাউই' ব্যাপার নয়। এই 'কারামত' শব্দের মোড়কে যে বিজ্ঞান ও রুহানী ব্যাপারাদির রসায়ন দার্শনিক ও বাস্তবতার বস্তুরূপ ধরে বিরাজমান, তার শেকড় বহু বহু গভীরে প্রোথিত। ইতিহাসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী তা হযরত দাউদ (আ.)-এর সময় (খ্রি. পূ. ১০৮৬–খ্রি. পূ. ১০১৫ সন) পর্যন্ত বিস্তৃত। আল-কোরআনে বিবৃত : "আল্লাহ্ তাকে [দাউদ (আ.) কে] রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা ইচ্ছা হয়, তা শিক্ষা দিলেন (২:২৫১)। আরো বিবৃত : "হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি, অতএব, আপনি মানুষের মাঝে, ন্যায়বিচার করুন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, কেননা তা আপনাকে আল্লাহ্র রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেবে (৩৮:২৬)। তাঁর সম্পর্কে আল-কোরআনের (৪:১৬৩, ২১:৯৭) নং আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত দাউদকে (আ.) প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের মধ্যে তাইয়্যে জমান ও তাইয়্যে আরদ্ অর্থাৎ সময় সঙ্কোচন ও স্থানিক দূরত্ব সঙ্কোচনের ক্ষমতাও রয়েছে। এ বিষয়ে সহীহ্ বুখারী শরিফে হাদীস বর্ণিত আছে। এগুলো "কুল্লে শাইছুন ক্বদীর"

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কুদ্‌রতের অনির্বচনীয় চিহ্নের অন্যতম ক্ষুদ্র নিদর্শন। 'তাইয়্যে জমান ও তাইয়্যে আরদ্' দ্বারা চোখের পলকে অনেক ঘটনা বাস্তবিক পক্ষে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মওলানা আজিজুল হক অনুদিত বুখারী শরিফ [বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা] ৪র্থ খণ্ডে, (পৃঃ ২১৬-২১৭, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭ইং) বিবৃত আছে।

বলা বাহুল্য, হযরত আকদাস (ক.) রুহানী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এই শক্তিতে বিভূষিত। 'কারামত' সাদা-মাটা ভাষায় মরমী রহস্যের বহিঃপ্রকাশ (Manifestation), যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান বিকশিত অবস্থায় দর্শন শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সহযোগে অনুধাবনযোগ্য বলে বিজ্ঞজনদের অভিমত। রাব্বুল আলামিনের এই অনুগ্রহ মানুষ, প্রাণীকুল তথা সর্ববিষয়ের (কুল্লে সাইয়িন) কল্যাণে বিশেষ অবস্থা ও আবহে প্রবাহিত হয়। পূর্বেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, কারামত এক ধরনের সূক্ষ্ম হেকমত বা বিজ্ঞান, যা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন ও সাধনা-সাপেক্ষ রুহানী সংসারের অন্তর্ভুক্ত। এই শক্তি বিশেষ পরিশুদ্ধ মানবের ক্বলবের আওতাধীন করা হয়। গতানুগতিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের টেবিলে কিম্বা সাধারণ যুক্তিশাস্ত্রের মাপকাঠিতে এগুলোর উপাদান পরিমাপ্য নয়। বরং রুহানী ও নৈতিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে কল্যাণপ্রদরূপে বাস্তবে ঘটমান ক্রিয়া হিসেবে স-প্রমাণিত ও গ্রহণীয়– যেমন মানুষের নিজের কাছে নিজের অস্তিত্ব, আবির্ভাব ও জীবন-গতিশীলতার বিষয়টা স্বয়ংক্রিয়রূপে গ্রহণীয় হয়। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও একশ্রেণির শিক্ষিত মানুষ মনে করতেন যে, "এখনকার এই বিজ্ঞানের যুগে এসব অর্থাৎ কারামত কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না।" কারামতকে 'অলৌকিক' ঘটনার ব্রেকেটে বন্দী রেখে এ ব্যাপারে হাজার বছরের ঐতিহাসিক তথ্য ও সাধনাকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রবণতাও প্রকট। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমাগত বিকাশ জানাচ্ছে যে, মহাজগত (Cosmos) একটি মাত্র সৃষ্ট ইউনিট এবং তার মধ্যে সক্রিয় 'একটি মাত্র সৃজনশীল স্পন্দন।' মানবজাতি তথা জীবজগতের অভিন্ন প্রাণসত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে নিত্য-নবতর উদ্ভাস যেন রুহানী জগতের অন্তহীন আলিঙ্গনের মধ্যে লেপ্টে থাকছে। মানবজাতির নবতর প্রজন্ম এসব ব্যাপারে ক্রমাগত স্পষ্টতর তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। সূরা আদ্‌দ্বোহা সহ আল-কোরআনের বহু আয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইশারা বিদ্যমান। আরো সহজভাবে বলা যায়, মহাজগত বা

আ'লামীন পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একক ইউনিট। উদাহরণ স্বরূপ, 'রসুনের কোষ অনেক হলেও জড় এক'। এই দৃশ্যমান বাস্তবতার বিজ্ঞান বা হেকমতের অন্তর্নিহিত শিক্ষা সম্যক আত্মস্থ করতে পারলে তৌহিদের মর্মবাণী, কারামত, সময় ও দূরত্বের ব্যবধানের অনস্তিত্ব প্রভৃতির উৎস হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। আল-কোরআনে দৃশ্যমান মাখলুক, প্রকৃতির আচরণ, বিবর্তনক্রিয়া প্রভৃতি অধ্যয়ন ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে বার বার।

ধর্মীয় পরিভাষায় 'কারামত' শব্দটা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দান, সম্পূর্ণ মুক্ত ও অবারিত অনুগ্রহ (এহসান, ইন'আম) বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে অধিকতর যথাযথ ব্যাখ্যা হলো, 'কারামত' শব্দটা গঠিত হয়েছে আল্লাহ্‌র বন্ধুদের (আওলিয়া, একবচনে ওয়ালী) অলৌকিক ঘটনাবলীকে নির্দেশ করার জন্য, যা আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহ করে তাঁদেরকে এগুলো সম্পাদনের ক্ষমতা দান করেছেন।

এসব ঘটনা সাধারণতঃ বস্তুজগতে সংঘটিত অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনার সমবায়ে গঠিত অথবা ভবিষ্যতের কোনও পূর্ব সঙ্কেত স্বরূপ, নতুবা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোনও ব্যাখ্যা-স্বরূপ। 'কারামত' শব্দের ভাবার্থ 'মুযিযা' থেকে ভিন্ন। তবে উভয়ই বস্তুর স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গের (খারিকুল-আদা) সাথে জড়িত, অর্থাৎ এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা, যা ঐশী নিয়ম কানুনের (সুন্নাত্‌ল্লাহ্‌) ধারা এবং দৃশ্যতঃ স্বাভাবিক ধারাকে লংঘণ করে। কিন্তু মুজিযা হলো, পার্থিব ঘটনা সংবলিত, যা কোন দাবী বা চ্যালেঞ্জের (তাহাদ্দী) মুকাবিলায় নবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত, যা দ্বারা তাঁরা শ্রোতাদের অক্ষমতাকে পূরণ করে তাদের বক্তব্য বিষয়কে অখণ্ডনীয়ভাবে সুনিশ্চিত করেছেন।

'কারামত' হলো সাধারণ (General) ব্যক্তিগত অনুগ্রহ, এটা গোপন রাখা উচিৎ এবং কোন ক্রমেই এটা নবীর মিশনের নিদর্শন নয়। গতানুগতিক স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী নবীগণ কর্তৃক সম্পাদিত বিস্ময়কর ঘটনাবলীকে "মুজিযা" বলা হয় এবং ওলী-দরবেশ কর্তৃক সাধিত বিস্ময়কর ব্যাপারকে কারামত বলা হয়। [ইসলামী বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড, কারামত, ইফা. দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ ইং পৃঃ ৪৫৭]।

কারামত প্রসঙ্গে হযরত ইমাম গাজ্জালীর (র.) 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' গ্রন্থের প্রথম ভাগ 'দর্শন খণ্ডে'র 'আত্মদর্শন' অধ্যায়ে ওলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়:

“..বাহ্যতঃ ওলীগণ নূতন কোন শরিয়ত শিক্ষা প্রদান না করলেও পূর্ণ মানবতার জীবন্ত আদর্শস্বরূপ মানব সমাজের সম্মুখে বিদ্যমান থেকে প্রকারান্তরে মানুষকে পূতঃচরিত্র এবং পূর্ণ মানবতা শিক্ষা দিয়ে থাকেন।...” এই অধ্যায়ে আত্মার অলৌকিক ক্ষমতার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলা হয় ঃ ... “নবুওয়ত এবং বেলায়ত পদ দুটো মানুষের জন্য মহাগৌরবজনক পর্ববিশেষ। এই অসাধারণ ক্ষমতাশীল মানুষগুলো ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন: (১) সর্বসাধারণ যা স্বপ্নযোগে দেখতে পান, তাঁরা তা জাগ্রত অবস্থায় স্পষ্ট দেখতে পান, (২) সাধারণ মানুষের আত্মা কেবল তার নিজ দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আত্মা জগতের মঙ্গলের জন্য দেহ ছাড়া বাইরের যাবতীয় পদার্থের উপরও ক্ষমতা চালাতে পারে; (৩) সাধারণ মানুষ যে জ্ঞান পীর বা ওস্তাদের নিকট শিক্ষা করে, তাঁরা তা স্বীয় অন্তরের মধ্যে প্রাপ্ত হন। এটা সকলেরই জানা আছে যে, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কিঞ্চিৎ পবিত্রাত্মা লোকের শিক্ষাগ্রহণ ব্যতীতই কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান আপনা-আপনি অন্তরে এসে যায়। সুতরাং, যাঁরা অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাঁদের অন্তর বা আত্মা সম্পূর্ণ নির্মল, তাঁরা সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান নিজেদের আত্মার মধ্যে লাভ করতে পারবেন–এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এই প্রকারে লব্ধ জ্ঞানকে ‘এলমে–লাদুন্নী’ বলে। এই জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলছেন, ‘.. আর আমি আমার নিকট থেকে তাঁকে জ্ঞান দান করেছি (সূরা কাহাফ: ৬৫)।’ উপরোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানের অধিকারী সিদ্ধপুরুষগণ হয়তো একজন বড় পয়গম্বর, না হয় একজন বড় মাপের ওলী। এই ক্ষমতাত্রয়ের কোন একটি পূর্ণ মাত্রায় লাভ করলেও তিনি ক্ষমতাশালী ওলী শ্রেণির অন্তর্গত বলে গণ্য হবেন[৩]।”

বলা বাহুল্য; ‘হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত’ গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলো উপরোক্ত সমীক্ষণের ফলিত রূপ যেন।

এই অধ্যায়ে হযরত আকদাসের রুহানী ও দুনিয়াবী কল্যাণ তৎপরতার যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হলো, তাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের ‘রব্’, ‘রহমান’, ‘রহিম’ সিফতের সমকালীন প্রতিভূ হিসেবে তিনি বিম্বিত। আধুনিক লেজার টেকনোলজিতে (laser technology) আলোকরশ্মিকে ঘণীভূত ও তীব্র করে একদিকে চালনা করে হলোগ্রাম (hologram) সৃষ্টি করা যায়, যাতে একটি ক্ষুদ্র ‘ভগ্নাংশের’ মধ্যে ‘সমগ্র’-এর উপস্থাপন ঘটানো হয়। মানুষ মহাসৃষ্টির একটি

অতি ক্ষুদ্র চলমান ভগ্নাংশ মাত্র। মহান ওলী-আল্লাহ্‌রা তেমন গুণসম্পন্ন মানুষ যাতে মহান স্রষ্টার সকল কল্যাণময়তা সঞ্চারিত ও সক্রিয় থাকে। গাউসিয়াত ও কুত্‌বিয়াত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হযরত আকদাস (ক.) তেমনই এক মানব, যিনি অন্যান্য অনেক মহৎ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি মাটির পৃথিবীতে বহুত্ববাদী পালনবাদী সংসারের কল্যাণময়তার হলোগ্রাম হিসেবেও প্রতিভাত।

টীকা:

১. মর্মবস্তুসমূহ ‘গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত সঙ্কলন–সংগ্রাহক, মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী; পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৮১ ইং তথা প্রথম আলোকধারা বুক্‌স প্রকাশন্ত ২০২১ইং গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

২. পূর্বোক্ত: ‘গায়েব প্রকাশ’ অনুচ্ছেদ, পৃ: ১৮৫।

৩. কিমিয়ায়ে সাআদাত বা সৌভাগ্যের পরশমনি, প্রথম খণ্ড, দর্শন ও এবাদত খণ্ড, বঙ্গানুবাদ মাওলানা নূরুর রহমান, এম এম; নতুন সংস্করণ, ৯-১২-১৩৭৮ হিজরী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

তৃতীয় অধ্যায়

মুজাদ্দেদিয়াতের মহাসড়কে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)

॥ প্রথম পর্ব ॥

১. মুজাদ্দেদিয়াত সংক্রান্ত মৌলিক ধারণাঃ

আল-কোরআনের বয়ান অর্থাৎ বিবরণে বিভিন্ন অংশের সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে রিসালাত ও নবুয়তের তুলনারহিত মিশনের দ্বিতীয় পরবর্তী ধাপে মুজাদ্দেদিয়াতের সামাজিক, নৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি পার্থিব অপরিহার্য বিষয়ে শিক্ষণীয় তথ্য ও উপাদানের সুবিন্যস্ত মওজুদ দৃষ্টিগোচর হয়। আখেরী নবীগণ- নবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর পূর্বের ও পরবর্তী সময়ে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল।

মুজাদ্দেদিয়াতের লক্ষ্যবিন্দু হলো ইসলাহ্ (সংশোধন) ও তাজদীদ (সংস্কার) অর্থাৎ আল-কোরআনের মূলনীতি অক্ষতুন্ন রেখে সাজুয্যপূর্ণ নবায়ন। আল-কোরআনে মানবজাতির সৃষ্টি ও বিবর্তনের সুবিন্যস্ত ইতিহাসের শিক্ষা ও দর্শনের যে সারমর্ম সহজ ভাষায় বিবৃত হয়েছে; তাতে দেখা যায় যে, অতীতকালে বিভিন্ন মহান নবী-রাসুলদের আবির্ভাব মধ্যবর্তী সময়ে সমকালীন ধর্ম ও সমাজ আচার-বিচার সব ক্ষেত্রে সময়ের প্রগতিশীল বিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় উপযোগীভাবে কর্মসূচি গ্রহণ ও সম্পন্ন করা হয়। এ বিষয়ে আল-কোরআনে বিবৃত হয়েছে: “ইন্নামা আন্তা মুনযিরুওঁ লিকুল্লি কাওমি[১] হাদ[২] [অবশ্যই আপনি কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক কওমের জন্য রয়েছেন পথ প্রদর্শক]। এ প্রসঙ্গে

আল-কোরআনের বর্ণনাভঙ্গীতে ‘শাশ্বত বর্তমান’ ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। সূরা সেজদাহ-য় হযরত মূসা (আ.)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বর্ণিত হয়েছে:

“ওয়ালাক্বদ আ-তাইনা মূসাল কিতাবা ফালা তাকুন্ ফি মিরইয়াতিম মিল্ লিক্বায়িহী ওয়া জাআল্নাহু হুদাল লিবানী ইস্রাঈল। ওয়া জাআল্নাহু মিনহুম আইম্মাতাই ইয়াহাদ্বনা বিআমরিনা, লাম্মা সাবারু ওয়া কানু বিআয়াতিনা ইছুক্বিনুন [আমি এর আগে মূসা (আ.) কে কিতাব (তাওরাত) দিয়েছি, সুতরাং আপনি (মিরাজ রজনীতে) তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে নিঃসংশয় থাকুন, আমি এটাকে (তাওরাত) বনী ইস্রাইলের জন্য পথ নির্দেশক করেছি। আর আমি তাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি, তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন, তাঁরা ধৈর্য্য ধারণ করতেন আর আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন (৩২: ২৩-২৪)]।

পবিত্র হাদিসে রসূলে বর্ণিত:

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্য প্রতিশতকের প্রারম্ভে এমন ব্যক্তির উত্থান ঘটাবেন, যিনি (বা যারা) উম্মতের জন্য তার দ্বীন “নবায়ন করবেন” (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, হাদিস নং ৪২৯১, ৪র্থ খণ্ড, ৪৮০)।

সুপ্রসিদ্ধ অন্তঃচক্ষুধারী অলি হযরত মহিউদ্দিন ইবনু আরাবি, যিনি হযরত মহিউদ্দীন গাউসুল আযম জিলানীর (রা.) অদ্বিতীয় শিষ্য ও তাঁর উপাধি নামে বিভূষিত ছিলেন। তিনি হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ইহজগতে আত্মপ্রকাশের আরো প্রায় ৫৮৬ বছর পূর্বে ৬৩৬ হিজরীতে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, নবী করিম (দ.)-এর আরবে অস্তমিত রবি এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে পুনঃউদিত হবে। তাঁর নাম থাকবে খোদার জাতী নাম “আল্লাহ্” এর সাথে নবী করিম (দ.)-এর বেলায়তী নাম আহমদ। অতএব, মনে হয় “আহমদ উল্লাহ্” আল্লাহ্-এর জাতী নাম এবং নবী করিমের (দ.) বেলায়তী নামের সংমিশ্রণ। তাঁর জন্মস্থান ভূখণ্ড মধ্য রেখার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত থাকবে। এটা চীন পাহাড়ের পাদদেশে বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন জাতির সমাবেশ স্থল হবে।[৩] জীবনী ও কেরামত যুগপৎ দর্শন ও অধ্যাত্ম জগতে এখনো কার্যকরভাবে প্রভাব বিস্তারকারী হযরত ইবনুল আরাবিরও উপরোক্ত পূর্বাভাষ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২. সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক প্রক্ষেপনঃ

মুজাদ্দেদিয়াত সম্পর্কে নবীজীর (দ.) এই সুস্পষ্ট উক্তি এবং আল-কোরআনে পেশকৃত রেফারেন্স মানব সভ্যতা-ধর্ম-চিন্তায়ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই থিওরীর মানদণ্ডে মানব সমাজের অতীত ও বর্তমান পর্যবেক্ষণ করলে লোক ও লোকাতীত ভূবনে চর্চিত অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, যা অতীতে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে মানব-অতিমানব-ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণায় জটিল নেটওয়ার্কের জন্ম দিয়েছে এবং এর জের এখনো অব্যাহত। দর্শন ও ধর্ম বিশ্বাসের এই জটিল বিষয়ের পরিভাষা হলো : incarnation বা মানব-বিশেষের দেবতায়ন বা বিশেষ ব্যক্তির উপর দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব আরোপ। দর্শন ও ধর্মবিশ্বাস ছাড়িয়ে তা কোথাও কোথাও রাজনীতি, রাজা-রাজড়ার ক্ষেত্রেও জেঁকে বসে। অতীত ইতিহাসে রাজা-সম্রাটকে 'ঈশ্বরের সাক্ষাত' প্রতিভূ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এটাকে 'বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ' রূপে অভিহিত করা হয়। এটা মানব চারিত্র বা ফিত্‌রাতের পরিপন্থী। ধর্ম, ঈশ্বরের নামে হত্যা, ধ্বংস, ভূমি ও সম্পদ দখলই এই তত্ত্বের উপসংহার, যা মদীনায় স্বল্পকালীন সৎ খিলাফত যুগ ব্যতীত পূর্বের ইতিহাস এবং এর পর খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আধুনিক অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের বন্ধনীভুক্ত ধনতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও বিকাশকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে যন্ত্রবিজ্ঞান সমৃদ্ধ ইউরোপের সর্বত্র সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি সব বিষয়ে নতুন নতুন চিন্তার বৃক্ষ-তরুলতার বিকাশ ঘটতে থাকে। ঐ মুদ্দত্রে 'ঈশ্বরের' প্রতিনিধিত্বরূপে বর্ণিত রাজতান্ত্রিক মতবাদ, শক্তিমূলক মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ প্রভৃতির প্রতাপ দেখা যায়, যা মানবের সামগ্রিক সত্তা ও ঐহিক-পারত্রিক চাহিদার সুষম ভারসাম্যপূর্ণ কোন আচরণবিধি বা দ্বীন-ধর্মের রূপরেখা উপস্থাপন করতে পারেনি। সপ্তদশ-অষ্টদশ খ্রিস্টীয় শতকে হবস, জন লক, রুশো প্রমুখের রাষ্ট্র চিন্তা ও সমাজ দর্শনের আবির্ভাব ঘটে সমকালীন ইউরোপে; যা সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণে মদীনা সনদে বিবৃত বহুত্ববাদী সমতাবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের যৎকিঞ্চিৎ তৎকালীন ইউরোপীয় সংস্করণ হিসাবে প্রতিভাত হয়। ঐ সময়কার রাষ্ট্রদর্শন মোটা দাগে 'সামাজিক চুক্তিবাদ' নামে অভিহিত, যা মদীনা সনদেরও আংশিক মর্মবাণী।

মানবজাতি ও সমাজের পপ্রগতিশীল বিবর্তনের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান শিক্ষা এই যে, কোন মতবাদ বা-রংস, সামাজিক আচার-রেওয়াজ-আনুষ্ঠানিকতা সর্বকালের ও সর্বদেশের জন্য অভিন্নভাবে গৃহীত হয়নি এবং বহু বাস্তব কারণে তা সম্ভবও নয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সমাজতত্ত্বের স্বরূপও ভিন্নতর হয়। রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞান নব সৃজনমুখী গতিশীল বিজ্ঞান বিধায় এর বিষয়বস্তু ও আলোচনা-পর্যালোচনা কালিন চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানী হেনরী সিজউইক বলেন : রাষ্ট্র বিজ্ঞানের উদ্দিষ্ট হলো 'রাষ্ট্র ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়। সমস্যাগুলোর যুক্তিপূর্ণ অপটিমাম সমাধান আনয়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উদ্ভাবনই শুধু নয়, বরং আমাদের জ্ঞান, চিন্তা ও যুক্তির সাথে সেগুলোকে সমকালীন ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সুচিন্তিত উপায়ে বিন্যস্ত ও সুস্পষ্টভাবে পরিবেশন করা।' রাষ্ট্রদর্শনের সাথে রাষ্ট্র প্রশাসন পদ্ধতির সমীক্ষণ, সমন্বয় ও প্রয়োগের সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ক্যাটলিন, জেলেনিক, পোলক, সিজউইক রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই দুই শাখায় বিভক্ত করেন। রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, উৎপত্তি, আদর্শ নীতিগত গঠন প্রণালী, প্রয়োজনীয় পরিমার্জন প্রভৃতি **তাত্ত্বিক অংশ** এবং সরকার, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন, সময়োচিত সুবিচারমূলক বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-সংগঠন ব্যবস্থা প্রভৃতি **ব্যবহারিক অংশের** অন্তর্ভুক্ত। গ্রীকনগর রাষ্ট্র থেকে শুরু করে রোমক, পারসিক প্রভৃতি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভিজ্ঞতার পর মদীনা সাধারণতান্ত্রিক (republic) রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় শাখার কালিক উপযোগী ব্যবস্থার সফল অনুশীলন লক্ষ্যণীয়, যার রেশ মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের চর্চায় অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) জীবন, শিক্ষা ও কর্মযোগ এবং তার রচিত বহুমাত্রিক বিষয়াবলী সমৃদ্ধ পুস্তকাদিতে বিবৃত ও বিন্যস্ত রয়েছে। তবে এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মদীনা সাধারণতন্ত্রের তাত্ত্বিক অংশ অর্থাৎ ঈমান, রিসালাত আখিরাত প্রভৃতিতে আস্থা মৌলিক ও অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে ব্যবহারিক অংশে খোলাফায়ে রাশেদার সময়েও বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সংস্কার সাধিত হয়েছে, যার গুণগত উৎকর্ষতা যন্ত্রবিজ্ঞানময় সভ্যতাপুষ্ট ঊনবিংশ, বিংশ শতাব্দীতেও স্বীকৃত, প্রশংসিত, অনুসৃত হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের (রা.) সর্বজন প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদের রাষ্ট্রীয় তথা সর্বজনীন মালিকানানীতি,

প্রশাসনিক ব্যয় সম্ভাব্য স্বল্প পরিসরে সীমিত রাখা, যোগ্য ব্যক্তিকে যথার্থপদে নিয়োগ এবং সার্বক্ষণিক চেক এ্যান্ড ব্যালেন্সে রাখা; আহার্য তথা সম্পদ বণ্টনে প্রয়োজনানুগ চাহিদার মানদণ্ড নির্ধারণ, মহিলাদেরও যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান (যেমন, শিফা বিনতে আবদুল্লাহ্ নাম্নী এক বিদূষী মহিলাকে মদীনার বাজার-পরিদর্শকের পদে নিযুক্তি), রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার বাহিনীকে প্রকাশ্যে জনসমর্থিত সৎ সরকারের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ, সশস্ত্র বাহিনীকে জনসমর্থিত নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণে রক্ষণ, কৃষি ও কৃষকবান্ধব যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ, মনোপলি-কার্টেল-সিন্ডিকেট সিস্টেম গড়ে উঠতে না পারার ব্যবস্থাকরণ। সম্পদের অপ্রয়োজনীয় পুঞ্জীভবনের নৈতিক ও ব্যবহারিক অবকাশ রুদ্ধকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ বলিষ্ঠকরণ এই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও (২০২৩) এমনকি পশ্চিমা বিশ্বেও কোন না কোনভাবে অনুসৃত হচ্ছে। তিনি নিজ পুত্র আবদুল্লাহকে খলিফা পদে প্রার্থী না হতে কিম্বা প্রার্থীতায় মনোনয়ন না দিতে সকলকে নসিহত করেছিলেন। পাঁচ সৎ খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত ওসমান গনি (রা.), হযরত আলী (ক.) এবং হযরত হাসান (রা.)-এর প্রশাসনিক নীতি-নির্দেশনা সম্বলিত সরকারি পত্রাদি ও ফরমান এখনো গভীর নিষ্ঠাসহকারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠিত ও নীতিনিষ্ঠ সরকারে অভিনিবেশসহকারে অনুসৃত হয়। খলিফা হযরত উসমানের (রা.) সময়ে মদীনা সাধারণতন্ত্রের প্রতি গণমানুষের সহজাত আনুগত্যের ফলে সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তবে এর সাথে সঙ্গতি রেখে আল-কোরআন ও হাদিসের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চেতনার শাণিত প্রসার ও বিকাশ সম্ভব হয়নি; যা সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক সীমাবদ্ধতার সাথে জড়িত। এর সাথে তৎকালীন রাজতান্ত্রিক রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্য ইসলামী খেলাফতের প্রসার রুদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার চক্রান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খলিফা হযরত ওমরের (রা.) হত্যার সাথে পারসিক রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র, হযরত ওসমানের (রা.) সময়ে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য রোমক সাম্রাজ্যাধীন মিসরীয় বংশজাত আবদুল্লাহ ইবনে সাবাহ প্রমুখদের সর্বনাশা চক্রান্ত, ইসলামের প্রজাতান্ত্রিক মূলনীতি এবং পরিবারতান্ত্রিক আমীরতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান নৈতিক-সামাজিক পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব, আল-কোরআন মূলে নবীজী (দ.) ও তাঁর সৎ সাহাবাদের জীবনব্যাপি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রসাধনাকে তছনছ করে দেয়। বাঙালি বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ড. মুহম্মদ ইসহাক, ড. আবদুল মোতালেব,

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিসরের বিখ্যাত সাংবাদিক গ্রন্থকার ড. মুহম্মদ হোসাইন হাইকাল, এমনকি বরেণ্য ঐতিহাসিক আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া বালাযুরী, আত্-তাবারী, ইবনে খালদুন প্রমুখ বিভিন্ন প্রামাণ্য প্রেক্ষাপটে এসব পরিস্থিতি বিবৃত ও মূল্যায়ন করেছেন। হযরত মূসা (আ.) থেকে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত প্রত্যেক সফল নৈতিক, সামাজিক ও রুহানী বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে এই বেদনাদায়ক চিত্র দৃশ্যমান হয়। এমনকি তাঁদের মাধ্যমে প্রবর্তিত মূলনীতি থেকে ভ্রষ্টতাও পরিলক্ষিত হয়। **পাঁচ সৎ খলিফার পর ব্যবহারিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রশাসন ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত ব্যত্যয় ঘটলেও অবশ্য আল-কোরআন ভিত্তিক মুহাম্মদী-আহমদী নীতি এখনো অক্ষত্ন ও অক্ষত রয়েছে।** কোন না কোন প্রকারে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছুভাবে অনুসৃত হচ্ছে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বহু শতকের পর রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, শোষকপুঁজিতন্ত্রের উৎপাত ও শোষণে বিক্ষত ইউরোপে বিবিধ প্রকার গণমুখী প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও জনগণের বৃহত্তর অংশের সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার কারণে অতি অল্পসময় পর তা বিক্ষত ও ব্যাহত হয়। রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপ, চীনসহ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক অতীতের রাজনৈতিক পশ্চাদপদ স্খলনের ঘটনা প্রবাহ সেই সত্যতা বহন করে।

আল-কোরআন তথা সুন্নাতুল্লাহ্ এবং সুন্নতে রসূলের তাত্ত্বিক ও নৈতিক অক্ষত অবস্থান অক্ষত্ন রাখার দায়িত্ব নবীজীর (দ.) ভাষায় মহান মুজাদ্দিদদের। মুজাদ্দেদিয়াত একদিকে যেমন মানবের দেবতায়ন, মানুষের সরল বিশ্বাস ও প্রাকৃতিক অসহায়ত্বের সুযোগে যাজকতান্ত্রিক অনাচার, শোষণ-পীড়নের উপদ্রব রুখে দিয়েছে যুগে যুগে; অন্য দিকে তেমনি অগণতান্ত্রিক, পারিবারিক রাজতান্ত্রিক কুশাসনের বিরুদ্ধে সুউচ্চ হিমালয় প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করেছে।

মুজাদ্দেদিয়তের এই অপরাজেয় মিছিলে যাদের পদচারণার কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, তাদের মধ্যে আছেন হযরত হাসান বসরী (র.) খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র.), চারি ইমাম, ইমাম গাজ্জালী (র.), বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র), আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী (র.), নুরুদ্দিন জঙ্গী ও সালাহউদ্দিন আইউবী (র.), ইয়াজউদ্দিন আবদুস সালাম (র.), মওলানা জালালুদ্দিন রুমী (র.) খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি (র.), খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.), খাজা শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া মানেরী (র.),

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (র.), বাংলা মুল্লুকে হযরত শাহ্ জালাল (র.), শাহ্ আলী বাগদাদী (র.), শাহ্ মখদুম (র.), হযরত খান জাহান আলী (র.) প্রমুখ। মুজাদ্দিদ একই সময় একই অঞ্চলে ও বিভিন্ন অঞ্চলে এক বা একাধিক এবং দ্বীনের একটি বা একাধিক বিষয়ের জন্য হতে পারেন। শতাব্দীর শুরু, মধ্য ও শেষ যে কোন সময় হতে পারেন। তিনি স্থান-কালের উপযোগী কাজ সম্পাদন করেন। তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয়তা ও নির্ভীকতা প্রদান করা হয়।[৪]

৩. হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মুজাদ্দেদিয়াত প্রসঙ্গ

১নং পর্বে বর্ণিত সূরা সাজদার (৩২: ২৩–২৪) তথ্য বিশ্লেষণে বিজ্ঞজনদের মতে মহান রাসুলদের সময়ে সার্বক্ষণিক সামগ্রিক কঠিন দায়িত্ব ছাড়াও 'পথ প্রদর্শক, দিশারী' (হা'দ) প্রভৃতি আটপৌরে সামাজিক ধ্যান-ধারণার শিক্ষা ও চর্চা বাস্তব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান ছিল। হযরত আদম (আ.), হযরত শীস (আ.), হযরত ইদ্রিস (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর পর থেকে হযরত মূসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত সময়ে সমাজ, রাজ্য, প্রশাসন ব্যবস্থার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নবী-রাসুলগণ ছাড়াও তাঁদের নীতি অনুসারী পথ প্রদর্শক, সংস্কারকের আবির্ভাব ও ভূমিকা তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আল-কোরআনের এই সূত্র ধরে নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.) দ্বীন নবায়ন বা তাৎক্ষণিক প্রায়োগিক সংস্কারের বিষয়টা উল্লেখ করেছেন, যা ইতোপূর্বে আবু দাউদ সংকলিত হাদিস সূত্রে উৎকলিত হয়েছে। এর সামাজিক সরলার্থ এই যে, স্থান কাল-পাত্র-পরিবেশ অনুযায়ী উপকারী পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "মানব-কাণ্ডারী জগতগুরু মহামানব বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর অন্তর্ধানের প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর কাল পর ছয় শত শতাব্দীতে যখন ধরণীর বুকে ধর্মীয় জগতে খোদাপ্রেম প্রেরণা ধর্মীয় আলোক রশ্মি নির্জিবতা ও অজ্ঞানতার আবরণে আচ্ছাদিত হইতেছিল, তখন যুগ উপযোগী আধ্যাত্মিক সবল হাদীর অভাবে ইছলাম রবি অস্তমিত প্রায় ডুবুডুবু অবস্থায় উপনীত হইতেছিল। আদল সৎজ্ঞান ও ঐশ্বরীক অনুপ্রেরণা বিহনে ধর্মাগ্রহী মুছলিম সমাজ বহুবিধ ধর্ম মতবাদী ধর্মীয় পন্থায় বিভ্রান্ত ও ধাঁধায় পতিত হইয়া নিষ্প্রাণ ধর্মনীতি পালনে এদিক ওদিক ঢলিয়া পড়িতেছিল; এহেন মহা সঙ্কট মুহূর্তে দয়াময় খোদাতা'লা তাঁহার চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আধ্যাত্মিক করুণ

প্রেম প্রেরণাধারী বিশ্বঅলি হাদীকুল শিরমণি হযরত গাউসুল আযম মহিউদ্দিন শাহ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (র.) কে ধর্মনীতি সংস্কারক; পুনঃধর্মসঞ্জীবক মহিউদ্দিন খেতাব ও ক্ষমতাদানে ভবে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারই আধ্যাত্মিক প্রভাবালোকে মুসলিম ধর্মীয় জগত পূর্ণোজ্জ্বল ও সজীব হইয়া পুনর্জীবন লাভ করে। তিনি তাঁহারই বেলায়েত প্রভাবে অনুকুল শাসন শক্তির সহায়তায় শরিয়ত মোতাবেক বিশ্ব ইসলামকে বাস্তব আধ্যাত্মিক আলোকে টানিয়া আনিয়া নবজীবন দান করিয়া সুপথগামী করিয়াছিলেন।

ইহার সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক বৎসর কাল পর, আবার মুসলিম জাহান সনাতন ইসলামিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান খোদায়ী প্রেরণা শক্তি ও সময়োপযোগী মৃত সঞ্জীবক যুগসংস্কারক শক্তিশালী হাদীয়ে কামেল রূপী সূর্যে আধ্যাত্মিক রশ্মির অভাবে পতিত হয় এবং ধীরে ধীরে খোদা প্রেম প্রেরণা হারা হইয়া ধর্মনীতি পালনে এবং আধ্যাত্মিকতায় অনাসক্ত ও উদাসিন হইতে থাকে। মুসলিম জাহান পার্থিব মোহরিপু ও ইন্দ্রিয় প্রভাবে বিভোর হইয়া "তাকওয়া" ও বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিতে থাকে। খোদাভীতি ও প্রেম-প্রীতি ভুলিয়া আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া অতি সুখ; অতি বিলাস ও অতি লোভে নানা প্রকার শঠামী পন্থা অবলম্বনে অন্যায় ও অবৈধ আচরণে লিপ্ত হইতে থাকে।

"ঠিক এমন সময় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর, বাংলায় এবং কিছু কালের মধ্যে সমগ্র ভারত এমন কি ভুখণ্ডের প্রায় অঞ্চলে ইংরেজ শাসন ও প্রভাব প্রবর্তিত হয়। সমস্ত ধর্মীয় প্রভাব ও প্রভাবে পরিচালিত শাসন শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এবং কালক্রমে এক নূতন ধর্মবিহীন রাষ্ট্রনীতির পত্তন হয়। এই সময়ে ধর্মীয় আহকাম, বাধাগড়া শরীয়ত শাসন শক্তি সহায়তা হারাইয়া প্রাধান্যতা ও ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ে। দায়িত্ব কেবল মাত্র বিবেক ও সৎজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হইয়া দাঁড়ায়।

এই যুগে নির্জ্জীব ধর্মীয় মানবকুল খোদায়ী দায়িত্ব বিচারবুদ্ধি খোদাভীতি ও পরকালীন পরিণতি ভুলিয়া নাছুতি স্বভাবকাম্য নীতিতে পরিচালিত হইতে থাকে। ভবস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবাদতে মালী–জাকাত, সদকা, কোর্বানী আমানত আদায় প্রভৃতি তাহাদের স্বভাবগত ইচ্ছার একেবারে প্রতিকূলে গিয়া দাঁড়ায়। পরকালীন স্বার্থ নিহিত এবাদতে-বদনী একমাত্র তাহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া পড়ে। [জীবনী ও কেরামত, প্রথম পরিচ্ছেদ]।"

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

প্রথম পর্বে মোজাদ্দেদিয়াতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ধারাবাহিকতা ও বহু মাত্রিকতার বাস্তব দৃষ্টান্ত সমৃদ্ধ বিকিরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মোজাদ্দেদিয়তের নিশ্চয়তা প্রকাশক একটি রুহানী, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ঐতিহাসিক সবুত বিশ্ববাসীর কাছে পেশ করে গেছেন শায়খুল আকবর হযরত মুহীউদ্দিন ইবনুল আরাবি (র.) [১১৬৫–১২৪০ খ্রি.] অর্ধসহস্রাধিক বছর পূর্বেই তাঁর বিশ্বখ্যাত 'ফসুসুল হেকম' গ্রন্থে। অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলোর উদ্ধৃতিসহকারে পুরো বিষয়টা অত্যন্ত সহজভাবে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন। নিম্নে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হলো:

ঊনবিংশ-বিংশ খ্রিস্টিয় শতাব্দীর পূর্বাঞ্চলীয় মোজাদ্দীদ বিশ্ব অলী গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহ্মদুল্লাহ (ক.) এর আবির্ভাবের পূর্বাভাষ

পীরানে পীর দস্তগীর হজরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (ক.) গাউছুল আ'জম এপ্তেতাহীয়া (আরম্ভকারী) মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর ওফাতের পর দীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বৎসর সময়ের দূরত্বের দরুণ এবং ইস্লামী হুকুমতের পতন ও বৃটিশ হুকুমতের পত্তনের ফলে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুগ সংস্কারক অলীউল্লাহের আবশ্যকতা প্রকট হইয়া উঠে।

এই যুগ সংস্কারক বিশ্ব অলীর শুভ আবির্ভাব সম্বন্ধে এলমে মাআরেফ অর্থাৎ পরিচিতি জ্ঞান সম্বন্ধে হজরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী সুপ্রসিদ্ধ ফছুছুল হেকম নামক কেতাবের ফচ্ছে শীচের শেষভাগে বর্ণনা করিয়াছেন।

ترجمہ فصوص الحکم - صفحہ ۹۷

اس نوع انسان میں شیث علیہ السلام کے قدم بقدم ایک لڑکا پیدا ہو گا اور انکے اسرار کا وہی حامل ہو گا اور اسکے بعد اس نوع انسانی میں پھر لڑکا نہ ہو گا اور وہی لڑکا خاتم الاولاد ہو گا۔

“মানবজাতির মধ্যে হজরত শীচ (আ.) এর অনুসারী ও তাঁহার ভেদাভেদের ধারক ও বাহক এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হইবেন। ইহার পরে এইরূপ মর্য্যাদা সম্পন্ন কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেন না। তিনিই খাতেমুল অলদ হইবেন।” (উক্তরূপ মর্যাদা সম্পন্ন সর্বশেষ সন্তান) ফচ্ছে শীচী ৯৭ পৃঃ

“হজরত শায়খে আকবরের পরিভাষায় অলদ ঐ ব্যক্তিকে বলে, যেই ব্যক্তি পিতার গুপ্ত রহস্যের হামেল বা বাহক। “আল অলদু ছিররুণ লেআবিহে” (ফচ্ছে শীচী ৯৫ পৃঃ) যেই ব্যক্তি পিতার চিন্তাধারাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ফলপ্রসু করে তাহাকেও অলদ বলে। (ফচ্ছে নূহী ৩য় অধ্যায় ১০১ পৃঃ) যে সন্তানে নিজ চিন্তাধারা ফলপ্রসু নহে তাহাকে অলদ বলা হয় না। “লা এয়ালেদুনা ইল্লা ফাজেরান অকফ্ফারা” (ছুরা নূহ্-২৭) অর্থাৎ তাহাদের চিন্তাধারা হজরত নূহ (আ.) এর চিন্তাধারার ফলপ্রসু নহে। বরং বেহায়াপনা ও কুফরী। (ফচ্ছে নূহী ৩য় অধ্যায় ১০৫ পৃঃ)। কেনানের চিন্তাধারা হজরত নূহ্ (আ.) এর ফলপ্রসু নহে বলিয়া তাহাকে আহল বা অলদ বলিয়া কোরআন স্বীকার করে নাই। বরং “লায়ছা মিন আহলেকা” অর্থাৎ তোমার আহল বা অলদ নহে (ছুরা হুদ–৪৬) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

“হজরত সোলেমান ফারছী (র.) পারস্যের অধিবাসী হইলেও রসূলে করিম (দ.) তাঁহাকে আহল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাই হজরত নূহ্ (আ.) কোরআনের পরিভাষায় বলিয়াছেন “লাতাজার আলাল আরদে মিনাল কাফেরিনা দইয়ারা” (ছুরা নূহ্–২৬) অর্থাৎ জগতের অধিবাসী হিসাবে অস্বীকারকারী ও খারাপ কার্য্যে উৎসাহ দানকারী মিথ্যুককে রাখিওনা। যেহেতু তাহাদের “নজরে ফিকরী” বা চিন্তাধারা ভাল কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। এবং কামেলের নজরে ফিকরীর ফলপ্রসু নহে।

“সুতরাং, দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহককে “অলদ” বা আহল বলে। এবং বিপরীত কার্য্যকারীকে আহল বা অলদ বলা যায়না। এই হিসাবে খাতেমুল অলীই খাতেমুল আওলাদ বা অলদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু তজকেরাই শায়খে আকবর (ক.) এর ২১ পৃষ্ঠায় ফতুহাতে মক্কীর ৭৩ অধ্যায়তে বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ বেরাছতী বা উত্তরাধিকারীত্ব হইল খাতেমুল বেলায়ত; এই ‘খতম’ বা শেষ দুই প্রকার।

প্রথম ঃ– হজরত ঈসা (আ.) এক নম্বর বা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি রেছালত ও বেলায়তের যুক্ত অধিকারী। ইনি সমস্ত বেলায়তের খাতেম এবং কেয়ামতের শেষ নিদর্শন। শেষ জমানাতে তিনি ব্যক্ত হইবেন।

খাতেমুল অলীর দর্শন

"দ্বিতীয় ঃ– বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর খাতেম। ইনি বংশগত ও দেশগত হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়া ব্যক্ত হইবেন। ৫৯৫ হিজরী সনে আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার শরীরস্থ মোহরে বেলায়তের চিহ্ন তিনি আমাকে দেখান। তাঁহার খোদায়ী রহস্যপূর্ণ বাণী সাধারণ লোকেরা স্বীকার করিবে না। যদিও তাঁহার খাতেমে বেলায়তের চিহ্ন সাধারণ লোকের চক্ষুর অন্তরালে তথাপি আমার জমানাতেও তিনি বিদ্যমান আছেন।"

"এই হিসাবে খাতেমুল আউলীয়া ঐ সময় হইতে আওলীয়া যেই সময় হজরত আদম (আ.) পানি ও মাটির সহিত সংমিশ্রিত ছিলেন। (ফছুছ ৯৩ পৃঃ)[১]

"খাতেমুল আওলীয়া রাসুলুল্লার অলীয়ে ওয়ারেছ হন। খাতেমুল আওলীয়া রাসুলুল্লার বিভিন্নরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপ" ফছুছ ৯৩ পৃঃ। বুজর্গী হিসাবে উনিই শ্রেষ্ঠ যিনি "নিছবতাইনে আ'দমী" অর্থাৎ আগত বিগত জমানার অবস্থার বেষ্টনকারী হন। কামালিয়তের বা বুজর্গীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজর্গিতে বাদ পড়েনা, যদিও তাঁহার এই গুণাবলী বহির্দৃষ্টিতে বা বিচার বুদ্ধিতে অথবা শরআ মতে ভাল বা মন্দ। এই সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত "আল্লাহ্" নাম বিশিষ্ট নামধারী অলী উল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট (ফছুছ ১১১ পৃঃ)।

"বেলায়তে খিজরী হিসাবে তিনি ফরদুল আফরাদ "জামে-উত্ তনজিহ্ ওয়াত্তশবীহ্" অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। (মোতালেবে রশীদী ২৬৮ পৃঃ) ইহার উপরে বেলায়তের কোন দরজা নাই। খাতেমুল আউলীয়া ইসলামী ইমারত বা দেওয়ালের শেষ ইট বা গাঁথুনী, যাহার দ্বারা ইসলামী ইমারত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে (ফছুছ ৯২ পৃঃ)।

"ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীই খাতেমুল অলদ বা আওলাদ। যেহেতু এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে সর্বোচ্চ বেলায়ত মর্য্যাদা বা যোগ্যতা সমাবেশীত বা ব্যক্ত হওয়ার ফলে এই "এস্তেহকাকে অজুদী"

বা ব্যক্তিত্ব, ব্যক্ত হওয়ার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট নাই। কাজেই তিনিই খাতেমুল অলদ বা শেষ আওলাদ।

"এই ছেলের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার এক বোন জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার জন্ম চীন প্রান্তে হইবে। তাঁহার ভাষা সেই নগরের ভাষা হইবে। অতঃপর, নর-নারীর মধ্যে বন্ধ্যারোগ সংক্রমিত হইবে। জনন-প্রজনন ব্যতীতই বিবাহের আধিক্য হইবে। মানবজাতিকে তিনি আল্লার দিকে আহ্বান জানাইবেন, কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাইবেনা। তাঁহার ও সেই যুগের মোমেনদের তিরোধানের পর মানব স্বভাব চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাবে পরিণত হইবে। হালাল হারাম পরিচয় করিবেনা। ধর্ম বিবেচনা হইতে দূরে সরিয়া প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নির্দেশে কামস্পৃহা চরিতার্থ করিতে মশগুল থাকিবে।"

ترجمہ فصوص الحکم فص شیثی صفحہ ۹۳

اور اوسکے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی- یہ لڑکے سے پہلے پیدا ہوگی اور لڑکا اوس سے پیچھے پیدا ہوگا- اور لڑکے کا سر لڑکی کے دونون پیر ونکے پاس ہوگا- اور اسکی ولادت چین مین ہوگی اور اسکی زبان اس شہر کی زبان ہوگی اور اسکے بعد مرض بانجھ مردون اور عورتون میں سرایت کریگا اور بغیر توالد اور تناسل کے نکاح کی بڑی کثرت ہوگی وہ لڑکا اونکو خدا کی طرف بلاوے گا لیکن کوئی قبول نکریگا اور جب اللہ اسکو اور اس زمانہ کے مومنون کو لے لیویگا تو باقی لوگ مثل چار پائے اور بہائم کے جاوینگے نہ حلال کو حلال جانینگے نہ حرام کو حرام سمجھینگے

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হজরত আকদাছের (ক.) প্রতিই প্রযোজ্য হয়। কারণ ঃ–

১) হজরত ইবনে আরবীর বর্ণনামতে হজরত শীচ (আ.) আহ্‌মদীয়ুল মশরব নবী, হজরত আকদাছও আহ্‌মদীয়ুল মশরব অলী ছিলেন। যাহা নবীয়ে ছলাছা নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

২) তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক বোনের জন্ম হয়।

৩) তাঁহার ভাষা স্থানীয় ভাষা ছিল।

৪) তাঁহার যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়।

৫) তিনি মানবজাতিকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহ্‌পাকের সুষ্ঠু সরল সহজ তরীকত ও রূহানীয়তের দিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

৬) জগদ্বাসী হজরত আকদাছের আহ্বানে ব্যাপক ও সন্তোষজনক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সাড়া দিতে সক্ষম হয় নাই।

৭) তাঁহার পর জগদ্বাসী ব্যাপকভাবে ধর্ম ও বিবেক রহিত হইয়া প্রাণী জগতের অনুরূপ জীবন যাপন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেনা। বরং, ধর্ম বিবর্জিত জীবনধারা, নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতেছে; যাহা ন্যায়নীতি, সাম্য ও দয়া বহির্ভূত।

৮) চট্টগ্রামকে চীন প্রান্ত বলা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে হজরত ইবনে আরবীর (র.) যুগে এই অঞ্চল চীনা বংশধরদের শাসনাধীন ছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জন্মভূমির পরিচয়ে পাওয়া যাইবে।

৯) হজরত আকদাছ বিভিন্ন ধর্মের নৈতিক ধর্মে বা নৈতিকতায় যে, কোন পার্থক্য নাই তাহা সম্যক অবগত ছিলেন বিধায় কোন ধর্মের আচার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক সকল সম্প্রদায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁহার গুণমুগ্ধ এবং শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থক ছিলেন। (জীবনী ও কেরামত দ্রষ্টব্য) ইহা তাঁহার মোজাদ্দেদিয়ত বা ধর্মক্ষেত্রে নূতনত্ব দান বুঝায়।

"মতালেবে রশীদী কেতাবের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "ফরদুল আফরাদ" ব্যক্তিই বেলায়তে মোহাম্মদীর সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। নিজ শ্রেণীর মধ্যে তিনি হাতের মধ্যাঙ্গুলি স্বরূপ, উচ্চ বিকশিত ছিলেন।

এই সমস্ত কারণে তাঁহাকে চারি প্রকারে খাতেমে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী বলা যায়।

১) খাতেমুল অলী খাতেমুন্নবীর পবিত্র ধর্মের অনুগত বিধায়, তিনি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই যাহা রাসুলুল্লা'র অনুরূপ।

২) হজরত শীচ (আ.) এর "নজরে ফিকরী" বা জ্ঞান জ্যোতির ধারক বাহক হিসাবেও তিনি খাতেম। হজরত শীচ (আ.) এর জন্ম যেমন এক অসাধারণ জন্ম, তাঁহার নীতির ধারক বাহক, বেলায়তে মোত্‌লাকাও এক নব-যুগের সূচনা করে। ধর্মে নৈতিকতা পতনের যুগ যাহা ১১৪৩ হিজরী হজরত আবদুল গণী নাবলুছি (র.) এর ওফাতের পরে ১২৪৪ হিজরী সালে হজরত অলীকুল শিরোমণি ছুফী সম্রাট গাউছুল আজম জনাব শাহ্‌ ছুফী মওলানা ছৈয়দ আহ্‌মদ উল্লাহ্‌ (ক.) এর আবির্ভাব যুগে নৈতিক ধর্মের পূনর্জীবন সম্ভব হইয়াছে; ছল-চাতুরি, কৃত্রিমতা বিদূরণে তাঁহার বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়তের প্রভাবে সহজতম পন্থায়।

৩) সকল ধর্মের সূক্ষ্মত্ব ও স্থুলত্বের সমাবেশকারী এবং সমসাময়িক সকলের নিকট সম্মানিত ও প্রশংসিত হিসাবে বেলায়তে মোহাম্মদীর সম্পূর্ণ অধিকারীই "ফরদুল আফরাদ"।

৪) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্ম বা কর্ম পন্থার বেষ্টনকারী হিসাবে তিনি বেলায়তে মোহিত, বা বেলায়তে মোত্‌লাকার মালিক; যাহাকে 'নিছ্‌বতাইনে আ'দমী' বলে।

"অতএব তাঁহার পবিত্র অস্তিত্বে বা অজুদে পাকে উক্ত শ্রেষ্ঠতম ফজিলতে রব্বানী বা বেলায়ত, সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ায় উহা অন্যত্র পুনঃ বিকশিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ইহার এস্তেহকাকে অজুদী বা বিকাশ যোগ্যতা এইখানে প্রস্ফুটিত ও পরিসমাপ্ত। সুতরাং, তিনিই খাতেম বা বেলায়তে মোকাইয়াদার পরিণতিকারী এবং বেলায়তে মোত্‌লাকার অধিকারী যুগ প্রবর্তক অলিউল্লাহ। তিনি বিশ্ব ধর্মসাম্যের বিপ্লবাত্মক কর্মপন্থা "সপ্ত পদ্ধতির" দাবীদার বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্বের "আখের" শেষ গাউছুল আজম।"

কাল ও ইতিহাসের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ এসব উদ্ধৃতি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মুজাদ্দেদিয়াত সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন এই আলোকিত একবিংশ শতকে সবার জন্য সহজ করে দিয়েছে।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) পৃথিবীর চলমান ইতিহাসের এমন এক ধাপের মানব, যখন গোটা পৃথিবী ও মানবজাতি নবীজী (দ.) যুগ ও সৎ খেলাফতের সুবেহ সাদেক পরবর্তী রাজতান্ত্রিক, যাজকতান্ত্রিক পীড়ন–উৎপাতে জর্জরিত পৃথিবী নতুন করে আল-কোরআন ও মদীনা সনদের আলোকে রবুবিয়াত বা পালনবাদী সমতাবাদ-বহুত্ববাদী সমাজ পুনর্গঠনের পথে বিজ্ঞান ও প্রগতিবাদী দর্শনের যানে আরোহন করে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আল-কোরআন আধুনিক পরিভাষায় গণতন্ত্রবাদী-পালনবাদী পার্থিব সমাজ বিনির্মাণের দৃষ্টান্তসমৃদ্ধ পরামর্শে ভরপুর। আল-কোরআনের সূচনাতেই অর্থাৎ দ্বিতীয় সূরার দ্বিতীয় আয়াতেই (২:২) যেমন আধুনিক চেতনা ও চিন্তাধারার ফসল 'নিজস্ব নির্বাচনের স্বাধীনতার (freedom of choice) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[৫] তেমনি একই সূরার ২৯-৩৮-এর আয়াতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আধুনিক পরিভাষায় স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রূপরেখা বিধৃত। এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত ঘটনাবলীতে নিজেদের মত প্রকাশের অভীপ্সাকে অবাধ করা হয়েছে। এমন কি একাধিক সংবেদনশীল বিষয়েও। পরামর্শমূলক গরিষ্ঠ, ঐকমত্যের ভিত্তিতে উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টান্ত সূরা নমল (২৭:২২–৪৪) সহ বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এমনকি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অমান্যকারী অভিশপ্ত ইবলিসকেও পৃথিবীতে শর্ত সাপেক্ষে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে (সূরা হিজর ১৫: ২৬–৪২)! অবশ্য একই সাথে মানুষকে প্রদত্ত পার্থিব ক্ষমতা (সূরা জাসিয়া. ৪৫:১৩), সীমাবদ্ধতা (সূরা-বাক্বারা ২:২৫৫), অদূরদর্শী অহমিকা (সূরা, আলাক ৯৬: ৬–৭), স্বীয় কর্মপন্থা এবং মন্দ-ভালো নির্ণয় ও গ্রহণে মানুষের পছন্দের স্বাধীনতা (সূরা ৯০:১০, ৯১: ১–৯, ৯২:১২; এবং ৪: ১২৩–১২৪; ৬: ১২; ১৩:২৭, ১৬: ১০৪–১০৫, ২৮:৫৬; ৪২:৩০ প্রভৃতি) মঞ্জুর করা হয়েছে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আল-কোরআন ও নবীজীর এই বিশাল ব্যবহারিক জীবনের প্রেক্ষাপটে সমকালে ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বদেশবাসীসহ বিশ্ববাসীকে জীবনে ও সংগ্রামে নিজেকে উপযুক্ত ও মজবুত রাখার মানসে উপযোগী অনুশীলন, আচরণবিধি, সমাজে সবার সাথে শোভনীয় সম্পর্ক বিধির রূপরেখা দিয়ে গেছেন, যা অছিয়ে গাউসুল আযম রচিত 'বেলায়তে মোত্‌লাকা'র অষ্টম পরিচ্ছেদে 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি' উপ শিরোনামে অতি সহজভাষায় পেশ করা হয়েছে। এর পূর্ণ বিবরণ এবং হযরত সাহেব কেবলার সমকালীন আধুনিক মানুষের

বাঞ্ছনীয় প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সমৃদ্ধ জীবনাচারের বিবরণ অত্র গ্রন্থের চতুর্থ ভাগে শাশ্বত শিক্ষা শিরোনামে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সাহেব কেবলার আবির্ভাব ঊনবিংশ শতকে। তিনি পারিবারিক-রাজতান্ত্রিক জমানাপরবর্তী বহু উত্থান-পতন-বিবর্তন বিক্ষুব্ধ আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, বহুত্ববাদী মানবতাবাদ, নিষ্কলুষ অসাম্প্রদায়িকতাবাদী চেতনা, পার্থিব সমাজ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সাপেক্ষে পবিত্র সহাবস্থান, কৃষি-শিল্প-সৃজনশীল সুস্থ সাংস্কৃতিক তথা বিবিধ প্রকার পারিবারিক-সামাজিক কর্ম ও অনুষ্ঠানের নমুনা রেখে গেছেন। এই আলোকে তিনি সমকালে প্রগতিশীল বিবর্তনের নকীবের মর্যাদাসম্পন্ন এবং একই সাথে এর ফলিত রূপদানকারী।

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীকে (১০৭৭–১১৬৫ খ্রি.) মদীনা সনদের শিক্ষা পরিপন্থী অন্ধ রাজতান্ত্রিক দৈত্যের মোকাবেলা করতে হয়। আল্লাহ্‌র শোকর এই যে, তাঁর পূর্ব ও পরে বহু পবিত্র মহান মাশায়েখ সামন্ততান্ত্রিক-রাজতন্ত্রের চরম নিগ্রহের শিকার হলেও তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রচণ্ড গতিময় কর্মধারায় বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দূরে থাক, বরং নানান বরণ স্বৈরতন্ত্র নিজেদের দৈহিক ও পার্থিব নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়।

মুজাদ্দেদিয়াত আল-কোরআনের শিক্ষা নিদর্শনের যুগোপযোগী এ্যাপ্রোচও বটে। মহান মদীনা সনদের বহুত্ববাদী, অসাম্প্রদায়িক, সেকুলার[৬], আর্থ-সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য বিরোধী সমতাবাদী চেতনার পাশাপাশি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার পোষকতা তাঁর মুজাদ্দেদী ভূমিকার দর্শনীয় বৈশিষ্ট্য। মুজাদ্দেদিয়াত নবী-রাসুল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে ও কালে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দেবত্বের স্তরে উত্তোলন তথা incarnation চিন্তা ও প্রথার অবসান ঘটিয়ে তদস্থলে পবিত্র মানবিক উৎকর্ষতার অবকাশ সৃষ্টি করে মানুষকে মহত্তর মর্যাদায় আসীন করে। হযরত গাউসুল আযমের মুজাদ্দেদিয়াত অতীত থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত মানব সমাজের সকল ভালো ও কল্যাণকে পরিবেষ্টন করে আছে।

নোটঃ

১. আল-কোরআনের সূরা রাদ-এর ৭নং আয়াতে (১৩:৭) ব্যবহৃত 'কওম' শব্দটা আমাদের বাংলা ভাষায় সহস্রাধিক বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং অন্য অনেক শব্দের মতো এ ভাষার নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডারের সদস্য হয়ে আছে। তাই আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে 'কওম' শব্দটাই হুবহু ব্যবহার করা হলো। এ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দরূপে আল্লামা আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী, বিখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ ও আল-কোরআনের অন্যতম সর্বস্বীকৃত ইংরেজি অনুবাদক এ. জে. আরবেরী, নয়া দিল্লীর ড. শেহনায শায়খ ও কাওসর ক্ষত্রী 'every people', মুহম্মদ মার্মাডিউক পিকথল every Folk, শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (র.) ক···ত তফসীর কানযুল ইমান ও খায়রুল ইরফান, মুফ্তি মুহম্মদ শফি কৃত তফসীর মারেফুল কোরআন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বঙ্গানুবাদে "সম্প্রদায়" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ তাঁর বাংলা তরজমায় 'জাতি' শব্দ এবং মুমতাজুল মুহদ্দেসীন মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান 'কওম' শব্দই ব্যবহার করেছেন। শায়খুল হাদিস মওলানা হোসেন আহমদ মদনীর মতে, 'কওম' শব্দ 'জাতি' বুঝাতে এবং 'মিল্লাত' শব্দটা অভিন্ন আইন ও ধর্মে বিশ্বাসী বুঝাতে প্রয়োগ করা হয়। সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, অঞ্চল ভিত্তিক জনবসতি, ভাষা ভিত্তিক জনগোষ্ঠী প্রভৃতি বিভিন্ন, নির্দিষ্ট, সীমিত কিম্বা ব্যাপক অর্থে 'কওম' শব্দটার ব্যবহার ইতিহাসে দৃষ্ট হয় বিধায় প্রতিশব্দগত বিভিন্নতার আবর্তে ঘুরপাক না খেয়ে এ গ্রন্থে বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত ও অন্তর্ভুক্ত 'কওম' শব্দটাই ব্যবহৃত হল, যা বাংলাভাষীদের সহজে বোধগম্য।

২. এই পবিত্র আয়াতে হা'দ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, 'রাসুল' কিম্বা 'নবী' শব্দ নয়। হা'দ শব্দের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে 'পথ প্রদর্শক' ও guide শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. 'জীবনী ও কেরামত' ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৫ইং, পৃ. ৬৮৩-৬৯৪।

৫. হযরত আদমকে (আ.) পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে প্রেরণপূর্ব খোদায়ী পার্লামেন্টে অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান/ইবলিস নিজের জন্যও শর্তসাপেক্ষ সীমিত পার্থিব কর্ম-পছন্দের এখতেয়ার হাসিল করে নেয় 'রাব্বুল আলামিন, রহমানুর রহিম'-এর কাছ থেকে। এসব বিবরণ আল-কোরআনের ২ : ৩০-৩৯, ১৬৮-১৬৯, ২০৮, ২৬৮; ৩ : ১৫৫, ১৭৫, ৪ : ৩৮,৭৬,৮৩, ১১৭-১২১, ৫ : ৮৯-৯১, ৬ : ৪৩, ৬৮, ৭১, ১১২-১১৩, ১২১, ১৪২, ৭ : ১১-২৭, ৩০, ১৩৫, ২০২০২, ৮ : ১১, ৪৮, ১৪ : ২২, ১৫ : ১৬-১৮, ১৬ : ৬৩, ৯৮-১০০; ১৭ : ৫৩, ৬১-৬৫, ১৮ : ৫০-৫১, ১৯ : ৪৪-৪৬, ৬৬-৬৮, ৮৩-৮৬, ২০ : ১১৫-১২৭; ২২ : ৩-৪, ৫২-৫৩; ২৩ : ৯৭-৯৮, ২৪ : ২১, ২৫ : ২৭-২৯, ২৬ : ৯৪-৯৫, ২১০-২১২, ২২১-২২৩, ২৯ : ৩৮, ৩১ : ২১, ৩৪ : ২০-২১; ৩৫ : ৫-৬; ৪১ : ৩৬, ৪৩ : ৩৬-৩৯, ৬২; ৪৭ : ২৫-২৮; ৫৮ : ১০, ১৯; ৫৯ : ১৬; ৮১ : ২৫-২৮। তবে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, শয়তান নিজেই স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করে অকপটে বলেছে যে, "আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করবো। তবে তাদের মধ্যে আপনার খালেস বান্দাগণ থাকবে না (৩৮ : ৮২-৮৩, ১৫ : ৪২)। আল-কোরআনের বয়ানের অনুসরণে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নিরবচ্ছিন্ন তাগিদঃ মানুষ যেন আল্লাহ্‌র খালেস বান্দা হতে পারার সফল সহজ সাধনায় অবতীর্ণ হয়। শয়তানের পাট্টিবাজি ও পাল্টিবাজির খবর

আল-কোরআনের সূরা ইব্রাহিমের ২২নং আয়াতে অত্যন্ত সরলভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে; “যখন সব কিছুর বিচার হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছেন, আর আমিও তোমাদেরকে কিছু ওয়াদা দিয়েছি, অতঃপর তা খেলাপ করেছি; তোমাদেরকে আহ্বান করা ছাড়া তোমাদের উপর আমার আর কোন আধিপত্য ছিল না, আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করোনা, নিজেদের প্রতিই দোষারোপ করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে পারবো না, তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে পারবে না। ইতোপূর্বে তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরিক করেছো, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি নিঃসন্দেহে জালেমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে (১৪:২২)। এ ধরনের খাসিয়াতের লোকের সাক্ষাৎ সেই আদিকাল থেকে এই একবিংশ শতকেও এন্তার পাওয়া যায়।

৬. ইংরেজি secular শব্দের বাংলা অর্থ কোন মানদণ্ডেই ‘ধর্ম-নিরপেক্ষতা’ নয়। এর অর্থ ইহ জাগতিকা বা mundane affairs. প্রফেসর রমেন্দ্র নাথ ঘোষ ‘রাসেলের নৈতিক দর্শনের ভিত্তি’ শীর্ষক নিবন্ধে secular-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন ‘মানবতন্ত্র’। [“বার্ট্র্যান্ড রাসেল”, মফিজ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, মনন সমিতি, রাজশাহী, প্রযত্নে/দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৭৩ইং।]

৪র্থ অধ্যায়

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্যান্সার প্রবৃত্তি পূজার বিলোপন কর্মসূচি

"ভোগ–প্রবৃত্তি-পূজার কুৎসিত তাণ্ডব উল্লাস,
সতত ঘটায় লঘুচিত্ত মানুষের সর্বনাশ;
মানবতা, সততা, স্নিগ্ধ-সুন্দর সব ক্ষয়ে যায়,
কলঙ্ক-লাঞ্ছিত হয় পবিত্র পৃথিবীর ইতিহাস।
নবী-রাসুল-দার্শনিক-বিজ্ঞানী-জ্ঞানী-ওলীজনা
এ পতন ঠেকাতে করে যান অবিরাম সাধনা।"

১. ভোগ প্রবৃত্তি এবং তা দমনের জরুরি আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে আল-কোরআনঃ

"আপনি সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত তাদের নিকট পাঠ করুন, যাকে আমরা আয়াতসমূহ দিয়েছি, অথচ সে তা বর্জন করে, আর শয়তান তার পিছনে লাগলো, আর সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়; আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাকে তা দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম; কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির তাবেদারি করে, তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তার উপর বোঝা চাপালেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপায়। এটা হচ্ছে আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী কওমের দৃষ্টান্ত। অতএব, আপনি ঘটনাগুলো বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা করে (সূরা আরাফ ৭ : ১৭৫–১৭৬)।"

২. সুপ্রবৃত্তি-কুপ্রবৃত্তির ভেদঃ

জৈবিক প্রবৃত্তি বা খাহেশ পূরণের মাত্রাবোধ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাস্তব সক্ষমতা মানুষ ও পশু-প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যের প্রধান ভেদরেখা। প্রাণী বা নফ্স মাত্রই জৈবিক তাড়নাসম্পন্ন। এই জৈবিক তাড়না সমকালের প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে সঞ্চারমান রাখা গেলে ইপ্সিত তথা আল্লাহ্‌র প্রত্যাশিত আচরণবিধি রক্ষিত হয়, যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয় সুশোভন পবিত্র মানব-সংস্কৃতি। এই সুশোভন পবিত্র সমাজ সংস্কৃতির নির্মাণের কথাই বলে এসেছেন মহান নবী, ওলী, দার্শনিক, সিদ্ধ পুরুষ, জ্ঞানীরা। আল-কোরআনের শিক্ষার অন্যতম তাগিদ পৃথিবীতে মানবিক-সামাজিক সুসংস্কৃতি নির্মাণ এবং সে জন্য অনুসরণীয় পথ নির্দেশনামালা। এর অন্যতম প্রধান বিষয় হলো ভোগ প্রবৃত্তি দমন করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা তথা প্রবৃত্তিপূজা থেকে বিরত থাকা।

মানবজাতির ইতিহাসের বিবর্তনমূলক বহু পর্যায় ও স্তর অতিক্রান্ত হবার পর সপ্তম ঈসায়ী অব্দে নবীজী হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে জাগতিক কল্যাণমূলক জীবন ও সংস্কৃতি ধারার সূচনা হয়, তা কখনো মরুপথে হারানো নদীর মতো শুকিয়ে যায়নি, বরং প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জনপদে নবীর জ্ঞানের ওয়ারেসদের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র সামাজিক-অর্থনীতিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে মূলনীতির আলোকে পরিমার্জিত হয়েছে মহান ওলী আল্লাহ্, দার্শনিক, জ্ঞানীজনদের মাধ্যমে এবং নতুন নতুন ফুলে-ফসলে কল্যাণময়তায় ভরে উঠেছে মানব সমাজরূপ বাগানগুলো। মহান মুজাদ্দেদবৃন্দ এই ক্ষেত্রের নিরলস সৃজনশীল বাগবান।

হাজার হাজার বছরের এই নবসৃজনময় বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে, মানব সমাজ সংসার ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত ভোগপ্রবৃত্তি সতত নিরুৎসাহিত ও নিন্দিত হয়েছে। মানবসমাজ ও সভ্যতার কল্যাণময় প্রগতিশীল বিবর্তনের গুণগত পরিণাম ও পরিণতির উপর আল-কোরআন নিজস্ব অনবদ্য উপস্থাপন ও সহজবোধ্য বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে আলোকপাত করেছেন, এতে আরোপ করেছেন গুরুত্ব। যথাযথ প্রেক্ষাপটে। নবী-রাসুলদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজকল্যাণমুখী সর্বশ্রেণির দার্শনিকগণও এতে গুরুত্বআরোপ করেন। ভোগ প্রবৃত্তি সম্পর্কে আল-কোরআনের কতিপয় সতর্কবাণী:

মানুষের পার্থিব উৎকর্ষের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্র দুটো : (ক) চারিত্রিক পবিত্রতা, কল্যাণময়তা অর্থাৎ সৎস্বভাবের অধিকারী হয়ে সৎ সুন্দর, সম্প্রীতি ও সুবিচারসম্মত জীবন যাপন এবং অন্যদেরকেও সে-পথে আকর্ষণ করা। উল্লেখ্য, মন্দ ও ভালোর চেতনা বা জ্ঞান মানব ক্বলবে সন্নিহিত (সূরা শামস : ৮)। দর্শন জগতের বিশ্ব শ্রদ্ধেয় পুরোধা সক্রেটিসও বলেছিলেন, মানুষ ভালো ও মন্দ উভয়বোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেজন ভালো জানবে, সে ভালোটাই করবে। (খ) অপর ক্ষেত্রটা হলো বস্তুগত উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি। প্রকৃতিতে বিরাজমান বিভিন্ন পদার্থ বা বস্তুর, কুশলী ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন যাপনোকরণ তৈরি ও সেগুলো ভোগ। আল্লাহ্ প্রকৃতির বস্তুনিচয়কে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল কওমের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে (সূরা জাসিয়া : ১৩)। প্রকৃতিতে বিদ্যমান বস্তুলোকে, মানুষের বশীভূত করে দেওয়া হয়েছে (সূরা ইয়াসিন : ৭২)। মোদ্দা কথায়, প্রকৃতি তথা বস্তুজাতকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন, রূপায়ন, ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার জাগতিক জীবন, ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার জাগতিক জীবন, ভোগ, আয়েশ প্রভৃতির সংস্থান করে। এই ক্ষেত্র বা স্তরে এসে পঞ্চভূতে তৈরি মানুষের কোন কোন অংশ প্রবৃত্তির সেবাদাস তথা পূজারী হয়ে পড়ে। সব বৈভব, সুখ, আয়েশ নিজে বা একান্তগত করতে চায়। এতেই বাধে গোল। পার্থিব উৎকর্ষজাত উপকরণ যখন 'নিজের' নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে 'প্রবৃত্তি বা রিপুর' কব্জায় গিয়ে পড়ে, তখন তা মুখ্য হয়ে ওঠে এবং এক ধরনের (ভোগ) পূজার রূপ ধারণ করে, আর তা-ই হয়ে উঠে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য 'মোক্ষধাম'! এই প্রবণতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে নেমে আসে দুঃসহ কদর্যতা, অনাচার, বিপর্যয়, নৈতিক-মানবিক-বুদ্ধি-বিবেচনার সর্বনাশা অধঃপতন। অতীতের পাশাপাশি বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব–পশ্চিমের সকল সমাজ ও রাষ্ট্রে ভয়ংকর অবিচার-দুর্নীতি-মিথ্যাচারের ঢল দেখা যায় এবং তা প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ ও দেশসমূহের এক শ্রেণির মিডিয়া, প্রচার মাধ্যমে প্রচারিতও হয়।

৩. অশ্লীলতা : ভোগ-প্রবৃত্তি পূজার বীজতলা

ভোগ প্রবণতা তথা প্রবৃত্তিপূজার সাথে অশ্লীলতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষের দেহই অশ্লীলতার আগাছা জন্মানোর জমি। তাই শ্লীলতা ও শালীনতা অনুশীলন ও পালনের জন্য আল-কোরআন এবং হাদিসে বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে;

যেমনটা দিয়েছিলেন পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসুল পবিত্রাত্মা বিজ্ঞজনরা। প্রবৃত্তিপূজার অনুষঙ্গ এই অশ্লীলতার শাখা-প্রশাখা অনেক এবং তা প্রতিনিয়ত নতুন নতুনভাবে গজায়। সুদূর অতীতের সাথে পাল্লা দিয়ে তা যেন 'অমিতাচারী-দুষ্কৃতিকারীদের কাছে শোভনীয় হয়ে উঠে। আল-কোরআনে একাধিক প্রসঙ্গে তাদের এই বদ–খাসিয়ত, বদচিন্তার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে তা থেকে নিবৃত থাকার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইউরোপে 'যন্ত্রশিল্প বিপ্লবের পর জীবন যাপন পদ্ধতিতে সহজলভ্যতা এসে যাওয়ার উপজাত হিসেবে ভোগ প্রবণতা বাধাহীন হয়ে উঠে। নেমে আসে অনাচার, বিপর্যয় ও নৈতিক ক্ষেত্রসহ সর্বক্ষেত্রে অধঃপতন। তাই শিল্প বিপ্লবোত্তর কালেও এই মানবতা-বিরোধী ক্ষতিকর প্রবণতা রোধ করার বিষয়টা সামনে চলে আসে। বিবিধ অহমিকা ও মূর্খতাবশতঃ কেউ কেউ স্বীকার করতে না চাইলেও ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, বিশেষ করে ইসলামের মূলনীতির অনুসারী পবিত্রাত্মা ওলী-দরবেশ -দার্শনিক-বিজ্ঞানীরা এই বদ প্রবণতার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই পবিত্র ধারার মশাল বরদার মহান বাস্তববাদী ওলী-আল্লাহ্।

আল-কোরআন অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সরল ভাষায় মানবজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবৃত্তিপূজারূপী দুরারোগ্য ক্যান্সারের প্রকোপ এবং এর ভয়ঙ্কর পরিণতির চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরে সতর্ক হবার তাগিদ দিয়েছে। দুঃখজনক হতাশার বিষয় এই যে, এই জমানায় বর্তমান বিংশ/একবিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন দেশে একশ্রেণির মানসিকভাবে অসুস্থ লোককে হযরত লূত (আ.)-এর সময়কার নোংরা কুৎসিত দৈহিক ভোগবাদীদের মতোই উৎকট উল্লাসে মেতে উঠতে দেখা যায়। সন্দেহ নেই যে, মানবরূপী চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম এই জীবগুলো বর্তমান অতি উন্নত সভ্য বিশ্বের কোন কোন দেশে 'ব্যক্তির পছন্দ', 'ইচ্ছার তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকারের' লেবেল এঁটে এটাকে 'কুৎসিত ভোগ-ফ্যাশনে' পরিণত করে সৃষ্টির সেরা মানবজাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করে চলেছে।

হযরত নূহ্ (আ.), হযরত হুদের (আ.) সময়কার আদ জাতি, হযরত সালেহ (আ.) যুগের সামুদ জাতি, হযরত শোয়েব (আ.) জমানার মাদাইন অশ্লীলতাজনিত অপকর্মের শাস্তিস্বরূপ ধ্বংসপ্রাপ্তির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। আল-

কোরআনে বলা হয়েছে: “হে বনী আদম! আমি তোমাদের লজ্জা নিবারণ ও সৌন্দর্যের উপকরণ স্বরূপ লেবাস দিয়েছি, আর তাকওয়ার লেবাসই সর্বোত্তম’, তাদের স্মরণের জন্য তা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম (৭:২৬)। একই সূরায় আরো বলা হয়েছে: “যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে, তখন বলে; ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এটা করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন।’ বলুন, ‘আল্লাহ্‌ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো, যা তোমরা জানো না’ (৭:২৮)।” নির্লজ্জতা সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে: “বলুন, আমার রব অবশ্যই হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন নির্লজ্জতার কাজগুলো, পাপমূলক ও অন্যায়মূলক বিরোধিতা, কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরিক করা যা সম্পর্কে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই (৭:৩)।” একই সূরায় ‘স্বীয় প্রবৃত্তির তাবেদারীকে কুকুরের মতো’ কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (৭:১৭৬); তাদেরকে জ্ঞান পাপী এবং চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (৭:১৭৯)। অতএব, মনুষ্য পদবাচ্য কেউ প্রবৃত্তির তাবেদার হতে পারেনা। অন্যদিকে শালীনতা-শ্লীলতা মানবিকবোধ ও গুণাবলীতে উর্বরতার যোগান দেয়।

রিসালাত ও নবুয়ত ধারায় মানবজাতির জন্য সর্বশেষ সুসংবাদদাতা (বাশিরুন) ও সতর্ককারী (নাযেরুন) হযরত মুহাম্মদ (দ.) এবং তাঁর পয়গামের ওয়ারেসরূপী ওলী-আল্লাহ্‌রা আল-কোরআনে বর্ণিত এসব বার্তা ও সর্তকবাণী প্রয়োজন মতো যুগে যুগে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে পাঠ করে শোনানোর দায়িত্ব পালন করেন। প্রণিধানযোগ্য যে, আল-কোরআনের আয়াত অনাগত মানব সন্তানদের ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত এবং নিত্য বর্তমান; যেমন সূরা জুমআ-য় জানানো হয়েছে: “তিনিই উম্মি লোকদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, ইতোপূর্বে তো তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল এবং অন্যান্যদের জন্যও (তিনি প্রেরিত) যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি (কিন্তু তারা আসবে) এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান (৬২:২–৩)। এই সূত্রে আরো অনুধাবনযোগ্য সূরা আলে-ইমরান-এর এই তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত: “তোমরা কিভাবে কুফরী করবে,

যখন তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রাসুলবিদ্যমান। যে কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, সে অবশ্যই সরল পথপ্রাপ্ত (৩: ১০১)। এই মহান আয়াতের স্থিতি ও ব্যাপ্তি অচিন্ত্যনীয়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীও (ক.) তাঁর পূর্বসূরীদের মতো এই পয়গাম-বরদার।

পার্থিব ভোগ-প্রবৃত্তি উদরস্থ তথা দেহজতৃপ্তির খোরাক করতে গিয়ে এক শ্রেণির নড়বড়ে নৈতিকতার শিকার মানুষ কার্যতঃ নিজেই নফ্‌সানিয়তের ভোগ্যবস্তু তথা শিকারে পরিণত হয়। বাস্তব বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে; তাদের দূষণ সমাজে সংক্রমিত হয় এবং কলুষতার প্রকোপ ঘটায়। পৃথিবী ও মানব সমাজের ইতিহাসের এটাই দুর্ভাগ্য এবং জাগতিক-সামাজিক বিপর্যয়-বিশৃংখলার প্রধান কারণ। এ অবস্থা থেকে বিভিন্ন কওম তথা মানব-সমাজকে রক্ষার মিশন নিয়েই কালে নবী-ওলী-সালেহীনদের আবির্ভাব।

৪. আল-কোরআনে ভোগনীতিঃ

আল-কোরআনে মানুষের পার্থিব জীবনের উপযোগী অপরাপর নীতি-সূত্রের ন্যায় অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে ভোগনীতিসুত্র প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে: “হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় সুবেশ (পরিস্কার পরিচ্ছন্ন) গ্রহণ করো এবং আহার করো ও তিনি অপচয়কারীকে ভালোবাসেন না (৭:৩১)। সূরা বনী ইসরাইলে (১৭: ২৩–২৪ নং আয়াতে) তৌহিদে সুদৃঢ় থাকতে এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদানের পর ২৬-২৭নং আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশনা: “তোমরা নৈকট্যভাজনদেরকে আদায় করো তাদের হক, অভাবগ্রস্ত এবং মূসাফিরকেও এবং বিপথে অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান স্বীয় রব্-এর প্রতি অকৃতজ্ঞ (১৭: ২৬–২৭)।

উপরোক্ত নির্দেশনার সাথে পৃথিবী ও তাতে বসবাসকারীদের ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য সংযুক্ত। পৃথিবীতে সৃষ্ট সম্পদ সম্পর্কে আল-কোরআনে বলা হয়েছে: “অতঃপর তিনি জমিনে দৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, তার মধ্যে বরকত দিয়েছেন এবং সব সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকের (প্রয়োজন অনুযায়ী) পরিমাণ মতো খাদ্যসামগ্রী মওজুদ রেখেছেন (৪১:১০)। আরো বলা হয়েছে; “আমি প্রত্যেক বস্তুকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি (৫৪:৪৯ সূরা হা-মীম)। আস্-

সাজদাহ/ফুস্সিলাত-এর ৪১:১০ আয়াত এবং সূরা কামার ৫৪:৪৯নং আয়াতের জের হিসেবে এই পবিত্র হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম যে, "যদি কেউ অভুক্ত থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তার জীবিকার হিস্যা অন্য কেউ অসঙ্গতভাবে গ্রাস করেছে।" কারণ, আল্লাহ্ এই নিশ্চয়তা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি 'প্রত্যেকের পরিমাণ মতো খাদ্য সামগ্রী মওজুদ রেখেছেন।' অতএব, কোন প্রকার অপচয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ-বিলাস-আয়েশের অবকাশ পৃথিবীতে নেই। পবিত্র আল-কোরআন ও হাদিসের ভাষ্য মতে পৃথিবী আদম সন্তানের জন্য একাধারে জীবন-সংগ্রাম এবং পুণ্য-পবিত্রতা অর্জনের স্থল। পবিত্র হাদিস মতে; "ইহজীবন যেন কর্ষিত জমি মাত্র, পরজীবনে ফসল লাভের জন্য, এখানে সুকর্ম কারো, তবে সেখানে সুফল পাবে; জীবন-সংগ্রাম আল্লাহ্র প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ্ যা বিধান করেছেন, শুধু কঠোর চেষ্টার দ্বারাই তা লাভ করা যায় (রাসুলুল্লাহ্র বাণীঃ সিহাহ্ সিত্তা অনুযায়ী সঙ্কলক আল্লামা আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী)"। অতএব, পার্থিব জীবনে সংযম, কৃচ্ছ্রতা এবং ভোগ বিলাস পরিহারপূর্বক প্রবৃত্তি দমনই প্রধান জেহাদ বা জেহাদে আকবর রূপে অভিহিত। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই জেহাদে আকবরের প্রেরণা ও সহজপন্থার সন্ধান দিয়েছেন (এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের চতুর্থ ভাগঃ শাশ্বত শিক্ষা অধ্যায়ে উসুলে সাবআ বা সহজ জীবন যাপনের সপ্ত পদ্ধতি অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫. প্রবৃত্তি পূজাঃ ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের দৃষ্টিতে

"এক ধরনের লোক আছে, যারা বস্তুবাদকে নিজেদের চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষে একটা দার্শনিক যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে। নীতিভ্রষ্ট লোকেরা 'বস্তুবাদ' শব্দটা দ্বারা বুঝে উদর-সর্বস্বতা, মাতলামি, চোখের লিপ্সা, দৈহিক ভোগ-বিলাস, ঔদ্ধত্য, লোভ, মুনাফাখোরী ও শেয়ার বাজারের ধাপ্পাবাজি– সংক্ষেপে, তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল নোংরা অনাচারে নিজেকে নিমজ্জিত করে তার সব কিছুই" (ফ্রেডারিখ এঙ্গেল্স : এন্টি-ডুরিং = F. Engels : Anti Duhring ১৮৭৬ ইং)।

এর নির্গলিতার্থ এই যে, আজ ২০২৩ খ্রি.-এর প্রায় দেড়শো বছর পূর্বেই যন্ত্রশিল্প-বাণিজ্যে উন্নত ইউরোপে উপরোক্ত মানবতাবাদীরা আর্থিক ঠকবাজি প্রভৃতিকে স্থূল ভোগ-উপাচার তথা নগ্ন প্রবৃত্তিপূজা বলেই চিহ্নিত করেছিলেন। এখন তো বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বেই ঐ উৎকট প্রবৃত্তিপূরণের উন্মত্ত উল্লাস।

৬. উৎকট-অনিয়ন্ত্রিত নানা কিসিমের ভোগ-প্রবৃত্তিই মানব সমাজ তথা পৃথিবীর সর্বনাশ করবে

একথা সকল মহলেই স্বীকার্য যে, উৎকট ভোগ-প্রবৃত্তি, বিত্ত-অর্থের দম্ভ, অপ্রয়োজনীয় জৌলুষ মানব সমাজ-সংস্কৃতি-সুরুচি, নৈতিকতা, শান্তি, শোভনীয়তার পথে প্রধানতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করছে জ্ঞাত ইতিহাসের সূচনা থেকেই। আল-কোরআন মানবের উদ্ভব থেকে শুরু করে সমাজ-সংস্কৃতি, দ্বন্দ্ব-বিবর্তনের যে নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছে, তা অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, পূর্বেও অনেক মানবিক বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত ছিল। হযরত নূহ্ (আ.) এর সময় থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে এর ভয়াবহ রূপও দেখা যায়। একমাত্র নবী-রাসুলএবং সমকালীন হা'দ বা পথপ্রদর্শকরাই এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছেন এবং এর বিনিময়ে জুলুম-অনাচারের শিকার হয়েছেন ভোগী-বিত্তশীল শ্রেণির হাতে। আল-কোরআনকে ফিত্‌রাত বা প্রকৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ হিসেবে অভিহিত করেছেন বিশ্বময় বিজ্ঞজনরা। ভোগ-বিলাস ও আত্মধ্বংসের বেদনাদায়ক প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করেছেন অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তৎরচিত 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থে ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদে। "একত্বপথের সহায়ক নির্বিলাস সভ্যতা-শিক্ষা" শীর্ষক এই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

একত্ব পথের সহায়ক নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা

"অতিবিলাস মুক্ত নির্বিলাস সভ্যতা হজরতের অদ্বিতীয় দান। হজরত আচারে ব্যবহারে, আহারে-বিহারে এমন কি প্রত্যেক কাজের ভিতর দিয়া নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা দিতেন। বিলাস মানুষের মধ্যে অনর্থকতা, অপচয় অতিব্যয় আনিয়া দেয়। বিলাসবহুল সভ্যতায় জীবিকা অর্জনে মানুষ অতিচিন্তায় অত্যধিক শ্রমে আত্ম বিভোরতায় নিমগ্ন হইয়া অবিচার, জুলুম প্রতিযোগীতা প্রতিদ্বন্দ্বীতা দলাদলী ইত্যাদিতে লিপ্ত হইয়া নিজকে ধ্বংসের কবলে ফেলিতে বাধ্য হয়। ফলে মানুষ পরিনাম, পরিণতি ও খোদাপ্রেম প্রেরণা এবং বিচারবুদ্ধি ভুলিয়া বিপথ অনুগামী ও দুঃখে পতিত হয়। ইহার ফলে মানুষ নিজ 'খোদাদাদ স্বাধীনতা হারাইয়া' অনেক সময়ে অভিশপ্ত ও অধঃপতিত হইয়া পড়ে। তাই হজরত মানব জাতিকে অতি বিলাসের স্বভাবমুক্ত করিয়া সর্ব্বছুফী-সম্মত

নির্বিলাস সভ্যতা শিক্ষা দিতেন; যাহা সনাতন ইছলামী সভ্যতা। ইহা মানবকে নিষ্প্রয়োজনীয় অতিব্যয় ও অপচয় হইতে রক্ষা করে। যাহার ফলে মানুষ অতি চিন্তা, অতি শ্রমজনিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতে রক্ষা পায়। আত্ম-চিন্তায় মত্ত হইয়া লোভজনিত অবিচার অত্যাচাররূপী কাল-ভুজঙ্গতুল্য স্বভাবের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজ জীবনকে সুকাজে সার্থক ও সফলকাম করিয়া তুলিতে পারে। নিজ মুক্তিচিন্তায় রত হইয়া খোদার প্রেম প্রেরণা ও সৎজ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। যাহার প্রতিফলস্বরূপ ছবর-ধৈর্য্য অল্পে তুষ্টি, জাহুদ তাকোয়া–সুবিচারে অন্যায় বর্জন, খোদার ভয় ভীতি ও খোদার উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি গুণ মানুষের নিকট অর্জিত হয়। ইহাতে মানব নির্বিবাদ, নিভৃত স্বর্গতুল্য শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া উভয় জাহানের সঞ্চয় বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। তাই হজরত ছাহেব কেবলাকে দেখা যাইত, তিনি হাওয়ায়ী অর্থাৎ অনর্থক কাজ-কর্মে অযথা সময় নষ্ট, মন ও প্রবৃত্তির বশবর্তী আচরণকে কোন কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। তিনি অপচয় বিরোধী ছিলেন। তাই রেশমী কাপড় ব্যবহার, মেয়ে লোকদের অলঙ্কার ব্যবহার ও নাক-কান ছেদন মোটেই পছন্দ করিতেন না। যাহা ব্যবহার ও ভোগ না করিলে চলে, এমন কোন সামগ্রী ব্যবহারে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইতেন। অনেক সময় তিনি মেয়েদের অলঙ্কার খোলাইয়া ফেলিতেন। অলঙ্কার ব্যবহার ও নাক-কান ছেদনকে তিনি জওহর ও মনহুছী বলিয়া অভিহিত করিতেন। বর্তমান প্রচলিত বিবাহ-সাদীতে অতি উৎসব ও আমোদের বশবর্তী মানবের অতিব্যয় তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই হজরতের খেদমতে কেহ সাদী শব্দে বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন। বরং তাঁহার নিকট "ইজাব কবুল" বিবাহ বন্ধনে ছুন্নতি উপায়ে বিবাহ কার্য নির্বাহের অনুমতি পাইতেন। সাধারণ ভাবে সংসার যাপনে খাদেমা ও সেবিকা নিযুক্ত করিতে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে আদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "অনাবশ্যক কার্য্যে লিপ্ত সংসার নির্বাহ নিশ্চয় নবীবর্ণিত" দারুল হোজন অর্থাৎ চিন্তাগার ও দুঃখখনি এবং **দুনিয়াদারী**। আবশ্যকীয় সম্ভব স্বল্পব্যয়ে জীবিকা নির্বাহ নিশ্চয় **দীনদারী**। শান্তিময় জীবন যাপন ও নির্বিলাস সভ্যতা খোদা পন্থের সহায়ক।

এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনের শিক্ষার যথাযথ অনুশীলন এ যাবৎ মুসলিম জাহানসহ বিশ্বের কোথাও হয়েছে বলে দাবি করা যায় না। শিল্প-যন্ত্রবিজ্ঞানে

উন্নত পশ্চিমা বিশ্ব আল-কোরআনের নীতি-বিধানকে বেপরোয়া শোষণ ও প্রতারণার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবেই গ্রহণ করেছে। তাই এসব নিয়ে সত্য সুন্দর-সাম্যের পথে দিক নির্দেশনা প্রদানকারী এসব শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে বিবিধ প্রকার কুহেলিকা, বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে ব্যস্ত থেকে শান্তি ও সমতাবাদী মানুষদের বিভ্রান্ত করেছে। মানব সমাজ ও সভ্যতাকে সৃজনশীল শান্তিপূর্ণরূপে টিকে থাকতে হলে আল-কোরআন এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিক্ষার তুলনামূলক ও সমীক্ষণবাদী পর্যালোচনাপূর্বক অধিকতর কল্যাণকর পথই অবলম্বন করা একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে জরুরি হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে খেয়াল-খুশি (খাহেশাত), ভোগ-বিলাস তথা প্রবৃত্তি-পূজার খারাপ দিকগুলো নির্দেশনা করে আল-কোরআনের কতিপয় আয়াতের রেফারেন্স বিজ্ঞ পাঠক সমীপে পেশ করা হলো, যাতে তারা সঠিক পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হন :-

খেয়াল খুশি: ২;২২০, ১৪৫; ৪: ১২৩; ৫: ৪৮-৪৯, ৭৭; ৬: ৫৬, ১১৯, ১৫০; ১৩: ৩৭; ১৮: ২৮; ২৫:৪৩; ২৮:৫০; ৩০: ২৯; ৪৫: ১৮, ২৩; ৪৭: ১৪; ৫৪:৩।

ভোগ বিলাস: ৩: ১৪; ১৫: ৮৮; ১৭: ১৮; ২৬: ২০৫-২০৭; ২৮: ৬০-৬১, ৭৭; ৪৩:২৯।

সূরা জুখরুফে বর্ণিত হয়েছে: “আসলে আমি তো ওদেরকে ও ওদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ভোগের সুযোগ দিয়েছিলাম, যতক্ষণ না ওদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট প্রচারের জন্য রাসুল আসেন। যখন ওদের কাছে সত্য এল, ওরা বলল, ‘এতো জাদু, আর আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। আর এরা বলে, কোরআন কেন অবতীর্ণ হলো না দুই জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো বড় লোকের উপর। তারা কি আপনার রব্-এর রহমতকে (ইচ্ছানুযায়ী) বণ্টন করতে চায়? আমিই তাদের দুনিয়ার হায়াতে জীবিকা বণ্টন করি এবং আমি একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে তারা একে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর তারা যা জমা করে, তার চেয়ে আপনার রব্-এর রহমত অনেক উত্তম (৪৩: ২৯–৩২)”।

হযরত আলীর (ক.) ভাষায় জিহাদে আকবর-এর সংজ্ঞাঃ

- যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করাটাকে মূল উদ্দেশ্যে মনে করো না, আত্মরক্ষার জন্যে হত্যা।
- মুসলমানদের জীবনই একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধক্ষেত্রে দুটো জিনিষের জন্যে যুদ্ধ করতে হয়ঃ ১. দেশ রক্ষার জন্য, ২. আপন আদর্শ রক্ষার জন্যে।
- দেশ রক্ষার যুদ্ধ যতই বড় হোক, আদর্শ রক্ষার যুদ্ধ তা অপেক্ষা অনেক বড়। এই জন্যই দেশ রক্ষার যুদ্ধকে জিহাদে আসগর বা ছোট যুদ্ধ এবং আপন রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জিহাদে আকবর বলা হয়। এ যুদ্ধে কখনো পরাজয় স্বীকার করো না। এ যুদ্ধে প্রতিটি বিজয়ী সেনা 'শহীদ'। যদিও তার মৃত্যু ঘটে আত্মীয় স্বজনের মাঝে আপন বিছানায় তাঁর শয্যাই হবে সমর এবং সে হবে শহীদ। শহীদের জন্য দোজখের আগুন হারাম বা অবৈধ।

পঞ্চম অধ্যায়

বহুত্ববাদী সমাজের অনুশীলন ক্ষেত্র

বিগত বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পশ্চিমে ধনতন্ত্রের বিকাশ যুগে উদ্ভূত জাতি-রাষ্ট্র-সমাজ প্রভৃতি অব্যাহতভাবে সৃজিত-বিকশিত ও বিলোপিত হয়েছে। লিখিত ইতিহাসে ভারতবর্ষ, পারস্য, রোমক, মিসর তথা পৃথিবীর সকল অঞ্চলে 'জাতি-রাষ্ট্র'; এবং তার প্রতিপত্তি শাসকের পরিচয়-সীমানা বার বার জেগেছে, আবার বিলুপ্ত হয়েছে। আল-কোরআনে ইতিহাস ও ভূগোল থেকে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এ সম্পর্কে মানবজাতিকে জ্ঞাত করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের বিত্তবান ও ক্ষমতাসীন অংশ বার বার অজ্ঞতাজনিত গোঁয়ার্তুমির বাতাসী চূড়ায় আরোহন করে সবংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত টিকে থেকেছে একটিই মাত্র জাতি। যার নাম 'মানুষ জাতি'। পূর্ব-এশিয়ার মঙ্গোলীয় শাখা, পশ্চিম এশিয়ার ককেশীয় শাখা, আফ্রিকার নিগ্রো শাখা, পশ্চিম এশিয়া-আফ্রিকা ও ইউরোপের সেম বা সেমাইট শাখা, ওশেয়ানিয়া অঞ্চলের 'মালয়ী শাখা' আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান শাখারূপে শারীরিক লক্ষণের ভিত্তিতে সমগ্র মানব পরিবারকে উপরোক্ত ভাগে ভাগ করা হলেও আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই একমত যে, জধপব শব্দের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। সমগ্র পৃথিবীতে জধপব একটাই। আর তা হলো ঐঁসধহ জধপব. বিশ্বজোড়া এক মানব পরিবার[১]। আল-কোরআনে আছে : 'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র, জ্ঞানীদের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে (৩০ : ২২)। এ প্রসঙ্গে মানব জাতির অভিন্নতা ও বৈচিত্র সম্পর্কে আরো দুটো আয়াতের উদ্ধৃতিঃ "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাকে অভিন্ন নফ্স থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনী

সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন (৪ : ১)। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্‌র কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সব খবর রাখেন (৪৯ : ১৩)। এছাড়া মানবজাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ২ : ২১৩, ১০:১৯, ১১:১১৮, ১৬:৯৩; ২১:৯২-৯২, ২৩:৫২-৫৪, ৩৯:৬, ৪২:৮ আয়াতে। আল্-কোরআনে আরো আয়াতে মানব জাতি ও সমাজ, এর উন্নয়ন, আলোকপাত করা হয়েছে বিকাশ, অধঃপতন, ধ্বংস সাধন, অনিয়ন্ত্রিত ভোগ-লালসা, প্রবৃত্তি-পূজার উৎপাত সম্পর্কে সহজবোধ্য রূপরেখা-পরিণতির কথা বলা হয়েছে। একই সাথে মানব জাতিকে পার্থিব জীবনে সংযম, শালীনতা, শান্তি, সহাবস্থান ও সৃজনশীল কাজ-কর্মের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

॥ ২ ॥

বহুত্ববাদী সমতাবাদী, শান্তিবাদী, সংযমপূর্ণ, পবিত্র ইচ্ছার যুক্তিসম্মত স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রভৃতি সম্পর্কে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন থেকে প্রত্যক্ষ কয়টা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে শান্তিপূর্ণ পবিত্র বহুত্ববাদী সমাজ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো, যার শেকড় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে মহান মদীনা সনদ ও বিদায় হজ্বের সর্বজনীনন মানব অধিকারের সূত্র পর্যন্ত পৌঁছায়। ইতিহাসের অনেক রক্তক্ষয়ী অধ্যায় ও পর্যায় অতিক্রমের পর মানবজাতি ও পৃথিবীকে একশ্রেণির মানুষেরই হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মানব অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মদীনা সনদ ও বিদায় হজের ভাষণের কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপণ দেখা যায়।

তবে সেখানে যে প্রধান বিষয়টার ঘাটতি প্রকট, তা হলো পার্থিব জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক সমতা, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-জীবিকার নিরাপত্তা, পৃথিবীর বুকে নিরাপদ অক্ষতিকর চলাফেরার মৌলিক অধিকার, যা বর্তমান বিংশ/একবিংশ শতকে রবুবিয়াত/রব্বানিয়াত বা পালনবাদ নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্রে বর্ণিত হচ্ছে। আল-কোরআনে বারে বারে পৃথিবীতে মানবজাতিসহ সকল জীবের জন্য পর্যাপ্ত পরিমিত রিজিক

অব্যাহতভাবে মওজুদ থাকার কথা দৃঢ়তাসহকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই কারো অভুক্ত থাকার কথা নয়; তা যদি কোথাও ঘটে থাকে, তা হলে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে যে, তার হক্ব অন্য কেউ অন্যায়ভাবে গ্রাস করছে। অথচ মানবজাতির একাংশ তা মানেনা, অনুসরণ করেনা। সেজন্যই তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগেও অনাহার, অনটন, বেকারত্ব, যুদ্ধ সংঘাত ও ধ্বংসলীলা। ৩০ দফা বিশিষ্ট এই সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার সাথে কোরআনের পূর্বোক্ত আয়াতে বিধৃত সূত্রগুলো বিজ্ঞতাসহকারে মিলিয়ে দেখলে মানবতা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত নিরাপদে শান্তিতে পৃথিবীতে কাটিয়ে যেতে পারবে।

এই তো গত ১৮-০৯-২০২৩ ইং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (ব্যয়বহুল!) উদ্বোধনী ভাষণের প্রাক্কালে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্মেলনে মহাসচিব এ্যান্তনিও গুতেরেস বলেন, "প্রাচুর্যের এই দুনিয়ায় ক্ষুধা মানুষের উপর এক মর্মান্তিক দাগ এবং মহাকাব্যিক এক মানবাধিকার লংঘন। সারা বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট দূর করতে একটি বৈশ্বিক উদ্ধার পরিকল্পনা দরকার।" এসডিজি নির্ধারণ করা হয় ২০১৫ সালে এবং লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা স্থির করা হয় ২০৩০ সালের মধ্যে। অথচ আট বছরে অর্জন সম্ভব হয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ২। অন্য পক্ষে এই সময়ের মধ্যে শত শত বিলিয়ন ডলারের মারণাস্ত্র তৈরি ও বিক্রি হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, পশ্চিম ইউরোপে বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত এসব মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে, যাতে মারা যাচ্ছে হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ শিশু-নারী-মানুষ, যারা খেটে খেয়ে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করতে চায়। গত ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ 'বিশ্ব খাদ্য দিবসে' মিডিয়ায় পরিবেশিত প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয় যে, বিশ্বে সাড়ে তেরো কোটি মানুষ চরম খাদ্যাভাবে বিপর্যস্ত।

মানব সমাজ এক অর্থে বহুমুখী লেনদেন বিশিষ্ট একটি দোকান, বাজার তথা জনসমষ্টি বটে। সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিজ্ঞান তো তা-ই বলে। হযরত সাহেব কেবলার (ক.) দরবারে হর কিসিমের মানবের অহরহ সমাগমকে তিনি স্বয়ং অত্যন্ত সহজ তৎকালে প্রচলিত চট্টগ্রামী বুলিতে ব্যক্ত করেন, 'মিঞা! যিহ্ দোকান মে হার চীজ রাহতা হ্যায়, ওহি আচ্ছা হ্যায়' জৈনপুরী মৌলানা শাহাবুদ্দিন সাহেবের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। বিবরণ নিম্নরূপ:

(১) হজরতের সোহবতে জৈনপুরী মৌলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব

জৈনপুর নিবাসী পীরে তরীকত হজরত মৌলানা কেরামত আলী সাহেবের বংশধর মৌলানা পীর শাহাবুদ্দিন সাহেব হজরত আকদাছকে ভক্তি করিতেন। একদিন তিনি হজরতের খেদমতে হাজির হইলেন। হজরত তখন তাঁহাদের সামনের পুকুরের পাড় দিয়া উত্তর দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। মৌলানা শাহাবুদ্দিন, হজরতের এক ভক্ত খায়েজ আহমদ এবং আরো অনেক লোকজন হজরতের পিছনে পিছনে চলিয়াছিলেন। হজরত হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, খাজা ছাহেব নাকি!" খায়েজ আহাম্মদ উত্তর করিলেন "হুজুর আমি আপনার গোলাম খায়েজ আহাম্মদ।" এমতাবস্থায় মৌলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তিনি এত বড় পীর খান্দানীর মৌলানা হইয়া হজরতের পিছন পিছন হাঁটিলে লোকে না জানি কি বলে। ঠিক সেই সময় হজরত হঠাৎ পিছন ফিরিয়া খায়েজ আহমদের প্রতি তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মিঞা! শাহাবুদ্দিন সাহেবের চৌগাটি আপনাকে দিলে ভাল হইবে না?' ইহা শ্রবণমাত্র মৌলানা সাহেব নিজ কল্পনার কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া গেলেন। না জানি হজরত তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে তাহার এলেম ও বুজর্গি অন্যকে অর্পণ করিয়া দেন! এই ভয়ে অতি বিনয় সহকারে হজরতের খেদমতে আবেদন জানাইলেন, "হুজুর আমি অতি গরীব লোক। আমার থেকে দেওয়া যাইতে পারে, এমন কিছুই নাই। আমি হুজুরের দরবারে ভিক্ষার প্রত্যাশী। আপনার পবিত্র দরবারে "ছায়েল" মেহমান আসিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করুন"। হজরত আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। উক্ত খায়েজ আহমদ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, "সেই সময় আমার ও মৌলানা শাহাবুদ্দিন সাহেবের অবস্থা এমন 'জজব' ও প্রেরণাপূর্ণ হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনার অতীত"। মৌলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব হজরতের দরবারে বিভিন্ন প্রকৃতির ও ভাবধারার লোকজন দেখিয়া একদিন হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "হুজুর আপনার দরবারে বহু "মসরবের মানুষ দেখিতেছি"। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, মিঞা! যিছ দোকান মে হারচিজ রাহতা-হ্যায়, ওহি আচ্ছা হ্যায়"।

(২) হজরতের দরবারে জৈনপুরীর মৌলানা হাফেজ আহমদ সাহেব

"হজরতের দরবারে জৈনপুরীর সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মৌলানা হাফেজ আহমদ ছাহেব একদা উপস্থিত হন। তিনি অতি সুন্দরভাবে ওয়ায়েজ-নছিহত করিতেন।

দেশবাসীর অনুরোধে জনাব মৌলভী শাহ্ ছৈয়দ ফয়েজুল হক ছাহেব তাঁহাকে ওয়ায়েজের জন্য অনুরোধ করিলেন; হজরতের দায়েরা শরীফের সামনে মাহফিলের এন্তেজাম করা হইল। মৌলানা ছাহেব হজরতের কাছে ওয়ায়েজ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হজরত তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি আরো প্রার্থনা জানাইলেন যে, হজরত আকদাছ যেন সভাপতি রূপে তাহার পার্শ্বে থাকেন। হজরত তাহাতেও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। জৈনপুরী সাহেব হজরতের নির্দেশক্রমে ওয়ায়েজ আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে, সেই দিন মৌলানা ছাহেবের ওয়ায়েজ এত আকর্ষণীয় হইয়াছিল যে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। ওয়ায়েজ করাকালিন তাহার যে প্রেরণাপূর্ণ অজদী অবস্থা আসিয়াছিল, তাহা আর কোন দিন পরিদৃষ্ট হয় নাই। হজরত তাহার ওয়ায়েজে খুসি হইয়া তাহাকে দোয়া করিলেন। এবং নির্দেশ দিলেন, "মিঞা, মৌলানা সাহেব কাঁটেছে ঝাড় কো কাট করকে গোলাপ আওর রায়হানকা ঝাড় লাগা দিজিয়ে।" সেই দিন হইতে মৌলানা সাহেবের ওয়ায়েজ-নছিহতে অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি দেখা দেয়। মানুষ তাহার বক্তৃতায় মুগ্ধ না হইয়া পারিতনা।

(৩) বৌদ্ধ ধনন্জয়কে স্বধর্মে রাখিয়া দীক্ষা

"জনাব শাহ্ ছুফি মৌলানা ছৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বর্ণনা করেন– "আমি রোজ সকালে হজরতের সহিত চা পানে অভ্যস্ত ছিলাম। তিনি আমাকে ছাড়া একা চা-নাস্তা খাইতেন না। একদিন সকালে নাস্তার সময় নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধনন্জয় নামক একব্যক্তি আসিয়া হজরতের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি হজরতের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। হজরত তাহাকে সম্মতি না দেওয়ায় তাহার মনস্কাম পুরণার্থে আমাকে তাহার জন্য হজরতের নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ জানান। আমি হজরতের নিকট তাহার আর্জি ও বাসনা পেশ করি। ইহাতে হজরত ধননজয়কে তালাস করিলেন। ধনন্জয়, "হুজুর! দাস হাজির আছি" বলিয়া হজরতের সামনে করজোড়ে বসিয়া পড়িলেন।

তখন হজরত তাহাকে বলিলেন, "মিঞা! তুমি তোমার ধর্মে থাক। আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।" ইহার পরও তিনি বসিয়া রহিলেন। হজরতের খাদেম মৌলবী আহমদ ছফা কাঞ্চননগরি সাহেব তাহাকে পিছন হইতে ইসারা

করিয়া ডাকিয়া নিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহাকে হাকিকতে মুসলমান করা হইয়াছে।

ইহার পর হইতে তিনি প্রায় সময় হজরতের হুজরায় তাঁহার সোহবতে সময় অতিবাহিত করিতেন। হজরতের ওফাতের পর বাবাজান কেবলার হুজরাতে প্রায় রাত কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার স্ত্রী আমাকে একদা বলেন যে, তাহার মৃত্যুর পরও তাহাকে সশরীরে বিচরণ করিতে অনেকে দেখিয়াছে। তাহার নির্দেশক্রমে তাহার মৃতদেহ চিতায় অগ্নিদাহ না করিয়া সমাহিত করা হয়। এইরূপ বহু হিন্দু ভক্তকে চিতাগ্নিতে জ্বালাইতে অক্ষম হওয়ার পরে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানে বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্নভাবে আলোচনায় উঠে আসা পছন্দের স্বাধীনতা নির্বাচনের স্বাধীনতা অর্থাৎ Freedom of Choice প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এই তত্ত্ব বেশ জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু আল-কোরআন সেই সপ্ত শতাব্দীতেই এ বিষয়ে মুক্তদ্বার নীতির উপর আলোকপাত করেছে। আল-কোরআনের সূরা বাক্বারার দ্বিতীয় আয়াতেই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছেঃ এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই। এটা মুক্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক (২:২)। এরপরে মুত্তাকীদের সংজ্ঞা ও পরিচয় বিবৃত হয়েছে। মুত্তাকী হওয়া, না-হওয়া কোন ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয়। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে; "দ্বীনে জবরদস্তি নেই (২:২৫৬)। এ সম্পর্কে সূরা শামস-এর ১–৯নং আয়াত প্রণিধানযোগ্য (৯১:১–৯)। এর সাথে আরো প্রণিধানযোগ্যঃ ৪:১২৩-১২৪; ৬:১২, ১৩:২৭, ১৬:১০৪-১০৫, ২৮:৫৬, ৪২:৩০,৯০:১০, ৯১:৭, ৯২:১২ প্রভৃতি। সূরা বনি ইসরাইলে বিষয়টাকে আরো সহজ করে প্রকাশ করা হয়েছে, "যারা সৎপথ অবলম্বন করে, তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে ও যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য, আর কেউ অন্য কারও ভার বইবেনা। আমি রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিইনা। আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন ওর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে (সৎকর্ম করতে) আদেশ করি; কিন্তু ওরা সেখানে অসৎকর্ম করে, তখন তার ওপর শাস্তি ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় ও আমি তা সম্পর্করূপে ধ্বংস করি (১৭:১৫–১৬)।" আল-কোরআনে আরো বলা হয়েছেঃ 'বলুন! সত্য এসেছে, আর মিথ্যা অন্তর্ধান করেছে। মিথ্যাকে অন্তর্ধান করতেই

হবে (১৭:৮১)। আরো বলা হয়েছেঃ "আপনি বলুন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থানুযায়ী আমল করছে, আর তোমাদের রবই ভালো জানেন, কে সঠিক হেদায়েত পথে চলছে (১৭:৮৪)। এটা ব্যক্তি মানুষের Freedom of Choice-এর প্রতি শ্রদ্ধাও বটে। এই তত্ত্বকে ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (র.) ব্যক্তিগত, সামাজিক, বিচারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু করে ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক এবং ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন, যা বিংশ শতাব্দীতে বৃটেনের অর্থনীতি বিশারদ চার্লস সি. এডামস 'সামাজিক অর্থনীতি'র সূত্র নির্মাণ করতে গিয়ে 'সরবরাহ ও চাহিদাসূত্র (কানুন আল-আরজ ওয়াল তলব)', একচেটিয়াবাদের (Monopoly) বিরোধিতা, উদ্যোক্তার সঙ্গত মুনাফার অধিকার, সাধারণ মানুষের দুর্দশা সৃষ্টিকারী একচেটিয়াবাদী ব্যবসা ও সম্পদের পুঞ্জীভবনের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার অভিমতের শাশ্বত বাস্তবতার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আযমের (র.) এসব সূত্রের উৎস অবশ্য আল-কোরআন ও হাদিসে রাসুল (দ.)।

(৪) হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ চৌধুরীকে

স্ব-ধর্মে দীক্ষা ও উপদেশ দান

"হজরতের সর্বপ্রথম খলিফা অলিয়ে কামেল মৌলানা শাহ্ ছুফি অছিয়র রহমান ফারুকী (র.) এর সুযোগ্য সন্তান শাহজাদা মৌলবী খায়েরুল বশর মিঞা সাহেব বলেন; ডাক্তার মৌলবী আবদুল মজিদ ও ডাক্তার মৌং আবদুল মালেক তাঁহারা উভয়েই হজরতের মুরিদ ছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কধুরখীল মৌজার শ্রীকান্ত চৌধুরী বাড়ীর হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণ বাবু ইসলাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া সস্ত্রীক একদা হজরত সমীপে হাজির হইয়া মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, "হুজুর, আমি নিঃসন্তান। হুজুরের মেহেরবানীতে যদি আমার ছেলেমেয়ে হয় এবং আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

তখন হজরত তাহাকে উত্তর করিলেন, "তোমাকে 'আজলে' (অর্থাৎ বাস্তবে) মুসলমান করিয়াছি। নিজের হাতে পাকাইয়া খাইও। পরের হাতের পাক খাইওনা। আমাকে নিরীক্ষণ কর। আমি বারমাস রোজা রাখি। তুমিও রোজা রাখিও। দেখ! মাদার গাছে ফুল হয়, ফল হয় কি?"

ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার সন্তান হইবেনা। আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলমান হওয়ারও তাহার প্রয়োজন নাই। রোজা-নামাযের উদ্দেশ্য মতে পাপ-বিরত থাকিয়া নিজের বিচার-বুদ্ধিকে সামনে রাখিয়া চলাই প্রকৃত "ইসলাম।" এই পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে। হজরত তাহাকে উহার প্রতিই নির্দেশ দিতেছেন।

কতিপয় মজহাবী মাসায়েলা

এ প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মজহাবী মাছায়েলা প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলো, যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে সূরা জাসিয়ার ১২ ও ১৩ আয়াত প্রণিধানযোগ্য: "আল্লাহ্ই তো নদী-সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রের বুকে চলাচল করতে পারো; যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন আসমান ও জমিনের সব কিছু; নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল কওমের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন (৪৫: ১২–১৩)।

(ক) গায়েব প্রকাশঃ

ফরহাদাবাদ নিবাসী মৌলানা আবদুল জলিল সাহেব, একদিন হজরতের খেদমতে গায়েব বলার মাসায়েল জানিতে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! গায়েব বলা প্রকাশ করা কি জায়েয আছে? হজরত উত্তর করিলেন, "যব কুন্ কাহা ছব হোগেয়া। ফের গায়েব কাঁহা হ্যায়?" অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা, যখন হয়ে যাও বলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গেই সব হইয়া গিয়াছে। তখন আর অদৃশ্য কোথায় রহিল?

(খ) সম্মান প্রদর্শনঃ

তিনি আবার জানিতে চাহিলেন, হুজুর! সেজদায়ে "তাহীয়ার" ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

হজরত উত্তর করিলেন, "পাঁচ আদমী কে লিয়ে সেজদায়ে তাহীয়া হ্যায়। কাজিখান ফতোয়া দেখো।"
অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঁচ জনকে সেজদায়ে তাহীয়া করা জায়েয আছে। মা, বাপ, পীর, ওস্তাদ এবং সুবিচারক বাদশা।

হজরতের খলিফা ফরহাদাবাদ নিবাসী মৌলানা আমিনুল হক সাহেব, "তোহফাতুল আখিয়ার" নামক কেতাবে উহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। উহাতে হজরতের অনুমোদন ও দস্তখত আছে। তিনি নিজে রেওয়াজ বা দেখাদেখী প্রথাকে পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, **"আচ্ছালামু আলায়কুম কহো"**।

(গ) ফিত্‌রার মাসায়েলার উত্তরঃ

একদিন প্রতিবেশীগণ হজরতের নিকট ফিত্‌রার মাসায়েলা জানিতে চাহিলেন। তাহারা বলিলেন, হুজুর! কেউ বলে আটা দিতে, কেউ বলে গেউ দিতে, আমরা এখন কোন পথ ধরিব! হুজুরের রায় জানিতে চাই।

হজরত উত্তর করিলেন, মিঞা! যেই দেশে যেই খাদ্য প্রধান, তাহাতেই ফিত্‌রা দেওয়া যাইতে পারে। তোমাদের প্রধান খাদ্য চাউল। তোমরা চাউল দিলেই ফিত্‌রা আদায় হইয়া যাইবে।"

(ঘ) বাহাস মোনাজেরাঃ

"এক সময় আজিম নগর নিবাসী মাস্টার ফয়েজউল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে মৌলানা মহিউদ্দিন নামক একব্যক্তিকে মাইজভাণ্ডারী তরিকা মতে হালকা জিকির, সেমা ও সেজদায়ে তাহীয়া সম্বন্ধে মাইজভাণ্ডারী ভক্তগণের বিরুদ্ধে ওয়ায়েজ করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়।

হজরতের মধ্যম ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র ও অন্যতম খলিফা জনাব মৌলানা ছৈয়দ আমিনুল হক (প্রকাশ ছোট মওলানা) সাহেব আজিম নগর নিবাসী মুন্সি সৈয়দ আফাজুদ্দিন সাহেবের পুত্র হজরত সাহেবানীর সহোদর ভ্রাতা ও হজরতের ফয়েজ প্রাপ্ত খলিফা আবদুল মজিদ মিঞাকে হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া আরজ করিলেন, হুজুর! আমরা বহু আলেম দরবারে পাকের শিষ্য ভক্তদের মধ্যে বর্তমান আছি। মহিষখালীর মৌলানা আকামুদ্দিন সাহেব, রাঙ্গুনীয়ার মৌলানা খলিলুর রহমান সাহেব, বাঁশখালীর মৌলানা মোহছেন সাহেব, সুন্দরপুরের মৌলানা আমিনুল্লাহ্ সাহেব, কাঞ্চনপুরি মৌলানা আবদুল গণি (আয়নায়ে বারী প্রণেতা) সাহেব, মৌং আবদুচ্ছালাম, মৌং আবদুল হাদি, ফরহাদাবাদী মৌলানা আমিনুল হক সাহেব এবং হাফেজ কারী মৌলানা মোহাদ্দেছ সৈয়দ তোফাজ্জল

হোছাইন সাহেব এবং আরো অনেক বিখ্যাত আলেমগণ উপস্থিত আছেন। খোদার ফজলে আমাদের কাছে সমস্ত মাসায়েলার কেতাবাদি ও প্রমানাদি মৌজুদ আছে। আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই মোনাজেরায় সুদক্ষ। হুজুরের অনুমতি পাইলে আমরা মৌলানা মহিউদ্দিনের সাথে বাহাস মোনাজেরা করিতে ইচ্ছা করি। হজরত আদেশ করিলেন, "তিনি মুছবী তরিকার লোক, খিজিরী কাজ কারবার তিনি কি বুঝিবেন? তোমরা ফাসাদ ও বাহাস করিওনা। আপন হালতে থাকিয়া যাও। তাহারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।" তখন মৌলানা আমিনুল হক সাহেবের (হজরতের ভ্রাতুস্পুত্র) আদেশে আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীতে সেমা সহ জজবার মজলিশ করা হয়। তাহারা সেমার জজবা মজলিশ করাকালে যাহারা আবদুল মজিদ মিঞার বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতে লাগিল; সেমার শব্দ কানে আসিতেই তাহাদের জজ্‌বা ও সমস্ত শরীরে আলোড়ন হইতে লাগিল। সকলেই ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। হিন্দুরা বলাবলি করিতে লাগিল, এই রাস্তা দিয়া যাইওনা। এই বাড়ীতে মক্কা চালান দিয়াছে। কেহ স্থির থাকিতে পারিবেনা। ফলে দেখা গেল, মৌলানা মহিউদ্দিনের মজলিস জমিল না, উক্ত মজলিস হইতে প্রায় সকলেই জজবা হালত ও বেখোদ অবস্থায় এই হালকা ও সেমার মজলিসে যোগদান করিতে লাগিল।"

(ঙ) ফাতেহাখানি মাসায়েলায় হজরতের উত্তর

"বিভিন্ন মৌলানা সাহেবদের বিভিন্ন মতামত দেখিয়া মহল্লার লোকগণ একদিন হজরতের খেদমতে ফাতেহা সওয়াব রছানী সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, মিঞা! আমার মাতা সাহেবানী ঘর দরজা পরিষ্কার করিয়া লিপ দিতেন এবং ফাতেহা পড়াইয়া ইসালে সওয়াব করিতেন। মুরব্বিগণের প্রতি সওয়াব পৌঁছাইতেন। ইহা ভাল।"

নোট:

১. সুপ্রকাশ রায়, পরিভাষা কোষ, Race (মহাজাতি; জাতি; বৃহৎ মানবগোষ্ঠী) ১৯৫৮, কলিকাতা।

২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০.০৯.২০২৩ইং।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল-কোরআন, হাদিস শরিফের মহৎ শিক্ষার সজীব সক্রিয়তাই তাঁর তাসাওউফ ও ব্যবহারিক জীবন-সাধনা

॥ ১ ॥

প্রথমেই আচার-ধর্ম, ধার্মিক, আচারধর্ম নিয়ে অতীতের বাড়াবাড়ি, ধর্মাচার নিয়ে পেশাজীবী সুলভ অগ্রহণযোগ্য আচরণ সম্পর্কে অচল-কোরআন ও হাদিস শরিফ থেকে কিছু উদ্ধৃতি অবলোকন করা যাক ঃ-

ধর্মে জবরদস্তি নয়ঃ

দ্বীনে জবরদস্তি নেই (২:২৫৬), তারা যা বলে আমি তা সম্যক অবগত আছি, আর তাদের উপর জবরদস্তি করা আপনার কাজ নয়, সুতরাং আপনি সেই ব্যক্তিকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দিন, যে আমার শাস্তির ওয়াদাকে ভয় করে (৫০:৪৫)।

মুত্তাকীর সংজ্ঞাঃ

পুর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে তোমাদের সকল পুণ্য নয়, বরং পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ আখেরাত দিবস, ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় যে আত্মীয়-স্বজনকে, এতিমগণকে, অভাবগ্রস্তগণকে মূসাফিরগণকে, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে এবং সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে, আর প্রতিশ্রুতি পালন করলে, আর দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখে এবং প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য্যধারণ করলে। বস্তুত এরাই তারা সত্যবাদী ও মুত্তাকী (২:১৭৭)।

আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণঃ

"আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করোনা, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো (২:৪১)। তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে খেল-তামাশার বস্তু মনে করো না (২:২৩১)"।

ধর্ম যাজক প্রসঙ্গঃ

"ইয়াহুদিরা বলে, ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র; আর খ্রিস্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র, এগুলো তাদের মুখের কথা মাত্র, তারাও পূর্বেকার কাফেরদের মতো কথা বলে, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা আল্লাহ্ ছাড়া তাদের পণ্ডিতদেরকে ও ধর্মযাজকদেরকে তাদের প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর মরিয়ম পুত্র মসিহকেও। কিন্তু তাদেরকে এক ইলাহ'র ইবাদত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে, তার চেয়ে তিনি কত পবিত্র! (৯:৩০–৩১)"। হে বিশ্বাসীগণ! পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের (আহবারি ওয়া রুহানি) মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত করে। যারা সোনা-রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন (৯:৩৪)"।

সন্ন্যাসবাদ প্রসঙ্গঃ

আমি নূহ্ ও ইব্রাহিমকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁদের বংশধরদের জন্য রেখেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। কিন্তু অল্প ক'জনই সৎপথ অবলম্বন করেছিল, আর অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। তারপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসুলদেরকে ও মরিয়ম পুত্র ঈসাকে। আর তাকে (ঈসাকে) দিয়েছিলাম ইঞ্জিল ও তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ– এতো ওরা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমি ওদের ওপর এ বিধান চাপাইনি, অথচ এ-ও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার। আর ওদের বেশির ভাগই তো সত্যত্যাগী (৫৭: ২৬–২৭)"।

উপসনালয়ের কুটিল অপব্যবহারের প্রবণতার বিরুদ্ধে আল-কোরআনের কঠোর অবস্থানঃ

“এবং যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন (মসজিদান্ যেরারান্), কুফরী, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মতলবে এবং ইতোপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করেছে, তার গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের মতলবে, তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, ‘আমরা সদুদ্দেশ্যেই তা করেছি’; আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা তো মিথ্যাবাদী। আপনি কখনো এতে (সালাতের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, এটা আপনার জন্য অধিক উপযুক্ত। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পবিত্রতা অর্জন ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন (৯: ১০৭–১০৮)”।[১]

পবিত্র বিদায় হজের ভাষণ, যা সর্বজনীন কল্যাণমূলক আচরণবিধি হিসেবে গণ্যঃ

সাবধান! ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করোনা। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পরের ভাই। এক দেশের মানুষের উপর অন্য দেশের মানুষের প্রাধান্যের কোন কারণই নেই। সমস্ত মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে উৎপন্ন। মানুষের প্রাধান্য কাজ ও যোগ্যতার জন্য। যাকে আমরা শাসন কাজে নিয়োগ করি, আমরা তার ভরণপোষণ করি। এরপরও যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তা বিশ্বাস ভঙ্গ বা ঘুষ বলে গণ্য হবে এবং ঘুষ খাওয়া মহাপাপ। হে মানববৃন্দ! কোনো দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করোনা, গরীবের উপর অনাচার করোনা। সাবধান! কারো অসম্মতিতে কোন জিনিষ গ্রহণ করো না। সাবধান! শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি মিটিয়ে দিও। যে মানুষ দাস-দাসীদের ক্ষমা করে ও ভালোবাসে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন ও ক্ষমা করেন। আমার উম্মতের মধ্যে যে ঝগড়া ও বিসম্বাদ করতে বের হয়, তার বুকে আঘাত করো। একত্রে খাওয়া-দাওয়া করো। আলাদা-আলাদাভাবে আহার করোনা। কেননা, একত্রে খাওয়াতে বরকত আছে। যে বিভেদ সৃষ্টি করে তার স্থান জাহান্নামে। আমি তোমাদের পাঁচটি আদেশ করছি। (ক) একতা রক্ষা করো, (খ) জনতার অনুগত থাকো

(গ) প্রয়োজনে হিজরত করো (ঘ) উপদেশ শ্রবণ করো (ঙ) আল্লাহ্‌র পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করো। হে মানববৃন্দ! তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মাতা-পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। মাতা-পিতার অসন্তুটিই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। তোমাদের জান্নাত তোমাদের মায়ের পদতলে অবস্থিত। হে মানব সন্তান! তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে মানুষের উপকার করো।[২]

॥ ২ ॥

তাঁর প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ছিল আল-কোরআন, হাদিসের শিক্ষার অনুরণন

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌ সুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ (ক.)-এর মারেফাত, মুজাদ্দেদিয়াত জিন্দেগী এমন ব্যাপক ও সুউচ্চ মর্তবাসম্পন্ন যে, তা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে মানুষের ধ্যানজগৎ, মনোজগত, পার্থিবজগত তথা আটপৌরে জীবনকে নিবিঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখে। তাঁর পার্থিব দৃশ্যমান জীবন ও জগতের দিকে তাকালে ‘রিযিকের’ অব্যাহত যোগানদাতা হিসেবে আল্লাহ্‌র রহমান সত্তার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। লোকের সাধারণ জীবন যাত্রার অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর সার্বিক অবস্থান। স্বীয় জীবনে, কথায়-কাজে, আচরণে-নসিহতে আল-কোরআন ও হাদিসের শিক্ষার চলমান দৃষ্টান্ত তিনি। কোরআন-হাদিসের মহৎ শিক্ষাকে সজীব, সক্রিয় ও সৃজনশীল হিসেবে পরিবেশন করাই তাঁর তাসাওউফ ও ব্যবহারিক জীবন-সাধনার অন্যতম মর্মবাণী।

প্রাচ্যের ইতিহাসে আচারধর্ম, নৈতিকধর্ম মানব জীবনকে বহুমাত্রিকভাবে প্রভাবিত ও আন্দোলিত করেছে। আবার সেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে পারস্য, রোমান সাম্রাজ্যসহ সর্বত্র ধর্মের নামে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত, পারস্য রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এ ধরনের নজীর অনেক। দর্শনের ইতিহাসও এসব অপ্রিয় তথ্য ও বিতর্কে আকীর্ণ। ধর্মের নামে অনাকাঙ্ক্ষিত আচার হযরত সাহেব কেবলাকেও সতত দংশন করতো। বিভিন্নভাবে এই বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর জীবনে ও কর্মে। আল-কোরআন ও হাদিসের প্রয়োগে ন্যূনতম ব্যতিক্রমও তাঁর জন্য ছিল বেদনাদায়ক। তাঁর এই মর্মবেদনা বিবৃত হয়েছে অছিয়ে গাউসুল আযম বিরচিত ‘বেলায়তে

মোত্লাকা’ গ্রন্থে অষ্টম পরিচ্ছেদ, ‘বেলায়েত রহস্য’ অধ্যায়ে, যা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলো :

বেলায়ত রহস্য

“কবরে ও পুকুরে পবিত্র কোরআনের পাতা নিক্ষেপঃ হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ (ক.) নিজ লিখিত কোন বই পুস্তক কিংবা কেতাবাদি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার প্রভাবশালী পবিত্র কথাবার্তা ও দৈনন্দিনের অলৌকিক কর্ম পদ্ধতিই তাঁহার পরিচয়ের প্রমাণ বহন করে। যেমন, পবিত্র কোরআনের দশ পাতা সামনের পুকুরে এবং সতর পাতা তাঁহার একমাত্র পুত্র মরহুম ছৈয়দ মৌং ফয়জুল হক সাহেবের কবরের উপর রাখার আদেশ রহস্যের প্রতি নজর দিলেই এবং তাঁহার কথা মত “কম্বখতরা কালামুল্লাহ্ বেচিয়া কলামোলা খাইয়াছে”–প্রভৃতি বাণীর বিষয়, চিন্তা করিলে বুঝা যায়, জনগণ পবিত্র কালামুল্লাহ্র রূহানী দিক ছাড়িয়া ছোটদের মত সহজ সুলভ ভোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং পবিত্র কোরআনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অবহেলা করিতেছে। ইহাতে কোরআনের লিখিত বস্তু তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে না।

তাই তিনি পবিত্র কোরআনী হেকমত দ্বারা দশ অর্থাৎ সর্বসাধারণের অন্তরের মলিনতা বিদূরিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। যাহা কোরআন পাকে “শেফাউল লেমাফিছ ছুদূর” অর্থাৎ কোরআন, অন্তরের বিমার দূরকারী (ছুরা ইউনুস–৫৭) বলিয়া উল্লেখ আছে। (যেহেতু গণিত মতে দশ চরম সংখ্যা)

হজরত কেবলাকা’বা তাঁহার ত্রাণকর্তৃত্ব গাউছুল আজমীয়তের প্রভাবে জনসাধারণকে বালা-মুছিবত ও সংসার ঝামেলা হইতে নাজাত দিবেন। এবং যাহারা খোদা তালেব ও খোদা অন্বেষণকারী তাহাদের অন্তঃকরণকে খোদায়ী প্রেম প্রেরণার জলধারা সিঞ্চনে অনন্তজীবন দান করিবেন। তাঁহার উপরোক্ত বাণীসমূহের সারমর্ম ও কার্য্যকলাপ সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী ও মঙ্গলময় ইঙ্গিতবাহী এবং নৈতিক পতন যুগের দিশারী। ইহা কোরআন পাকের দশ পাতা পুকুরে ফেলার রহস্য।

পুকুরের জল যেমন পুকুরে অবতরণকারীকে শান্তি দান করে। সেইরূপ তাঁহার অনুসরণকারীও খোদার নাম স্মরণে শান্তি লাভ করিবে; এবং দশজ্ঞানেন্দ্রিয়কে

রূহানী প্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে সজাগ করিবে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। মানবপ্রকৃতি, অনুভূতির দিক দিয়া এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যিক জ্ঞান আহরণ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ামক, মনের সাহায্যে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সম্পর্কীত অভ্যন্তরীণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে।

এই দশ প্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্রষ্টানুরাগী, নিত্যে আসক্ত ও সংসারানুরাগী, অনিত্যে আসক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত।

যাহারা সিদ্ধ কামেল ব্যক্তির অনুগত বা শ্রদ্ধাশীল এইরূপ দশজন বা জনগণের জন্য হজরত মূসার (আ.) বারটি জল প্রবাহের মত তাহার ফয়জ বরকতের জলধারাতে দশটি পবিত্র কোরআনের অংশ বা পাতা নিক্ষেপ দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তাহার অনুসারী বা অনুগ্রহ প্রার্থী জনগণ প্রত্যেকের সুবিধানুযায়ী যেন তাহার ফয়জ বরকত ভোগ করিতে পারে।

যাহারা সংসারানুরাগী বা অনিত্যে আসক্ত, তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্যাসত্য স্রষ্টানুরাগ অভাবে মৃতপ্রায় ও নির্জীব। তাঁহার রূহানী জগতের উচ্চমার্গে বিচরণে বা সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান আহরণে তাহারা অসমর্থ, তাই তাহাদের উদ্দেশ্যেও কোরআনী হেদায়ত বস্তু হিসাবে কোরআন পাকের দশটি পাতা বা অংশ এবং সর্বজনীন হিসাবে তাঁহার অনুরাগী বা বিরাগী প্রত্যেকের জন্য সাতটি পাতা বা শুদ্ধি প্রণালী স্বাভাবিক ও সহজতম কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সংসার জীবনযাত্রায় মানব যেমন বাসন-কোসন পরিষ্কার করিয়া পুনঃ কার্য্যকরী শক্তি লাভ করে; তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিও সংসার ঝামিলা হইতে মুক্ত ও পরিষ্কার হইয়া কার্য্যকরী শক্তি লাভ করিবে।

জীবন নামে খ্যাত পুকুরের বিশুদ্ধ পানি পান করিয়া মানবকুল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে, তদ্রুপ হজরতের বেলায়ত সুধা পানকারীও ছুফী মতানুযায়ী ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করিয়া পবিত্র হাদীছ মতে "মাউতু কব্‌লা আনতামাউতু" রূপ চারি প্রকার ইচ্ছা মৃত্যুকে বরণ করতঃ খোদা পরিচিতি জগতে ছুফী পরিভাষা মতে "হায়াতে আবদী" নামক নিত্য জীবন লাভ করে। ইহার সাহায্যে মানব, খোদা পরিচিতি জগতে উন্নীত হইয়া ঊর্ধতম সত্যবস্তু স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া নিজ স্রষ্টা সম্বন্ধে এক "কশ্‌ফী"

নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে; যাহা সন্দেহের অতীত। উপরোক্ত তত্ত্ব, হজরত কেবলা কর্তৃক কবরে কোরআন পাকের সতর পাতা রাখার ইঙ্গিত বহন করে। "ফানায়ে ছালাছা ও মউতে আরবা" এই সাত প্রকার শুদ্ধি প্রণালী বা কর্মপন্থা কার্য্যকরী প্রত্যক্ষ কোরআনী হেদায়ত বলিয়া তিনি সাব্যস্ত করেন; যাহা সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য নির্বিরোধ ও সহজসাধ্য আইনুল একীন ও হাক্কুল একীনজনিত বস্তু।

অত্র গ্রন্থের ফানায়ে ছালাছা বা ত্রিবিধ বিনাশ পদ্ধতির উল্লেখ করিতে গিয়া হজরত আক্দাছের একটি ভাবপ্রবণ উক্তি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি। যাহার ফলে দৃষ্টান্তমূলক বুঝ ব্যবস্থা সহজসাধ্য হইবে।

হজরত গাউছুল আজম ভাব বিভোরতার পরক্ষণে কোন কোন সময় বলিতেন "(১) আমি ছাগল দিয়া বলদ দাবাই, (২) ভেড়া দিয়া ভৈষ দাবাই, (৩) বানর দিয়া বাঘ দাবাই।" এই রহস্যময় বাণীর সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়; এই দৃশ্যমান জগতের (নাছুত) বা পশু স্তরের প্রতি আকৃষ্ট মানব।

১. যাহারা পরের স্বার্থে পরের ইচ্ছানুযায়ী পার্থিব কাজে নিয়োজিত থাকিতে বাধ্য অথবা নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব গরজে খোদা ভুলা, তাহারা বলদের মত নিরীহ অসহায়। তাহাদের রূহানী বা আত্মার মঙ্গলার্থে ছাগলের মত পাকছাপ বা পবিত্র থাকা এবং নির্দোষ।

হালাল বৈধ স্বচ্ছ খাদ্য গ্রহণ, আলস্য পরিহার ও মনন চিন্তাধারার দিক্ দিয়া স্রষ্টা অনুরাগ স্মরণ ও সজাগচিত্ত থাকা উচিৎ। যাহার ফলে "ছালেক" প্রথম স্তরের বিনাশ পদ্ধতী 'ফানা আনিল খাল্ক" বা পরমুখাপেক্ষিতা দোষ বিবর্জিত খোদা পথচারী সাব্যস্ত হইবে।

২. যাহারা মহিষের মত অহম মত্ত তাহারা "ফাউট্টা" নামে পরিচিত "বাঘ" বা এলাকা ত্যাগি জাড়ালো মহিষের মত দ্বিধাহীনভাবে পরের সম্পদ নষ্ট ও গর্ভধারণ যোগ্য মাদাম মহিষের তালাসে পাগল "চেলা" সদৃশ। যাহারা নির্বিচারে অনর্থ কাজে লিপ্ত, তাহাদের মুক্তির জন্য সমাজবদ্ধ আচার ধর্ম নিষ্ঠ কামেল বা মুখ্য ব্যক্তির সাহচর্য্য, পাপ বিরতকারী বাণী ও কর্মের একান্ত দরকার।

যেহেতু এই পশুশ্রেণীর জনগণকে গৌনী বা মোকাল্লেদ বলে। তাই খোদাভয়ে অনর্থ পরিহার, যাহা না হইলে চলে সেই কাজ বা কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং পরদোষ অন্বেষণ করার অভ্যাস পরিহার করা ও নিজ দোষ ধ্যান করা একান্তভাবে দরকার।

তাহাদের জন্য হজরত মোহাম্মদ (দ.) কোরানে বেহেশ্তের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন (ছুরা নাজেয়া–৪০–৪১)।

৩. ন্যায়নীতি বিবর্জিত হৃদয়হীন জন, অপরের প্রতি হিংস্র ব্যাঘ্র সুলভ রক্ত লোলুপতা পরিহার পূর্বক মানবীয় আকৃতি বিশিষ্ট বানরতুল্য প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। যাহার ফলে খোদার ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ ইচ্ছাকে বিলীন করার ফলে খোদা নির্ভরতা অর্জিত প্রাণ খাদ্য লাভে সমর্থ হয়। যাহা ছুফী দর্শন মতে "তছলীম এবং রজা" গুণজঃ প্রকৃতির ফল। মওলানা রূমী (রহ.) বলেন, 'তুমি ফেরেশ্তা এবং পশু এই উভয় স্বভাবে স্বভাবিত। পশুর স্বভাব হইতে মুক্ত হও, ফেরেশ্তারও ঊর্ধ্বে যাইতে সক্ষম হইবে।'

ইহাতে বুঝিতে হইবে, নবী রাসুল, অলীয়ে কামেলগণ মানব জাতিকে স্রষ্টা অনুরাগ দান উদ্দেশ্যে পার্থিব অনুরাগ শিথিল ক্রমে চরিত্রবান কর্মঠ মানব সৃষ্টি করেন। তাই কোরান মজিদের প্রথম ভাগে "গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম অলদ্দোয়াল্লীন" (ছুরা ফাতিহা–৭) বাণী প্রকাশ আছে। এই আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া আল্লামা ইবনে আরবী (রহ.) স্বীয় তফছীরে লিখিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্তায়ালার "রহমান রহীম" গুণজ নামের ভরসায় বেপরোয়া পাপে লিপ্ত হয় তাহারা 'মাগদুবিন'–গজবের যোগ্য এবং যাহারা খোদা তায়ালার প্রদত্ত ভালাই গ্রহন করেনা অলস, খোদা প্রদত্ত প্রাকৃতিক ভালাইকে নিজ হিতার্থে কাজে লাগায়না এবং কর্মবিমুখ ও অস্বীকারকারী তাহারা "দোয়াল্লিন"–পথভ্রষ্ট। যাহারা এই উভয় পন্থার প্রতি নজর দিয়া আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র পেয়ারা নবী-অলীর অনুগত হইয়া ভালাইর পথে চলে তাহারাই 'মোসলেম' বা শান্তিপ্রিয় জাতি, খোদার অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত ধর্ম ব্যবসায়ীগণ পুণ্যহীন বাক্য ও নীতিহীন বাক্য দ্বারা জনগণকে পাপ কার্য্যে উৎসাহিত করেন এবং বলেন, "যে যত করে

পাপ, টাকার কল্যানে সব হয়ে যায় মাফ” ইত্যাদি। ইহারা সৎপথ প্রদর্শক নহে, ভণ্ড। যেহেতু শান্ত চরিত্র, সৎকর্ম অনুরাগি ব্যক্তিই মানব বাচ্য।

একই গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদ ‘ফজিলতে রব্বানী’ অধ্যায়ে ‘সুনেতৃত্ব ও ধর্মসাম্য’ উপশিরোনামে খাজা কামালুদ্দিন (১৯২৭ খ্রি.) এর “খলিফাতুল্লাহে আলাল আরদ”-এর উদ্ধৃতিসহকারে বলা হয়েছে “মানব জাতি চেষ্টার মাধ্যমে একই নির্দিষ্ট স্থানের তালাশে মশগুল দেখা যায়। চেষ্টার পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ব্যাপারে সকলেই একমত। প্রকৃত ছুফি উনিই, যিনি প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে খোদার দিকে আহ্বান করেন।”

অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) এর ভাষায়:

“প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে জানো তিন ভাবে
বাক-বিতন্ডা পরিহারে, জানার আগ্রহে,
পরদোষ পরিহারে, নিজ দোষ ধ্যানে
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে।
না-দেখাইবে “পীর” যাকে এই তিন ধারা,
আসিবেনা সোজা পথে সেই পথহারা।”

নোট:

১. ‘যেরার’ শব্দের বাংলা অর্থ ‘ক্ষতি’। এই মারাত্মক ক্ষতিপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিশদ জানতে মাওলানা আশরফ আলী থানভী প্রণীত বয়ানুল-কোরআন-এর সংশ্লিষ্ট আয়াত সংক্রান্ত টীকা পাঠ্য। আবু আমের রাহেব নামক এক ব্যক্তির সাথে মুনাফেকরা সংশ্রব রাখতো, যে লোকটা রোম সম্রাট ‘হেরাক্লিয়াসের সাথে ষড়যন্ত্র করে নবীজী (দ.) তথা ইসলাম নিপাতের চক্রান্ত করতো। ‘এ বিষয়ে’ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ইসলামের ইতিহাস সংস্কৃতি’ বিভাগের প্রধান ড. ওসমান গণির বিখ্যাত ‘মহানবী’ (১৯৮২ ইং) গ্রন্থের একবিংশ অধ্যায়, ‘তাবুক অভিযান’ দ্রষ্টব্য।

২. ড. ওসমান গণি : মহানবী, কলিকাতা, ১৯৮২ইং, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, বিদায় হজ।

দ্বিতীয় ভাগ

জীবনী-সংক্ষেপ

দ্বিতীয় ভাগ

জীবনী-সংক্ষেপ

১. পবিত্র আগমনী পূর্বাভাস

দর্শন জগতের অম্লান বিস্ময় শায়খুল আকবর হযরত মহীউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.) [১১৬৫-১২৪০ খৃ.] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই মর্মে পূর্বাভাস প্রদান করেন যে, "নবী করিম (দ.)-এর আরবে অস্তমিত রবি এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে পুনঃউদিত হইবে। তাঁহার নাম থাকিবে খোদার জাতী নাম আল্লাহ্-এর সহিত সংমিশ্রিত; নবী করিম (দ.)-এর বেলায়তী নাম আহমদ। অতএব, মনে হয়, "আহমদ উল্লাহ্" আল্লাহ্-এর জাতী নাম ও নবী করিমের (দ.) বেলায়তী নামের সংমিশ্রণ। তাঁর জন্মস্থান ভূখণ্ড মধ্যরেখার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত থাকিবে। উহা চীন পাহাড়ের পাদদেশে বৌদ্ধ ও বিভিন্ন জাতির সমাবেশস্থল হইবে। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি হইবে নবীর আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফার (দ.) পূর্ণ সাদৃশ্যতর প্রতীক। তিনিও খাতেমুল অলদ হইবেন। নবীবর (দ.)-এর মত কোন পুত্র সন্তান জগতে রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ভাষা হইবে সংমিশ্রিত এক ভাবপ্রবণ ভাষা। তাঁহার রহস্যময় কথা-বার্তা, ভাবভঙ্গি, চাল-চলন সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা নিতান্তই দায় হইবে।" দেখা যায় যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পবিত্র নাম স্বাভাবিকভাবে আহমদ ও আল্লাহ্‌র নামে সংযুক্ত আহমদ উল্লাহ্ রাখা হয়। ধরাধাম ত্যাগকালে তিনি কোন পুত্র সন্তান জীবিত রাখিয়া যান নাই। তাঁহার মাতৃভাষা সর্বভাষার সংমিশ্রণে মিশ্রিত এক অভিনব চট্টগ্রামী ভাষা। তাঁহার ভাবভঙ্গি সাধারণ লোকের জ্ঞানেরই ঊর্ধ্বে ছিল। তাঁহার জন্মভূমি "চাটগাম", ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে চীন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধ ও নানা জাতির আদি আবাসভূমি। ঐতিহাসিক প্রমাণে

দেখা যায়; খ্রিস্টপূর্ব যুগে চীনা, তিরতী ও আহম জাতীয় লোকেরা এ দেশের অধিবাসী ছিলেন। কালক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমানরা এই দেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে।'[১]

হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১২৩৩ বঙ্গাব্দের বুধবার দ্বিপ্রহরান্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সন হিজরী হিসেবে ১২৪৪, গ্রেগ্ররিয়ান হিসাবে ১৮২৬ ইং, ১১৮৮ মঘী। তাঁর মায়ের নাম বিবি খায়রুন্নেসা, পিতার নাম হযরত সৈয়দ মতিউল্লাহ্। জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি উপজিলা/থানার মাইজভাণ্ডার গ্রাম।

মাইজভাণ্ডার গ্রামে তাঁদের পূর্ব পুরুষদের বসতি স্থাপনের সূত্র হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর (র.) সাথে সংযুক্ত। বড়পীর কেবলার পিতৃকুলে হাসানী ও মাতৃকুলে হোসাইনী রক্তধারার সংমিশ্রণ সাধিত হয় ইরাকের জিলান শহরে। তাঁদের বংশধরদের মধ্যে পবিত্র অধ্যাত্ম শোণিত সক্রিয় ছিল, যার ক্রিয়া ছিল সতত বারোয়ারী বা বহুত্ববাদী মানবকল্যাণমুখী। তাঁরা আরব সাংস্কৃতিক অঞ্চলের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। অধ্যাত্ম ভুবনে আলোর দিশা প্রদর্শনই তাঁদের উত্তরাধিকার এবং তাদের বংশীয় উপাধি 'সৈয়দ'। জটিল সংসার বাজারে হেদায়ত এবং কখনো বিচারকের নৈর্ব্যক্তিক পদে আসীন থাকার বদৌলতে তাঁরা বংশপরম্পরায় মানবতার খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁদের কেউ কেউ দিল্লী সালতানাতের আমন্ত্রণে দিল্লী শাহী মসজিদের ইমাম, কাজী পদে নিযুক্ত থাকেন এবং পরবর্তী সময়ে বাংলায় স্বাধীন মুসলিম শাসনকালে ইমামতী ও কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। বাংলার রাজধানী হিসেবে গৌড়ের নাম সেই সামন্ততান্ত্রিক শাসনকালেও সুশাসন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের বাঁচার ও অর্জিত সম্পত্তি নিরাপদে নিজেদের সত্ত্বাধিকারে রাখার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবার সুবাদে এখনো ইতিহাসে ভাস্বর। সেটা এমন এক সমৃদ্ধ আমল, যখন বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হেজাজ অর্থাৎ আরবের মক্কা শরিফে সালামী স্বরূপ তোহ্ফা প্রেরিত হতো। অনটনকালে নিবেদিত হতো বিবিধ সামগ্রী। সেই সামন্ততান্ত্রিক "সুলতানী আমলের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একদিকে প্রজাতোষণ, তাঁদের নিজ নিজ ধর্মাচার ও সংস্কৃতির অনুশীলনের স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে বিচার বিভাগ তথা 'কাজীর' পদকে 'শাসকের আসনের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা প্রদান।' সামন্ত সমাজের বিশ্বময় রেওয়াজ অনুযায়ী তখ্ত

বা শাসন ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্ব, খুন, যুদ্ধ প্রভৃতি সংঘটিত হলেও তখ্‌তনশীন সুলতান বা শাসকগণ কর্তৃক প্রজাতোষণ ও কাজীর সুবিচারকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখতে দেখা গেছে। এই ধারাবাহিকতায় হযরত বড়পীরের (ক.) অন্যতম অধস্তন পুরুষ সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী বাংলা মুল্লুকের রাজধানী গৌড়ের বিচারালয়ে কাজী পদে নিয়োজিত হন। ঐ জমানায় গৌড় অঞ্চলে মহামারী দেখা দেয়। এ অবস্থায় তিনি ১৫৭৫ খ্রি. চট্টগ্রামে হিযরত করেন এবং বর্তমান পটিয়া উপজেলার অন্তর্গত কাঞ্চননগরে বসতি স্থাপন করে হেদায়ত ও ইমামতী দায়িত্বে রত হয়ে নতুনভাবে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বর্তমানের 'হামিদ গাঁও' গ্রাম তাঁর পুণ্যস্মৃতি ধারণ করছে। তাঁর এক পুত্র সন্তান সৈয়দ আবদুল কাদের (র.) ফটিকছড়ি থানার আজিমনগর গ্রামে ইমামতী উপলক্ষ্যে আগমন করেন এবং তথায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র সৈয়দ আতাউল্লাহ্ আজিম নগরেই বসত ও ইমামতী দায়িত্ব পরিচালনা করতে থাকেন। সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ্-এর তিন পুত্র সন্তান জন্মে। তাঁদের মধ্যে মধ্যম সন্তানের নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ্। তিনি 'আজিমনগর' গ্রামে দক্ষিণ সীমা সংলগ্ন 'মাইজভাণ্ডার' গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। প্রশাসনিক কাগজপত্র ও সীটে এই দুই গ্রামের অস্তিত্ব ও অবস্থান পৃথক হলেও ভৌগলিক অবস্থানগতভাবে পরস্পর সংলগ্ন। আরো সহজ ভাষায় বলা যায়, সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ্‌র বসতবাটী আজিম নগর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় এবং সৈয়দ মতিউল্লাহ্‌র নতুন বসতি মাইজভাণ্ডার গ্রামের উত্তর প্রান্ত সীমায়।

হযরত মতিউল্লাহ্ দ্বীনদার মুত্তাকী আলেম হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন ছিলেন। তাঁর পত্নী সৈয়দা খায়েরউন্নেসা বিবির গর্ভে জন্ম নেন হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

২. শিক্ষা জীবন

চার বছর চারমাস বয়ঃক্রমকালে তাঁকে স্থানীয় মক্তবে ভর্তি করা হয় এবং আরবী ও বাংলা শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর পাঠ শুরু হয়। মক্তবে যাওয়া, শিক্ষকদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী যথারীতি পাঠ আদায়, সহপাঠীদের সাথে নিষ্কলুষ সম্প্রীতি; স্বল্পবাক এই শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ছিল, যা ওস্তাদদের নজর আকর্ষণ করে। সাত বছর বয়সে

তিনি নামায শিক্ষা করেন এবং তখন থেকেই নিষ্ঠাবান নামাযী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। প্রখর মেধাবী এই শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষার্থে ১২৬০ হিজরী সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসায় প্রেরণ করা হয়। পঞ্জেগানা নামায তিনি মসজিদে জামাতসহকারে আদায় করতেন। প্রায়শঃ নফল রোযা-নামাযে সময় অতিবাহিত করতেন। তাহাজ্জুদ ও সালাতে তসবিহ্, আল-কোরআন ও অযিফা পাঠ ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচির অপরিহার্য অংশ। পথে-ঘাটে তাঁকে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় লিপ্ত হতে দেখা যায়নি। তাঁর পবিত্র চালচলন, শিক্ষকদের প্রতি আদব-আনুগত্য, নম্রস্বভাব তাঁকে মাদ্‌রাসায় সকলের প্রিয়ভাজন ও ভক্তিভাজন করে তোলে। ১২৬৮ হিজরী সনে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্‌রাসার সমাপনী পরীক্ষা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। আল-কোরআন, তফসির, হাদিস, ফিকাহ্, উসুল, মন্তেক, হেকমত, বালাগত, আকায়েদ, ফিলসফা, ফরায়েয প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রে তিনি দক্ষতা অর্জন করে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। আরবী, উর্দু, বাংলা, ফার্সি ভাষায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা ছিল।

৩. পেশাগত কর্মজীবনে প্রবেশ

হিজরী ১২৬৮ সনে মাদ্‌রাসায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনান্তে হিজরী ১২৬৯ সনে তিনি যশোহর জেলায় বিচার বিভাগে কাজী পদে নিয়োজিত হন এবং এক বছর সবিশেষ দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে সকলের প্রশংসাভাজন হন। কিন্তু এ পদে তিনি নিজেকে বেশি দিন সংযুক্ত রাখতে পারলেন না। আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্য তাঁর কর্মস্পৃহা প্রসারিত হতে থাকে। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ভাষায়: "তিনি মুন্সেফী অধ্যয়ন করা স্থির করিলেন। স্বত্ত্ব-সাব্যস্তে মানবস্বত্ত্ব "হক্কোল এবাদ" রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার নিবেন। যেইখানে কোন নিষ্ঠুর আচরণ নাই, আছে শুধু স্বত্ত্ব ও সত্যের তথ্য আবিষ্কার, আছে শুধু হক্ব ও না-হক্বের স্বার্থপূর্ণ মহাসমস্যার সমাধান। তাঁহার আর্থিক উপার্জনও দরকার। তাহা না হইলে কিভাবে তিনি অধ্যয়ন সমাপন করিবেন! শুধু উপার্জন করিলেও চলিবে না। আল্লাহ্‌র খোশনদী অর্জনও নিতান্ত দরকার। ঠিক করিলেন, তিনি আল্লাহ্‌তা'লার দ্বীনে ইসলাম শিক্ষা দিবেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মানবের উপকার করিবেন। সেই সময় কলিকাতায় মুন্সী বো-আলী (র.) মাদ্‌রাসায় প্রধান

মোদার্রেসের পদ খালি ছিল। তিনি শিক্ষাকার্যে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কর্তৃপক্ষ অতি সাদরে তাঁহাকে আহ্বান জানাইলেন। অতঃপর ১২৭০ হিজরীতে যশোহর জেলার কাজী পদে তিনি স্ব-ইচ্ছায় ইস্তফা দিলেন এবং কলিকাতা আগমনে মোদার্রেসি কার্যভার গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে তাঁহার কর্তব্য কার্য আরো বাড়িয়া গেল। একে তো খোদা প্রদত্ত আমানতরূপী পবিত্র কোরআন ও হাদিস শিক্ষা দান এবং নিজ ইবাদত ও তদুপরি মুন্সেফী আইন গ্রন্থ অধ্যয়ন।[২]

এভাবে তাঁর এক বৎসর কেটে যায়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হযরত সাহেব কেবলা (ক.) কেবল তৎকালীন আলীয়া মাদ্‌রাসার সিলেবাস অনুযায়ী সকল বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন না, উপরন্তু সমকালে বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত ও প্রচলিত আইনবিদ্যা সম্পর্কেও প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন, যা তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে কার্যকরভাবে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে।

তিনি মুন্সেফী পরীক্ষা দেন। ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল তিনি এই পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে বলে গুজব রটায়, সরকারি কর্তৃপক্ষ সবার পরীক্ষা নাকচ ও অগ্রাহ্য করে এবং কাউকে সনদ দেওয়া হয়নি। কিন্তু এতে তাঁর দুনিয়াবী অগ্রযাত্রা মোটেও ব্যাহত তো হলোই না, উপরন্তু মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা এবং ওয়াজ মজলিশে প্রদত্ত নসিহতের (discourse) রুহানী আলোকধারায় স্নাত আওয়াম জনতার ময়দানে তাঁর নূরানী প্রভাবের বিস্তার ঘটতে থাকে। তিনি এক নতুন আলোকিত মানব হিসেবে বিকশিত হতে থাকেন। জাহেরী এলমে পাকাপোক্ত হযরত সাহেব কেবলার রুহানী জলোয়াও সমান্তরালভাবে দর্শনীয়রূপে জনসমক্ষে প্রতিভাত হতে থাকে।

৪. মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.)-এর (হিজরী ৬৩৬–৭২৫) জীবনধারার সাথে সাযুজ্য

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শিক্ষা সমাপনান্তে পেশা জীবন তালাশের সাথে মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.)-এর সাথে চমৎকার এক সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। মাহ্‌বুবে ইলাহী (র.) সকল স্তরের জাহেরী ইলম যথা, তাফসির, হাদিস, কালাম, ফিকাহ্, মাআনী, মান্তেক, হিকমত, দর্শন, গণিত, প্রকৌশল, শব্দকোষ, আরবী সাহিত্য ও সাত প্রকার

কিরআত পাঠে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি দিল্লীতে মওলানা কামাল উদ্দীন মুহাদ্দেস (র.) থেকে 'মাশারিকুল আন্ওয়ার' গ্রন্থের সনদ লাভ করেন। তিনি স্বীয় মুর্শিদ হযরত খাজা ফরিদ উদ্দীন মসউদ গঞ্জেশকর (র.) এবং আবু শাকুর সালেমীর (র.) সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহারিক তালিম নেন। একদিন তিনি কুত্বুল আকতাব হযরত খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকীর (র.) মাজারে এক মজ্জুব ফকিরের সাক্ষাৎ পান এবং কাজীর পদ লাভের জন্য তাঁর কাছে দোয়া চাইলে জবাব পান, "ওহে, নিজাম উদ্দিন! তুমি কী কাজী হতে ইচ্ছা করো! আমি দেখছি, তুমি ধর্ম বিশারদ এক বাদশাহ্। এমন স্তরে তুমি উন্নীত হবে, যেখান থেকে তাবৎ বিশ্ববাসী তোমার কাছ থেকে ফয়েজ লাভ করবে।" এর পর তিনি একদা হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের (র.) সমীপে উপনীত হয়ে একইভাবে কাজী পদের জন্য দোয়া প্রার্থী হলে তাঁকে বলা হয়, "তুমি কখনো কাজী হতে পারবে না। বরং, আমি তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস দেখছি, যা আমি ছাড়া কেউ জানে না।"[৩] মাহ্বুবে ইলাহী (র.) ছিলেন পাকবাজ বা চিরকুমার। তাঁর প্রথম জীবন কাটে অতীব দারিদ্র্যের মধ্যে। অথচ কালক্রমে এমন উন্নত অবস্থা হয় যে, প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের রান্না বান্নার জন্য শুধু সত্তর মন লবণই লাগতো।[৪] তিনি ছিলেন কারামত সম্পন্ন ওলী আল্লাহ্। বিশ্বখ্যাত কবি আমীর খসরু (র.) তাঁরই অনুরাগী ও শিষ্য। সেই সামন্ত শাসনামলেও উৎপীড়িত জনগণ মুক্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্য ওলী-আল্লাহ্দের দরবারে আশ্রয় খুঁজতেন। মাহ্বুবে ইলাহীও ছিলেন তেমন এক আশ্রয়স্থল। ঐ সময়কার দিল্লীর বাদশাহ্ সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একাধিক কারণে তাঁকে দিল্লীতে আসতে নিষেধ করেন। সুলতান তখন বাংলা অভিযান শেষে দিল্লীতে ফিরছিলেন। মাহ্বুবে ইলাহী এ ফরমান শুনে বলেছিলেন, "দিল্লী হনুয দূর আস্ত (দিল্লী এখনো অনেক দূর)। সুলতান গিয়াসউদ্দিন দিল্লী ফিরতে পারেননি। তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য তোরণ ভেঙে পড়ায় তিনি অকুস্থলেই প্রাণ হারান। মাহ্বুবে ইলাহীর সেই উক্তি এখনো ঐতিহাসিক প্রবাদ হিসেবে জীবিত আছে। তিনি থাকতেন গিয়াসপুরে, যা এখন তাঁর নামানুসারে 'নিজাম উদ্দিন' নামে ইতিহাস ও ভূগোলে শোভা পাচ্ছে। সমকালে তিনি ছিলেন সামাজিক অসাম্য, ভেদাভেদ, জুলুম পীড়নের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। জাতি–ধর্ম-নির্বিশেষে অনেক গবেষকের লিখিত পুস্তকাদি এর বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ ধারণ করে আছে।

৫. হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক উরুজ অর্জন[৫]

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিংশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উরুজ বা উন্নয়ন অর্জন করেন 'হযরত পীরানে পীর দস্তগীর গাউসুল আযম মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) বংশধর এবং ঐ ত্বরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত সুলতানুল হিন্দ সরদারে আউলিয়া গাউসে কাওনাইন শেখ সৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ সালেহ আল-কাদেরী লাহোরীর (র.) কাছ থেকে। একদা তিনি পাল্কীযোগে এক ওয়ায়েজ মাহফিলে যাবার সময়ে এই 'সাহেবে কশ্‌ফ ওলীর' অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েন। তাঁরা তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠজন হাজীউল হারামাইন হযরত শাহ সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (র.)। তিনি খোদার ভাবে চিরকুমার এবং অতি জজবর্পূণ কুতুবে জামান ছিলেন। সপ্তাহে মাত্র শুক্রবারেই তিনি হুজরার বাইরে আসতেন। কাউকে হাত ধরে মুরীদ-তলকীন করাতেন না। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত শাহ্ সুফি মোহাম্মদ মুনির ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ পীরে কামেল। তাঁদের হেদায়েত কাজের বিস্তার ছিল লাহোর থেকে কলিকাতা পর্যন্ত, তথা সমগ্র ভারতবর্ষে। রুহানী হেদায়েত আঞ্জাম দেবার উপলক্ষ্যে তাঁরা কলিকাতা নগরীতে বসবাস করতেন।

কলিকাতায় এই তিন মহান সাধক ভ্রাতার শিষ্য-ভক্ত অনেক। হযরত আবু শাহমা (র.) তাঁর অর্জিত মারেফাতি 'লাল' অর্পণের জন্য উপযুক্ত পাত্রের তালাশে ছিলেন। 'লাল' হচ্ছে মারেফাত ভুবনের একটা সাঙ্কেতিক পরিভাষা, যার দ্বারা প্রভূত সাধনাবলে অর্জিত আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে নির্দেশ করা ও বুঝানো হয়। হযরত সাহেব কেবলাকে বহনকারী পাল্কী হযরত আবু শাহ্মার (র.) হুজরাখানার সামনের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় শেষোক্তজনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পতিত হয় প্রথমোক্ত জনের মুখাবয়বের উপর। উপস্থিত শিষ্যদের কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে হযরত শাহ্ এনায়েত উল্লাহ্ (র.) তাঁর পরিচয় বর্ণনা করেন। হযরত সাহেব কেবলাকে সম্মানে হুজুরায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য শাহ্ এনায়েত উল্লাহ্কে প্রেরণ করা হলো। হযরত সাহেব কেবলা পাল্কী ফিরিয়ে দিলেন। উপস্থিত শিষ্যবর্গ তাঁকে অতি আদবসহকারে হুজুরাখানায় নিয়ে গেলে হযরত আবু শাহ্মা স্বীয় গদী শরিফ হতে দণ্ডায়মান হয়ে সাদরে সুন্নতী করমর্দন ও বক্ষ মিলামিলি করে নিজ গদীতে পরম বন্ধুর মতো পার্শ্বে বসালেন।[৬] অতঃপর বাবুর্চিখানা থেকে তৈরি খাসখানা আনতে নির্দেশ দেওয়া হলো। হযরত এনায়েত

উল্লাহ্ সব খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এলেন। হযরত সাহেব কেবলা নিজ বাসভবন থেকে যথারীতি পানাহার করে বের হলেও ফয়েজ বরকতপূর্ণ এই তাবার্রোকী খাদ্য গ্রহণে বিরত হলেন না। 'বিসমিল্লাহ্' বলে তিনি আহার্য গ্রহণ করলেন। পাত্রপূর্ণ খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যায়। তার তৃপ্তি হয় না। তিনি আরো আহার্য কামনা করলে হযরত আবু শাহমা মৃদু হেসে বলেন, "হে, প্রিয়তম! আমার বাবুর্চিখানায় আপনার জন্য যা সুরক্ষিত ছিল, তা আনীত হয়েছে। আরো অধিক প্রয়োজনে আপনি স্বহস্তে পাকিয়ে খাবেন"।[৭]

"হযরত সাহেব কেবলা অতঃপর নিজ বাসভবনে ফিরে আসেন। তবে এক ধরণের ব্যাকুলতায় তিনি অস্থিরতা বোধ করতে থাকেন। হযরত আবু শাহ্মাও একইভাবে ব্যগ্রতাসহকারে তাঁর সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকতেন। তাঁরা পরস্পরের বাসগৃহে যাতায়াত করতেন।

এ অবস্থায় তিনি হযরত সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ (র.) এর খেদমতে গিয়ে ফয়েজ গ্রহণে আদিষ্ট হন। হযরত সাহেব কেবলা হুজুরা শরিফের সামনে উপস্থিত হতেই পাকবাজ (র.) বাইরে পদার্পণ করেন এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 'ফয়েজে এত্তেহাদীর' প্রভাব বিস্তারপূর্বক তাঁর অর্জিত সমুদয় খোদাদাদ শক্তি ও বাতেনী নেয়ামত 'কুত্বিয়ত' পরশমণি দান করে দিলেন। এভাবে হযরত সাহেব কেবলা দু'জন মহান পবিত্র মণিধর আউলিয়ার দুর্লভমণি লাভে ধন্য হন।[৮]

৬. কঠোরতর রিয়াজত

এরপর শুরু হলো তাঁর কঠোরতর রিয়াজত। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভাষায়: "এখন হইতে হযরতের জজ্বাতী অবস্থা অত্যধিক গালেব হইয়া পড়িল। ত্রিমুখী প্রবাহী চতুর্বিধধারাবাহী বাগদাদী সাগরের সংমিশ্রণে মহাপ্রশান্ত সাগর সৃজিত হইল। "অলাল আখেরাতো খায়রুল লাকা মিনাল উলা"–প্রথম হইতে সর্বশেষ পরিনাম ফল অতি উত্তম। এই পবিত্র খোদাবাণীর সারবস্তু হইয়া উহাদের জজ্বাতী হিল্লোলমালায় সমস্ত সাগর-মহাসাগর হিল্লোলিত হইতে লাগিল। তবু তিনি শান্ত নন, ক্ষান্ত নন।০০০ তিনি দিবাভাগে দ্বীনি শিক্ষাদানে এবং সারাটি রাত্র জাগিয়া নিঝুম ধ্যানে অক্লান্ত এবাদত ও অকাতর রিয়াজত সাধনায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি যেন তাঁহার পীর সাহেবের "স্বহস্তে পাকিয়ে খাইবেন"–পবিত্র নির্দেশ বাণীকে সযত্নে কার্যকরী করিতে

লাগিলেন।০০০ মোরাকাবা মোশাহেদায় তাঁহার অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত।০০ প্রেরণাধিক্যে বিভোর হইয়া পানাহার ত্যাগ পাইতে লাগিলেন।.. অনিদ্রা অনাহারে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।.. বায়াত গ্রহণের প্রায় সুদীর্ঘ তিন বছরকাল পর ১২৭৩ হিজরীতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া একেবারে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি নিতান্ত দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা তো তাঁহার সাধারণ রোগ নহে। ইহা তাঁহার অজানাকে জানিবার জন্য অন্তর্বিপ্লব।'০০০ 'এ সময় তাঁর দু'জন বন্ধু সুলতানপুরী মৌলভী জান আলী সাহেব ও আসকরাবাদী জনাব মৌলভী আবদুল বদি সাহেব প্রাণপণে তাঁর সেবাযত্ন করেন। অসুস্থাবস্থায় তাঁকে দেখতে লোকসমাগম হতে থাকে। কারো সাথে কোন কথা নাই, শব্দ নাই। তাঁরই ভাবে তিনি নিস্তব্ধ এবং অভিভূত অবস্থায় পড়ে থাকেন। স্বদেশী বন্ধুরা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় পিতা মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ্ সাহেব ১২৭৫ হিজরীর ২১ আষাঢ় রোজ সোমবার দ্বিপ্রহরান্তে বাদ জোহর ইন্তিকাল ফরমান। বাড়িময় শোকাবহ পরিবেশ। এর মধ্যে আসে হযরত সাহেবের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদবাহীপত্র। তাঁর মা সকলের পরামর্শক্রমে মেজ ভাই শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল হামিদ সাহেবকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন এবং পীরের নির্দেশক্রমে উক্ত বন্ধুদ্বয়ের সহায়তায় অতি যত্নে বাড়িতে আনা হয়। বাড়ি ফিরে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে সংসারের প্রতি উদাসীনতা এবং মারেফাত জ্ঞানের জন্য আকর্ষণ তীব্র বিপরীতমুখীভাবে বাড়তে থাকে।[৯]

৭. বিবাহ, সংসার জীবন ও সন্তান-সন্ততি

পুত্রের এই বৈরাগ্য ও জজ্‌বিয়াত দেখে তাঁর মা বিবি খায়েরউন্নেসা বিবাহের আয়োজন করেন। ১২৭৬ হিজরীর বৈশাখ মাসে ৩২ (বত্রিশ) বছর বয়সঃক্রমকালে পার্শ্ববর্তী আজিম নগর নিবাসী মুন্সি সৈয়দ আফাজ উদ্দিন আহমদের কন্যা মোসাম্মাৎ সৈয়দা আলফুন্নেসা বিবির সাথে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করা হয়। তবে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এই পত্নী জান্নাতবাসী হন। ঐ বছরই তাঁর মা একই গ্রামের সৈয়দ আফাজ উল্লাহ্‌র কন্যা সৈয়দা লুৎফুন্নেসা বিবির সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

হযরত সাহেব কেবলাকে আপনজন বিয়োগের বেদনার ভারও বহন করতে হয়েছিল, যা যে কোন আদম-সন্তানের জন্য এক মহা বেদনাদায়ক গুরুভার পরীক্ষা! প্রথমা পত্নীর ইন্তেকালের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিয়ের দুই বছর পর ১২৭৮ হিজরী সনে তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্ম নেন। তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দা বদিউন্নেসা বিবি; তিনি মাত্র চার বছর বয়সে জান্নাতবাসী হন। এরপর তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মায়, যিনি অল্প দিনেই ইহ সংসার ত্যাগ করেন। এরপর ১৮৬৫ইং মোতাবেক ১২৮২ হিজরী সনে ১৩ই চৈত্র তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দ ফয়েজুল হক। এর আট বছর পর ১২৮৯ হিজরী সনে তাঁর এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দা আনোয়ারুন্নেসা, যাকে হযরত সাহেব কেবলা স্নেহভরে ডাকতেন "তোতা ময়না"।

পুত্র সৈয়দ ফয়েজুল হক হযরত সাহেব কেবলার জীবদ্দশায়ই ১৯০২ ইং সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রথম পুত্র সৈয়দ মীর হাসান (১৮৯১–১৯০৬) মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, হযরত সাহেব কেবলা কোন এক ক্ষণে পৌত্র সৈয়দ মীর হাসানকে 'নাবালেগ' বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর অকাল মৃত্যুর আভাস প্রদান করেন।[১০]

কন্যা আনোয়ারুন্নেসা (তোতা ময়না) ১৯২৩ ঈসায়ী সনের ২৪ নভেম্বর মোতাবেক ১৩৪৪ বাংলার ৪ অগ্রহায়ন জান্নাতবাসী হন। তোতা ময়না অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি 'পর্দার আড়ালে পিতার ইমামতিতে রাতে সালাত, তসবিহ্, তাহলিল পাঠে নিরত থাকতেন'। পিতার কাছে তিনি কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্, উসুলসমেত বিভিন্ন বিষয়ে তালিম নেন। হযরত সাহেব কেবলা ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর জাহেরী ও বেলায়তী বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী ছিলেন তাঁর আত্মজা সৈয়দা আনোয়ারুন্নেসা। তাঁর বিয়ে হয় ফটিকছড়ি থানার সৈয়দ বাড়ির সৈয়দ চাঁদ ফকিরের প্রপৌত্র মৌলানা সৈয়দ আলী আশরাফ-এর সঙ্গে। বিয়ের সময় তাঁর শর্ত ছিল, তিনি শ্বশুরালয়ে যাবেন না। আমৃত্যু পিতার সঙ্গে থাকবেন। বস্তুতঃপক্ষে কন্যা 'তোতা ময়না' ও 'দেলা ময়না' অর্থাৎ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে নিয়েই ছিল তাঁর জাহেরী সংসার এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐশী সংসার। তোতা ময়না পরবর্তীকালে পিতার সংসার

আগলে রেখেছিলেন দীর্ঘ পনেরো বছর। নবতর পুষ্পে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে হযরত সাহেব কেবলার বিরান ভিটা– যে ভিটার পরশ পেতে দশকের পর দশক ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে আছড়ে পড়ে 'আশেক অলীকুল'। তোতা ময়না তাঁর কাছে আগত অনেক লোকের পারিবারিক, সাংসারিক সমস্যার সমাধান যেমন করে দিতেন, তেমনি ফিকাহ্-উসুলের আলোকে দিতেন নবীজীর (দ.) শরিয়তসম্মত সমাধান। তাঁর কাব্য প্রতিভাও ছিল, যা মহান ওলী-আল্লাহ্দের মনোভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। তোতা ময়নার রচিত আটটা মারেফতি গীতি পাওয়া গেছে। বিজ্ঞ পাঠকদের সমীপে এর একটা নিবেদিত হলো:

"জন্মেতে শুনিছি আজান, বাবার তালিম পাইয়াছি,
আল্লাহ্র মন্ত্র বাবার ভিক্ষা পাইয়াছি।
তালিম বিনা চলেনা রে, একটা প্রাণের শ্বাস,
নূরানী এলেমে আছে গভীর বিশ্বাস;
বাবার কোল পাইয়াছি, কোল পাইয়াছি, রুহ্ পাইয়াছি,
তারি সাথে বারীতায়ালার দয়া পাইয়াছি।"[১১]

৮. দুনিয়াবী বঞ্চনা

মাতৃবিয়োগের পর তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার তীব্রতা দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। সংসারের প্রতি অনীহাও প্রকট হতে থাকে। একদা মৌরুসী এজমালী জমির ফসলে নিজের ন্যায্য অংশ আনার জন্য বিবি সাহেবানীর নিকট একটা টুকরী চান, যিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও টুকরী দিলেন। তবে টুকরীটা শূন্যই রইল। উপস্থিত কেউ কেউ তাঁকে উপহাস করতেও ছাড়লোনা। বিবি সাহেবানী এতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত ও অপ্রস্তুত বোধ করলেন। হযরত সাহেব কেবলা ধীর স্থির কণ্ঠে শুধু বললেন, "আমি তো আমার ন্যায্য প্রাপ্য আনিতে গিয়াছিলাম। তাহারা যে কেন দিল না, আমিতো জানিনা, আল্লাহু চায় তো অনেক ধান্য আসিবে।"[১২]

৯. বেলায়তের প্রথম বিকাশ ও ফতুহাত আরম্ভ

"এই ঘটনার দুইদিন পর মাইজভাণ্ডার গ্রাম নিবাসী আনর আলী সিকদার, গামরীতলা নিবাসী মুন্সী মিঞাজান এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট লোক প্রায় পঞ্চাশ আড়ী অতি উৎকৃষ্ট সরু ধান ও নানা প্রকার উপঢৌকন হাদিয়া লইয়া হযরতের দরবারে আসেন। এই দিন হইতে বহু হাদিয়া সামগ্রী নিত্য হযরতের

খেদমতে আসিতে লাগিল। প্রতিদিন হাজতী, মকছুদী, ফরিয়াদী লোকজন হযরত সমীপে ভীড় জমাইতে লাগিল। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল, কলা, দুগ্ধ, চাউল, মোরগ, মৎস্য, কোরমা-পোলাও ইত্যাদি আসিয়া তাঁহার ঘর পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। দানবীর হযরত আকদাস এসব হাদীয়া দ্রব্যাদির যৎসামান্য রাখিয়া বাকী সমস্তই বাড়ি ও প্রতিবেশির প্রতি বিলাইয়া দিতে লাগিলেন। এমন কি কোন কোন সময় সমস্ত কিছু গরীব-দুঃখীদের জন্য দান করিয়া দিতেন এবং সময়ে সময়ে বন্ধু ও আত্মীয়-দুঃস্থদের জন্য লোক মারফত পাঠাইয়া দিতেন। তাঁর দরবারে বহু গরীব-দুঃখী ও উপঢৌকন লোভীদের ভীড় জমিয়া যাইত। হযরতের নিকট যে যাহা চাইত, অকাতরে দান করিয়া দিতেন। হযরত সোলায়মান (আ.) যেমন অনাথ দীন-দরিদ্রদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য মহাসাম্রাজ্যাপতি আল্লাহ্তা'লার নিকট সাম্রাজ্যের প্রার্থী হইয়াছিলেন, তেমনি হযরত আকদাসও দীন-দরিদ্র-অনাথের জন্য দো-জাহানীয় দুঃখ বারণে দো-জাহানের সাম্রাজ্য প্রত্যাশি হইয়াছিলেন। তাহাদের সৌভাগ্যেই পরম দয়াময় হযরতকে অসীম সাম্রাজ্যের অধিপতি করিয়াা অদ্বিতীয় ক্ষমতায় বিশ্বজীবের দুঃখহারি মহাত্রাণকর্তা হিসাবে শেষকালে এই বিশ্বে পাঠাইয়াছেন। বিশ্বকৌশলী পরম করুণাময় আল্লাহ্তা'লা তাঁহার প্রেমের দ্বিতীয় লহরীতে এমনি করিয়া তাঁহার প্রিয়তম মাহবুব, ভাণ্ডারের মালিক আউলিয়াদের শাহানশাহ্ ছুফী মোত্তাকী সাধক ও মোজাহেদ বাহিনীর অগ্রনায়ক হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে আর গোপন থাকিতে না দিয়া প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করাইতে লাগিলেন।"[১৩] ইতোমধ্যে 'ফকির মৌলভী' নামে তিনি মশহুর হয়ে পড়েন।

১০. তাওয়াক্কুলের সুদৃঢ় রজ্জুই তাঁর উপার্জনের একমাত্র প্রচেষ্টা

হযরত আকদাস ১২৭৬ হিজরী থেকে ১২৭৮ হিজরী সন পর্যন্ত কেবল মাত্র দু'বছর মাঝে মাঝে হেদায়েত কার্য ও ওয়ায়েজ নসিহত করতেন, তাও যথারীতি নয়। কখনোবা দাওয়াত গ্রহণে রাজী হতেন না। কিছুদিন পর ওয়ায়েজ-নসিহতও ছেড়ে দেন। এভাবে কেটে যায় সুদীর্ঘ নয়টা বছর। অনাহারে-অনিদ্রায় যাবতীয় সুখ শান্তি ও স্বার্থ পায়ে ঠেলে অবিরাম, অবিশ্রান্ত কঠোর নিঝুম সাধনায় রত হলেন। এভাবে ধাপে ধাপে একটানা ধ্যান-সাধনা-এবাদত-বন্দেগীতে

আত্মনিয়োগ করে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তি, "সর্বোত্তম বেলায়ত পদবী- বেলায়তে ওজমার" অধিপতি সাব্যস্ত হলেন।

কিন্তু জাগতিকভাবে সংসার নির্বাহ করার জন্য অর্থোপার্জনের কোন প্রয়াস তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হলো না। রিযিকের মালিক রাজ্জাক। সৃজন, বিবর্তন ও প্রতিপালনের দায়িত্ব তো মহান রাব্বুল আলামিন নিজেই নিয়ে রেখেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রতিপালন করবেন। তাঁর তাওয়াক্কালের এই সুদৃঢ় রজ্জুই তাঁর উপার্জনের একমাত্র প্রচেষ্টা ও অবলম্বন। এতে তাঁর ভ্রাতাগণ বিরক্ত হয়ে উঠেন। তাঁরা ভাবলেন, তাঁদের উপার্জিত অর্থ না পেলে হয়তো তিনি উপার্জনে সচেষ্ট হবেন। তাই তাঁরা পৃথক সংসার ও পৃথকান্নের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করলেন। তাঁরা তাঁর ছোট ভাই বিধায় তাঁদের ব্যবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট থাকলেন। তিনি এটাকে 'আল্লাহ্‌র মর্জি' ধরে নিয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, 'আল্লাহ্ যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন'। হযরতের ওয়ারিশী জমিতে কে চাষাবাদ করবে, এ প্রশ্নে তিনি স্থির করেন যে, ভাইয়েরা তাঁর জমিতে চাষাবাদ করবেন এবং তাঁদের পারিশ্রমিকরূপে বর্গা ভাগ অর্ধাংশ নিজেরা রেখে অবশিষ্ট অর্ধাংশ তাঁকে দেবেন। এ সিদ্ধান্ত হয় ১২৮২ হিজরী সনে। মোট চাষাবাদী উপার্জনের এক ষষ্টাংশ তাঁকে দেওয়া হবে মর্মে স্থিরীকৃত হয়ে এজমালী চাষ চলতে লাগলো।

আম্মাজান তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত কেবলার সঙ্গেই থাকেন। পৃথক পরিবার সত্ত্বেও দৃশ্যমান আয়-উপার্জনের জন্য তাঁর কোন প্রকার উদ্বেগ নেই। সংসারে অভাব বাড়তে থাকে। উপরন্তু তাঁর পর্ণকুটিরের ছনের ছাউনি বদলানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাঁর মা বাঁশ-ছনের ব্যবস্থা করলেন। ছাউনি দেবার জন্য ঘরামী বা ছৈয়াল নিযুক্ত করা হলো চার জন। দুপুরের খাবার ওয়াক্তের পূর্বে আম্মাজান বলেন; 'বাবা! কর্মী মেহমানদের খাবার দিতে হবে। যোগাড় তো কিছুই নেই'। মায়ের পুনঃ পুনঃ তাগিদের জবাবে তিনি মৃদু হেসে বলেন, 'আচ্ছা, আম্মা'। আবার ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন। ঘরামীরা গোসল করে খেতে আসলো। এবার হযরত আম্মাজানকে মেহমানদের জন্য দস্তরখানা বিছানোর আবেদন জানালেন। মা মৃদুস্বরে ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ করলে তিনি আবার দস্তরখানা বিছানোর আর্জি জানিয়ে বললেন, 'আমিও আসছি। এক সাথে খানা খাবো'। অগত্যা দস্তরখান বিছানো হলো, মেহমানরা ঘরে আসলেন। আহার্যের অপেক্ষায় আছেন। হযরত কেবলা তখনো ঘরের বাইরে। বাড়ির লোকেরা উৎকর্ণ ও উৎসুক হয়ে রইলো কী

ঘটে তা উপভোগ করার জন্য! এমন সময় দু'জন লোককে নিজেদের কাঁধে দুই ভার আহার্য সামগ্রী নিয়ে তাঁর বাড়ির দিকে আসতে দেখা গেল। ভারবাহী মুটে দু'জনের আগে আগে হাঁটছেন এক ব্যক্তি। তাঁরা পুকুর ঘাটে বসে 'ফকির মৌলভী' সাহেবের ঘর কোনটা জানতে চাইলে হযরত স্বয়ং হুজরার বাইরে আসলেন। আগন্তুকরা সালাম ও কদমবুচি পেশ করে আরজ করলেন, 'হুজুর! স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই সামান্য হাদিয়া আপনার জন্য এনেছি'। হযরত তা কবুল করলেন এবং তাঁদেরকে ঘরে আসতে বললেন। তাঁরা ঘরে এলেন। খানাগুলো একেবারে তরতাজা ও গরম, যেন এই মাত্র পাকানো হয়েছে। হযরতসহ সাতজন এই আহার্য গ্রহণ করলেন। সামান্য কিছু ঘরে রেখে বাদ বাকিগুলো বাড়ির অন্যান্যদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ্‌তা'য়ালা স্বীয় অপার রহমতে 'মান্না–সালওয়া সদৃশ উপঢৌকন" সহযোগে অতিথি সেবা করিয়ে তাঁর বেলায়তের প্রথম প্রকাশ, বিকাশ ও ফতুহাতের সূচনা করলেন।[১৪]

এর কিছুদিন পর তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতৃপ্রেম ও আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি গভীরতর রিয়াজতে নিমগ্ন হলেন। তাঁর মুরব্বী স্থানীয় কেউ আর রইলেন না। 'জন্মগুরু, ধর্মগুরু, শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু সকলেই প্রস্থান করে আল্লাহ্ তা'য়ালার জগতে সম্মিলিত হলেন। তাঁরা সবাই যেনো সম্মিলিতভাবে মহাপ্রভু রাব্বুল আলামিনের প্রতি তাঁকে সজোরে আকর্ষণ করতে থাকলেন!![১৫]

১১. নূরানী ব্যক্তিত্ব ও কারামত সম্পন্ন আউলিয়া সত্তার বিস্তার, পার্থিব কল্যাণময়তার ঢল

এর পরের ইতিহাসের অধ্যায়গুলো হলো হযরত আকদাসের রুহানী, বেলায়তি ও মানবিক কল্যাণসূচক কারামতের অজস্র কুঞ্জিকা। 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থের ভাষায়, "দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার অলৌকিক[১৬] ক্ষমতা এবং খোদাদাদ অপূর্ব গুণ-জ্ঞানের মহিমা সূর্যরশ্মির মত জগতে ছড়াইয়া পড়িল। মানব-দানব, জ্বীন-পরী-হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁহার পবিত্র দরবারে হাজির হইতে লাগিল। জীবজন্তু পর্যন্ত যেন তাঁহার আনুগত্য ও দাসত্ব বরণ করিয়া লইল। সবাই যেন নিজ নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ মানসে তাঁহার দরবার পানে ছুটিয়া চলিল। সবারই মুখে একই প্রচার, একই যশোকীর্তন দিগ-বিদিক ঘোষিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার "কশ্‌ফ কেরামত", বাক্যসিদ্ধি, অলৌকিক ক্ষমতার যশোগান দেশ-দেশান্তরে তড়িৎবত ছড়াইয়া

পড়িল। ফলে জনসমাগম এত বাড়িয়া গেল যে, তাহা সামলান কষ্টকর হইয়া পড়িল। হযরতের বাড়ি-ঘরে হাট-বাজারের মত জনসমাবেশ হইতে লাগিল। এমন কি হযরত আকদাস যথায় গমন করিতেন, তথায় বিপুল জনতায় পরিবেষ্টিত হইয়া যাইতেন। হযরত কোন দিকে চলিলে পিছনে জনস্রোত বহিতে থাকিত। অগণিত গরীব-মিসকিন ও অর্থলোভীরা তাঁহার বাড়ির আশে-পাশে রাস্তা–ঘাটে সর্বদা প্রতীক্ষায় থাকিত। হযরত যাহাকে সামনে পাইতেন, যে যাহা চাহিত মুক্ত হস্তে অকাতরে বিলাইয়া দিতেন।

“এখন হযরতের পরিবারে আর অভাব-অনটন নাই। আছে মাত্র অতিথি সৎকার ও “সায়েল” প্রার্থীদের প্রতি আশাতীত দান। এমন কি অভাব ও দরিদ্রতা যেন হযরতের প্রতিবেশি দীন-দুঃখীদের নিকট হইতেও চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। এই নবনিত্য বিপুল জনসমাগমে হযরত তাঁহার আচার-আলাপনে, ভাব-ভঙ্গিতে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিচয়ে, তাঁহার বেলায়েতে আস্থা স্থাপনে ঐশ্বরিক অনুগ্রহকণা ও ফয়েজ বরকত অর্জন করিয়া স্ব-স্ব আশা পূরণে আত্মা আলোকিত করিতে লাগিল। যেই বা তাঁহার খেদমতে একবার উপস্থিত হইত, কামনা তো পূরণ হইতোই, তদুপরি পাত্র অনুযায়ী তাঁহার আধ্যাত্মিক সুনজরের শিকার না হইয়া পারিত না। প্রত্যেকের অন্তরের সহিত তাঁহার পবিত্র নুরানী অন্তর যেন মিশাইয়া দিতেন। প্রত্যেকের আত্মার উপর তাঁহার পবিত্র আত্মার করুণাস্রোত যেন প্রবাহিত করিয়া দিতেন। তাই এই অভিনব জনসমাবেশে প্রত্যেকের অন্তরে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, ঘুমে বা চেতনে কোন না কোন অলৌকিক ক্রিয়া হইয়া থাকিত। কাজেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই তাঁহার ভক্ত-অনুরক্ত ও আসক্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ, অনুগামী ও অনুসারী হইতে লাগিল। এইভাবে তিনি জগতবাসীর বাহ্যিক উপকার ও অভ্যন্তরীণ খোদাপ্রেম সুধা বরিষণে তাহাদের অন্তরে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিলেন।

“এই দিকে তাঁহার আধ্যাত্মিক হেদায়েত অভিযান দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে। অপর দিকে নির্জীব ধর্মপ্রাণহীন বেশ ও পেশাধারী তথাকথিত আলেমগণ এবং কিছু সংখ্যক আধ্যাত্মিক প্রাণহারা ক্ষুদ্র জ্ঞানী মৌলভীর দল তাঁহার প্রেমরহস্য ও ভাবধারা বুঝিতে না পারিয়া কেহবা জাতি-হিংসায় নানা প্রকার অপপ্রচারে তাঁহার হেদায়েত অভিযানে বাধার অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিল।

নবী করিমকে (দ.) যেমন অবিশ্বাসীগণ “কাহেন” বা যাদুকর, পাগল ইত্যাদি অপবাদে অভিহিত করিয়াছিল, তেমনিভাবে হযরত আকদাসকেও বেলায়তে অবিশ্বাসী স্বল্পগুণী লোকেরা কেহ অপবাদ দিল “আমেলে সিফলি” (জ্বীনের সাহায্যে যাদু টোনা) আর কেহ অপবাদ দিল “তসখিরে খালকের” অর্থাৎ আমলকারী বা সাধক বলিয়া। যদিও তাহারা নানাভাবে নানা অপচেষ্টায় জনগতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তবুও তাহারা হযরতের আধ্যাত্মিক ক্ষমতারূপ মুক্ত তরবারির সামনে নেহায়েত তৃণবৎ প্রতিবন্ধক ছিল।

“হযরত গাউসে আযম পীরানে পীর-দস্তগীর মহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (র.) সমীপে যেমন ধর্মমতবাদী আলেমগণ দলে দলে তর্কযুদ্ধে আসিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও খোদাদাদ শক্তির কাছে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব ও দাসত্ব বরণে চির অনুসারী হইয়াছিল, তদ্রূপ হযরত আকদাসের সকাশেও অবিশ্বাসী আলেমগণ দলে দলে আসিয়া বিভিন্ন সূত্রে নানা কৌশলে হযরতের ঐশ্বরিক বেলায়তী প্রেরণা শক্তির সামনে মাথা নত ও শিষ্যত্ব গ্রহণে চির আসক্ত ‘দাস’ শ্রেণীতে গণ্য হইতে লাগিল। বহু দূর দেশ হইতে তৃষ্ণার্ত সাধককুল এবং আমীর-ওমরাহগণ অসীম বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে তাঁহার বেলায়েতী সুধা পান করার মানসে দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল[১৭]।”

কল্যাণময় বৃষ্টি ধারার মতো তাঁর কৃপা-কারামত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তরীতে সওয়ার হয়ে জীবন-নদীর তীরের বাসিন্দাদের দুয়ারে দুয়ারে সফর ও অনুগ্রহ বিতরণ করতে লাগলো। তাঁর অবস্থানস্থল শান্তি ও নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য দুর্গ-মন্‌জিলের রূপ পরিগ্রহ করলো। তাঁর এই খোদাদাদ দয়া বিতরণী সরকারের এই প্রকৃতি হাসরতক্ জারী থাকবে।[১৮]

এ প্রসঙ্গে ‘জীবনী ও কেরামত’ গ্রন্থে ‘শ্রেষ্ঠ কেরামত’ শিরোনামে বিবৃত তথ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

“হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী জনাব শাহ্ সুফি মৌলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কাদেরী (ক.) পার্থিব জগতে থাকাকালীন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও উরুজে-রুহানীর প্রভাবে অসংখ্য অলৌকিক কেরামতাদির দ্বারা ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন।

তাঁহার নশ্বর দেহ-ত্যাগের পরও দেখা যায় তাঁহার অবিনশ্বর মহাশক্তিশালী রুহানী শক্তির প্রভাবে পূর্ববৎ অন্তর্যামী ফকীর রূপে ভক্ত অনুসন্ধিৎসু জনমনের না হওয়ার এবং না পাওয়ার মত দুর্লভ কাম্য বস্তুকে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা মূলে সুলভে পাওয়ার এবং হওয়ার রূপদানে যত্নবান আছেন। পবিত্র হাদিছের বাণী মতে–

تموتون كما تعيشون وتبعثون كما تموتون

অর্থঃ– তোমরা যেইরূপ জীবন যাপন করিবে, তদ্রূপ তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং যেইরূপ মৃত্যু হইবে সেইরূপ তোমাদের হাশরও হইবে।

তিনি ওফাতের পরও সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন এবং জনমনের হাজত মখছুদ পুরা করিতেছেন।" [সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত, পৃঃ ২৬১, আলোকধারা বুক্‌স, চট্টগ্রাম, ২০২১ ইং]

১২. শরিয়রতের পায়রবী

প্রত্যেক মহান ওলী-আল্লাহ্‌ কঠোরভাবে শরিয়তের বিধান, আচার-অনুষ্ঠান পালন করে গেছেন। হযরত শায়খ সৈয়দ আবুল হাসান আলী হাজবিরী দাতাগঞ্জে বখ্‌শ (হিজরী ৪০০–৪৬৫) "নবীজীর (দ.) শরিয়ত পালনকে সকল সাধনার মধ্যে কষ্টকর সাধনা' হিসেবে নির্দেশ করেছেন। পাশ্চাত্য-প্রাচ্যে এখন থেকে সহস্রাধিক বর্ষপূর্ব থেকে সমভাবে আলোচিত, নানাভাবে মূল্যায়িত তাসাওউফ দর্শনের স্থপতি শায়খুল আকবর হযরত মহীউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.) [১১৬৫–১২৪০ খ্রি.] দর্শন শাস্ত্রের সকল গাঙে সন্তরণ করেছেন। তৌহিদ (monotheism), দ্বিত্ববাদ (deism), সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism), ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ বা সর্বধর আল্লাহ্‌বাদ (Panentheism) প্রভৃতি দর্শনের সাত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত শরিয়তের ঘাটে নোঙ্গর করে মানব সম্প্রদায়কে শরিয়ত অনুসরণের দর্শনগত ও আচারগত তাগিদ দিয়ে বলেছেন, "মানুষ মূল্যবোধ ও আইন বা নিয়মের জগতে বাস করে[১৯]।"

মুহাম্মদী শরিয়তের আচারগত ও সমাজতাত্ত্বিকসহ সকল প্রকার বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি অনুগত মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকত ও বেলায়ত সর্বাগ্রে শরিয়তের মানবিক মূল্যবোধ ও নিয়মের পায়রবী করার তাগিদ দেয়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়তি জীবন তো বটেই, বরং সমগ্র জীবনকালই এর ফলিত

দৃষ্টান্ত। নিবিড়ভাবে তাঁর জীবনী গ্রন্থের অধ্যয়ন এই সাক্ষ্যই দেয়। শরিয়ত পালনে হযরত আকদাস-এর নিষ্ঠা এবং বাতেনী আচরণের বিবরণ দিয়ে "হযরত সাহেবের একমাত্র পৌত্র (নাতী) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন–

"হযরত আকদাস নিত্য নামাযে পাঞ্জেগানা আদায় করিতেন এবং অতি বেশী নফল নামায, কোরান শরিফ তেলাওয়াত, রোজা পালন ও মোশাহিদা মোরাকাবাতে রত থাকিতেন বলিয়া শুনিয়াছি।

তাঁহার শেষ সময়ে আমি বয়স্ক ও বুদ্ধিমান হওয়ার পর একদিন তাঁহার পিছনে একতেদা করিয়া ঈদের নামায পড়িয়াছি। তিনি নামাযে "ছুন্নতা মান কাদ্ আরছালনা কাবলাকা মিররাছুলেনা" আয়াত প্রথম রাকাতে পাঠ করিয়াছিলেন। এবং মৌলানা আমিনুল হক সাহেব (তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র) হযরত কেবলার আদেশমত "খোত্বা" পাঠ করিয়াছিলেন। অন্য সময় জাহেরা নামায পড়িতে আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অনেক ঘটনায় ও অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাকে মদিনা শরিফ নামায পড়িতে ও ছায়ের অবস্থায় সাক্ষাৎ পাইতেন। তিনি অনেকের বিপদ মুক্ত ও উপকার করিতেন।

"তাঁহার ওফাতের কিছুদিন পূর্বে ঈদের নামাযে মৌলবী রহিমউল্লাহ্ ছাহেব তাঁহার আদেশমত খোতবা পাঠ ও এমামতি করিয়াছিলেন। হযরত একখানা জায়নামাযে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু একতেদা করিতে দেখি নাই। ইহা ছাড়াও তাঁহাকে আমি কোন দিন কেয়াম, কুউদ, রুকু-সেজদার আরকান পালনে দেখি নাই। শেষ সময়ে রোজা পালনেও তেমন কোন আগ্রহ দেখি নাই। কোন কোন সময় রোজা পালন করিয়া এফতার করিতে দেখিয়াছি এবং কোন কোন সময় রমজান মাসে দিনের বেলায় সরবত পান করিতে ও করাইতে দেখিয়াছি।"

"হেদায়েত আলী ও মুনসিকদারের বাড়ির আবদুর রহমান মিঞাকে রমজান মাসে সরবত পান করাইতে দেখিয়াছি। তখন প্রতিবেশী ছায়াদ উদ্দিন সাহেব বলিয়াছিলেন – আবদুর রহমানের রোজাটি খলল হইয়া গেল। ইহা শ্রবণে হযরত বলিয়া উঠিলেন, 'আমার ছেলেরা সব সময়ে রোজা রাখে।' আবার কোন কোন সময় হযরতকে একেবারে কিছু না খাইয়াও থাকিতে দেখিয়াছি।" [সূত্র: জীবনী ও কেরামত, পৃ: ২০৯-২১০, আলোকধারা বুক্স, চট্টগ্রাম, ২০২১ ইং]

তবে এটা প্রণিধানযোগ্য যে; এবম্প্রকার ব্যতিক্রম আচার-ব্যবস্থা কেবল মাত্র ঐসব মহান পবিত্র কামেল মানবরাই। প্রয়োজনে এস্তেমাল করতে যারা জিসমালী ও রুহানী ক্ষেত্রে দর্শনীয়ভাবে স্বীকৃত স্তরে উন্নীত হবার মতো আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও মেহেরবাণী অর্জন করার সৌভাগ্য লাভে ধন্য। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এ ধরনের আচরণ তাঁর নিতান্ত শেষ বয়সেই বিকশিত। হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলার (ক.) ক্ষেত্রেও এ ধরনের আচার তাঁর জীবনের শেষ ভাগে বিকশিত। রুহানীভাবে যাঁরা আলমে আরওয়া বিচরণের অধিকার অর্জন করেন, এ ধরনের ব্যতিক্রমী এক-আধটা আল-কোরআনের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণে পরিদৃষ্ট হয় যে, প্রত্যেক নবী-রসূলের জীবনের কোন না কোন সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যতিক্রমী কিছু বিষয়ের উদ্ভব ঘটে, যা তাবৎ ব্যাকরণ শাস্ত্রের ভাষায় 'নিপাতনে সিদ্ধ' হিসেবে বর্ণিত। এটা গতানুগতিক আটপৌরে বিষয় নয়। হযরত কেবলা, বাবা ভাণ্ডারী কেবলা প্রমুখ স্তরের ওলীরা শরিয়ত অনুযায়ী বর্ণিত আহকাম-আচার নিষ্ঠাসহকারে পালন করেছে বটে। একশ্রেণির মুনাফেক প্রতিপক্ষ কর্তৃক দুরভিসন্দিমূলকভাবে নির্মিত জাগতিক আধ্যাত্মিক যে কোন মানদণ্ডের নিপাতনে সিদ্ধ সূত্রের অন্যতম ফলিত দৃষ্টান্তও বটে (মসজিদে যেরার এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নোট দ্রষ্টব্য)।

১৩. ব্যবহারিক জীবনের কিছু নমুনা

(ক) পারিবারিক "মোয়ামেলাতে" হযরতের আপোষ ভাব

"একদা এক ব্যক্তি হযরতের খেদমতে নালিশ করিল যে, তাহার ভ্রাতা জুলুম করিয়া তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। হযরত তাহাকে তাহার ভ্রাতার সহিত আপোষ মিমাংসা করিয়া লওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। লোকটি তখন বলিল যে, তাহার ভাই আপোষ মানেনা। হযরত আবার বলিলেন, সে হারামজাদা, তাহাকে কিছু বেশী দিয়া আপোষ কর। এইরূপ ঘটনাতে প্রায় লোককে তিনি আপোষ মিমাংসার আদেশ দিতেন।" এ প্রসঙ্গে আল কোরআনের আয়াত: "বস্তুতঃ আপোষ-নিষ্পত্তি সর্বাবস্থায় উত্তম; কিন্তু মানুষ লালসার প্রতি আসক্ত আর যদি তোমরা সৎকর্মপরাছু হও এবং মুত্তাকী হও; তবে তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন (৪:১২৮)।"

(খ) অতিব্যয় অতি আনন্দ ও সংসার ধর্মে অনাসক্তি এবং আল কোরআনের নীতি অনুযায়ী সঞ্চয় অনাসক্তি

"হযরতের দরবারে কেহ সাদীর কথা বলিলে, তিনি বলিতেন, নবি করিম (দ.) দুনিয়াকে "দারুল হোজন" বলিয়াছেন। আর তুমি বল সাদী। তিনি জালাল হইয়া যাইতেন। কিন্তু খাদেমা বা বাবুর্চি আনিবার কথা বলিলে তিনি যথারীতি নাম জিজ্ঞাসা করিতেন এবং অনুমতি প্রদান করিতেন।
হযরত কেবলা তাঁহার একমাত্র পুত্র মৌং সৈয়দ ফয়জুল হক সাহেবকে বিবাহ করাইবার পর হযরত সাহেবানী, বসতবাড়িটি প্রশস্ত ও সুন্দর করিবার জন্য হযরত সমীপে বার বার অনুমতি চাহিলেন, তিনি উত্তর দিতেন "ভাই! দুনিয়া "দ্বারুল রেহালত", পান্থশালা। এখানে অত সুন্দর ও বেশী প্রশস্ত ঘরের দরকার কি? দুই দিন বিশ্রাম করার দরকার মাত্র। তাঁহার নিকট আনীত অগনিত হাদিয়া ও টাকা পয়সা তিনি অকাতরে লোকজনের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। কোন প্রকার সঞ্চয় বা জমা করিতে দিতেন না।"

(গ) হযরতের পরদুঃখ কাতরতা

"কোন ছেলেমেয়ে কাঁদিলে বা দুঃখ পাইলে হযরত ব্যস্ত হইয়া যাইতেন। যেই পর্যন্ত তাহাদিগকে শান্ত করা না হইত, সেই পর্যন্ত তিনি নিজে শান্ত হইতেন না, বরং বিচলিত থাকিতেন।"

যে কোন গরীব দুঃখী তাঁহার নিকট কাপড়-চোপড়, খাওয়ার বা ঘর মেরামতের নাম করিয়া কিছু চাহিলে তিনি অকাতরে সম্মুখে যাহা পাইতেন, দান করিয়া দিতেন। খাদেম ছেলেগণকে তিনি রাত্রে বিছানায় যাইয়া দেখিতেন, তাহাদের মাথায় বালিশ বা গায়ে কাপড় আছে কিনা? না থাকিলে নিজে ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। অনেক সময় নিজের কাপড় ও শাল-চাদর তাহাদের গায়ে দিয়া দিতেন।

দূরে ভিন্নস্থানে বিপদে বা কোন দুঃখে পড়িয়া তাঁহাকে কেহ স্মরণ করিলে বা সাহায্য চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাত বিপদ বারণ ও দুঃখ হরণ করিতেন। টাকা-পয়সার দরকার হইলে তাহার দরকার অনুযায়ী যথাসময়ে গায়েবী সাহায্য করিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিতেন।

মির্জাপুর নিবাসী মৌলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, 'আমি এক শীত রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে উঠিয়া অত্যন্ত শীত অনুভব করিলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম, আমার বেয়াই হযরত সাহেব কেবলার নিকট সংবাদ পাঠাইলে নিশ্চয় তিনি আমার জন্য শীতবস্ত্র পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার কাছে আনীত অনেক শাল ও মূল্যবান কাপড়াদি আছে। আমার আর খরিদ বা তৈয়ার না করাইলেও চলিবে।

ঘটনাক্রমে সেই রাত্রে হযরত গাজির হাটে মুনসিকদার বাড়ির তদীয়ভক্ত আবদুর রহমান মিঞার দোকানে অবস্থান করিতেছিলেন। শেষ রাত্রে হঠাৎ তিনি আবদুর রহমান মিঞাকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, "আবদুর রহমান মিঞা! একখানা বালাপোষ তৈয়ার করিয়া রাখ।" তিনি সকালে উঠিয়া দরজী ডাকিয়া তাড়াতাড়ি একখানা বালাপোষ তৈয়ার করাইয়া হযরত সমীপে হাজির করিলেন। হযরত উহার সমস্ত খরচ আদায় করিয়া দিলেন। হাদিয়া রূপে লোকের আনীত দুইখানা শাল সহ উক্ত বালাপোষ খানা সন্ধ্যায় মির্জাপুর তাঁহার বেয়াই জনাব মৌলানা সৈয়দ মছিউল্লাহ্ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। হযরত তাঁহাকে "মোস্তফা" বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন, মৌলানা মছিউল্লাহ্ সাহেব বলেনঃ

'সন্ধ্যায় আমি হযরতের পাঠানো বালাপোষ ও শাল কাপড় দেখিয়া অত্যন্ত অবাক হইলাম। কারণ গত রাত্রে যাহা আমি মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা কাহারো নিকট ব্যক্ত করি নাই। অথচ হযরত আমার জন্য ঐ কাপড়ই পাঠাইয়াছেন, যাহা আমি পাইতে মনে মনে আশা পোষণ করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তিনি পর দুঃখে দুঃখী ও অন্তর্যামী।

এইরূপ মুফ্‌তী মৌলানা ফয়েজ উল্লাহ্ সাহেব বক্তপুরি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা বক্তপুরি মৌলানা হামিদ উল্লাহ্ ছাহেবের পুত্র মৌলানা এজাবত উল্লাহ্ সাহেব খাজনার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কারণ, তাহার গুমানমর্দন এলাকার তরফ মহাল বাকী খাজনার দায়ে নিলামে উঠিয়াছিল। তিনি হতাশ হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, হযরতের কাছে চাহিলে নিশ্চয় ইহার সমাধান হইবে। তিনি হযরতের নিকট আসিবেন স্থির করিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একজন লোক মারফত হযরত কেবলা তাঁহার নিকট কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। তিনি টাকা গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, যত টাকা তাহার প্রয়োজন, ঠিক তত টাকাই হযরত তাহার জন্য পাঠাইয়াছেন।

ইহাতে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং খোদার দরবারে হযরতের উপকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। এইরূপ অসংখ্য ঘটনা আছে; যাহাতে বিপদের সময় ভক্তজনের বিপদবারণ ও দুঃখ হরণ হইয়াছে।

(ঘ) সকলের প্রতি হযরতের দয়ার্দ্রভাব ও শিষ্টাচারিতা

“হযরত সকলের প্রতি যথাযথ সম্মানসূচক ব্যবহার করিতেন। কাহারো প্রতি কোন দিন রুষ্ট ব্যবহার করিতেন না। ছোটদের প্রতি তিনি মামু সাহেব, মিঞা, দাদা, ভাই ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। বয়স্ক ও বড়দের প্রতি জনাব দাদা সাহেব ইত্যাদি শব্দে সম্মান দেখাইতেন। নিতান্ত দূরাচার লোক হইলেও তাহাকে তিনি অতি আদর ও সম্মান করিতেন। ইহাতে তাহাদের নীতি ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়া যাইত। হযরত তাঁহার সমসাময়িক আলেম ফাজেলদিগকে অতিশয় সম্মান করিতেন এবং সর্ব্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব রাখিতেন। এমন কি সময়ে সময়ে হযরতের জন্য আনীত সওগাত সমূহ হইতে তাহাদের জন্য সওগাত ও সালাম পাঠাইতে দেখা যাইত।”

(ঙ) বিলাসী পোশাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধানে হযরতের অসম্মতি

“হযরত নারীদের জেওর বা অলঙ্কার এবং তাবিজ ইত্যাদি পরিধান পছন্দ করিতেন না। অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি আদেশ দিয়া এই সমস্ত খোলাইয়া ফেলিতেন। নাক কান ছেদন করিতে দেখিলেও তিনি সমবেত লোকজনকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেন এবং এই সমস্তকে “মনহুছির জহর” বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন।”

[সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত, পৃ: ২১০-২১৪, আলোকধারা বুক্স, চট্টগ্রাম, ২০২১ ইং]

হযরত আকদাসের শারীরিক বিবরণ

সুফি জিয়াউল হোসাইন সাহেব বর্ণনা করেন, একবার তিনি হযরত কেবলার সহিত তাঁহার বাড়ির পশ্চিম দিকের লোহার খালের পশ্চিম দিক হইতে বাড়ির দিকে আসিতেছিলেন। খালে পানি ও কর্দম দেখিয়া হযরত পা মোবারক হইতে জুতা খুলিতে উদ্যত হইলেন। তখন জিয়াউল হোসাইন বলিলেন, হুজুর আপনি জুতা খুলিবেন না। আমি কোলে করিয়া আপনাকে খাল পার করাইয়া দিব।

ইহাতে হযরত বলিলেন, আপনি আমাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবেন না। জিয়াউল হোসাইন বলিলেন, কেন হুজুর আমি তো আরো কতবার আপনাকে খাল পার করাইয়াছি। হযরত বলিলেন, "না, মিঞা; অদ্য পারিবেন না।" তবুও জিয়াউল হোসাইন তাঁহাকে কোলে করিয়া খাল পার করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি তাঁহাকে মাটি হইতে উঠাইতেও পারিলেন না। শেষ পর্যন্ত তাহার চক্ষু হইতে রক্ত বাহির হওয়ার উপক্রম হইল। তবুও পারিলেন না। তাহার মনে হইল যেন হযরতের পা মোবারক মাটির সহিত লাগিয়া রহিয়াছে। ব্যাপার তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেক সময় দেখা যাইত হযরত বিছানায় শুইয়া আছেন। অথচ দেখিয়া মনে হইত যেন একখানা কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার পবিত্র দেহ মোবারকে এক প্রকার দারুচিনি গাছের খোসবু ছিল। যেই রাস্তায় তিনি চলিতেন সেই রাস্তায় বহুক্ষণ পরেও পরিচিত কেউ গমন করিলে অনুভব করিতে পারিত যে হযরত এই পথে তশরিফ নিয়াছেন। তাঁহাকে একই সময়ে বহুস্থানে এমন কি মক্কা মদিনায় পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হইত।

সময় মত আবশ্যকীয় সওগাত

হযরত বা হযরতের পারিবারিক আবশ্যকীয় কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে তাহা খোদার মেহেরবানীতে সময় মতো আসিয়া পৌঁছিত। প্রয়োজনের অধিক দ্রব্যাদি তিনি বিলাইয়া দিতেন। (সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত পৃঃ ২১৬-২১৭, আলোকধারা বুক্স, চট্টগ্রাম ২০২১ ইং)

হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার অতীব গুরুভার বস্তু। তা ধারণ ও বহন করার শক্তি ও ব্যাপকতা অর্জন বড়ই কঠিন সাধনা-সংযমপূর্ণ বিষয়। দৃশ্যমান লোক-প্রশাসনে যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে উপযুক্ত যোগ্যতার বিষয়টা সর্বাগ্রে বিবেচ্য, রুহানী পরিমণ্ডলে তা আরো বহু গুণ বেশি দুর্ভার ও ব্যাপক। তাই ধর্ম-নির্বিশেষে মহান অধ্যাত্ম সাধক তথা স্রষ্টা–সাধকরা যথোপযুক্ত উত্তরাধিকার মনোনয়ন, নির্বাচন ও নির্মাণে অতীব যত্নবান, সূক্ষ্মদর্শী ও কঠোর হন। খোদ হযরত সাহেব কেবলার জীবনই এর অন্যতম প্রমাণ। নিম্নে তাঁর তিনজন প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উত্তরাধিকারীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হলো সুবিখ্যাত 'জীবনী ও

কেরামত' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৬৭ইং, যার পুনঃপ্রকাশ হয় ১১ অক্টোবর, ২০১১ ইং এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট এর আলোকধারা বুক্‌স, ডিউ উদয়ন লেভেল-১২, চান্দগাঁও চট্টগ্রাম-৪২১২ থেকেঃ

(ক) হযরতের নিজ ভ্রাতুস্পুত্র বাবাজান কেবলার প্রতি ফয়েজ বর্ষণ ও খেলাফত স্বীকৃতি

হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র গাউসুল আযম বিল বিরাসত মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.) সাহেব (প্রকাশ বাবাজান কেবলা) হযরতের প্রতি পতঙ্গতুল্য আশেক ছিলেন। হযরতও তাঁহাকে অত্যন্ত আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতির নজরে দেখিতেন। একদিন জনাব বাবাজান কেবলা হযরত সাহেবের কদম শরিফ দুইখানাকে দুই হাতে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, হযরত কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়াইতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি জজবার হালতে তন্ময় অবস্থায় তাঁহাকে চেয়ারের হাতল দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহার করিতে করিতে তাঁহার সমস্ত বদন মোবারক রক্তাক্ত করিয়া দিলেন এবং মাথার চুল মোবারক ধরিয়া মূখমণ্ডলকে উপর দিকে ফিরাইয়া সুন্দর চেহারার প্রতি জজবাতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বলিতে লাগিলেন; "ইফ্‌সুফের মত সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইফ্‌সুফের মত সুন্দর দেখিতেছি।"

হযরত মৌলানা শাহ্ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, "এমতাবস্থায় আমার দাদী আম্মা হযরত ছাহেবানী ও আমার মাতা এবং জেঠাই শাশুড়ি সাহেবানী উপস্থিত হইয়া অতি কৌশলে সজোরে বাবাজান কেবলার হাত দুইখানা হযরতের কদম শরিফ হইতে ছিনাইয়া লইলেন এবং তৈল দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া হযরত সাহেবানী বলিতে লাগিলেন; আপনি এখন কি কাজ করিলেন? এমন সুন্দর চাঁদের মত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে এইভাবে প্রহার করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করা কি আপনার উচিত হইয়াছে? তাহার মাতা-পিতা কি বলিবেন!"

হযরত সাহেব তখন বিশেষ শান্তভাবে বলিলেন, "ভাই! তাহা ঠিকই। তাহাকে আমার একটি চক্ষু দিয়া দিয়াছি। সে শেষ পর্যন্ত আমার দুইটি চক্ষুই চায়।

তাহাকে আমার দুইটি চক্ষুই দিয়া ফেলিলে আমি চলিব কি করিয়া। তখন হযরত ছাহেবানী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদারই মারপেঁচ।

তারপর বাবাজান কেবলাকে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আপনি যখন তাঁহাকে না-দেখিয়া থাকিতে পারেন না, সামনে আসিলে আপনার প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করেন এবং তিনিও প্রহার করেন; এমতাবস্থায় আপনি কিছুদিন বাহিরে সায়েরে চলিয়া যান। যখন আপনাকে দেওয়ার সময় হইবে, তখন হযরত আপনাকে তালাস করিয়াই যাহা দেওয়ার দিয়া দিবেন। তাঁহার হায়াত ও কাজ আরো বাকী আছে। আপনি কি এই সময়ে তাঁহাকে বিদায় দিতে চান? আওলীয়াদের কাজ শেষ হইলে তাঁহারা আর ক্ষণকালও এখানে থাকেন না। তাঁহার কালামে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই সময় আপনি কিছুদিন দূরে থাকা নিতান্ত দরকার।" হযরত সাহেবানীর এই আদেশে বাবাজান কেবলা সায়েরে বাহির হইয়া যান।

একমাত্র পৌত্র শাহ্ সুফি মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রতি আধ্যাত্মিক সু-নজর এবং অবর্ণনীয় অনুরাগ ও প্রীতির নিদর্শন

হযরত আকদাছের বর্তমান সাজ্জাদানশীন তাঁহারই খেলাফত অর্পিত একমাত্র পৌত্র শাহ্ সুফি মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের প্রতি হযরতের যে প্রীতি ও অগাধ ভালবাসা ছিল, ইহার নিদর্শন স্বরূপ একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হইলঃ

হযরত সাহেব কেবলা সব সময় তাঁহাকে সঙ্গে নিয়াই পান-আহার করিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন দিনই তিনি আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না।

একদা তিনি তাঁহার আম্মাজানের সহিত তাঁহার নানাজান মির্জাপুর নিবাসী বড় মৌলবী সৈয়দ মছিহুল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের বাড়িতে বেড়াইতে যান এবং তথায় তিনি একদিন অবস্থান করেন। পরদিন সকালে খাদেম রহম আলীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে বাড়িতে আনা হয়। তিনি বাড়িতে আসিয়া জানিতে পারিলেন, হযরত তিনি যাওয়া পর্যন্ত কোন আহার্য্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিকট খাবার নেওয়া হইলে তিনি 'দাদা ময়না' সৈয়দ দেলাওর হোসাইনকে তালাস করিতেন। তিনি নানা-বাড়িতে গিয়াছেন শুনিলে বলিতেন; খানা নিয়া যাও। 'দাদা ময়না' আসিলে এক সাথে বসিয়া খাইব।

হযরত শাহ্ সুফি মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, এই ঘটনার পর হইতে আমার আর কোথাও যাওয়া হইত না। বরং তাঁহার সাথে সাথেই থাকিতে হইত। এমন কি আমার বাল্যকালিন খেলাধূলা পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে যাইয়া করা হইত না। তিনি দায়েরা শরিফে তাঁহার বিছানায় বসিলে আমাকেও ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে বিছানায় বসাইতেন।

(হযরতের) পৌত্রের শানে রহস্যপূর্ণ ভবিষ্যতবাণী
নবাব হোচ্ছামুল হায়দারের নায়েব আজিজ মিঞার প্রতি হযরতের পৌত্রের শানে বাণী

(গ) একদা কুমিল্লার নবাব হোচ্ছামুল হায়দার তাঁহার নায়েব চিওড়া নিবাসী আজিজ মিঞাকে বহু হাদিয়া উপঢৌকনসহ হযরতের খেদমতে পাঠান। আজিজ মিঞা দরবার শরিফ উপস্থিত হইয়া হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন, "হুজুর! নবাব হোচ্ছামুল হায়দার আপনার খেদমতে এই হাদিয়াগুলি পাঠাইয়াছেন।" সেই সময় হযরত জালালী অবস্থায় ছিলেন।

নায়েব সাহেবের আরজ শ্রবণ মাত্র হযরত অত্যন্ত জালাল হইয়া উঠিলেন। মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, "এই সময় আমি হযরতের সামনে উপবিষ্ট ছিলাম।" আজিজ মিঞার কথা শেষ হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "নবাব হামারা দেলা ময়না হ্যায়। ফের আওর কোওন নবাব হ্যায়?"

(ঘ) এইরূপ বাঁশখালী নিবাসী সুলতান আহামদ নামক এক ব্যক্তি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন। হযরত তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "হুজুর আমার নাম সুলতান আহমদ।" হযরত 'সুলতান' শব্দ শুনিতেই বলিয়া উঠিলেন, "তোম কোওন সুলতান হ্যায়? সুলতান হামারা দেলা ময়না হ্যায়।"

"হযরতের গাউছিয়ত স্বীকৃতি"

হযরত শাহ্ সুফি মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব বলেন, শৈশবে একদা আমি খেলার ছলে বাড়ির আঙ্গিনায় গান করিতেছিলাম–

> গাউছে মাইজভাণ্ডার, মোজহে সরবত পেলাদো।
> তেস্নে গিয়ে দেলকো মেরে, আজ ভোজা দো।

আবছরে লাহুত হো তোম, মালেকে মলকুত
ইন ছবকা তামাসা মোজহে, আয় মাওলা দেখা দো।

ইত্যাদি– (মৌলানা হাদী রচিত)

এই সময় হযরত সাহেব কেবলা আন্দরবাড়িতে গদী শরিফে বসিয়া ছিলেন। আমার গান শুনিতে পাইয়া খাদেমকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "দুধের সরবত বানাও"। তারপর আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি লজ্জিত হইয়া হযরতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। হযরত আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,– "দাদা ময়না! সরবত খাইবেন?"

হযরতের সামনে এক জাম দুধের সরবত দেওয়া হইল। প্রথমে তিনি নিজে কিছু সরবত গ্রহণ করিলেন। বাকী সরবত একবার তিনি পান করেন, কিছু আমাকে পান করান। বাকী সরবত অন্যান্যদের বিলাইয়া দেওয়া হয়।

"হযরতের উত্তরাধিকারী খলিফা নির্ণয় ও গদী অর্পণ"

হযরতের পার্থিব নশ্বর জীবনের প্রায় শেষ সময় দেখা দিলে তাঁহার হস্ত ও পা মোবারকে এক প্রকার শোথ ও আমাশার ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এমন সময় একদিন আমি তাঁহার সহিত বাহির দায়েরা শরিফে বসা ছিলাম। সেই দিন শুক্রবার ছিল। জুমার নামায শেষ করিয়া মুসল্লিগণ পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাকে ভক্তি ও কদমবুচি জানাইতে হাজির হইল। হযরত সাহেব কেবলা পূর্বমুখি উপবিষ্ট আছেন। আমার বড় ভাই সৈয়দ মীর হাসান সাহেব আগন্তুক হাজতিগণকে হযরতের খেদমতে আনিয়া সাক্ষাৎ করার কাজে রত আছেন। ঘরে-বাইরে অসংখ্য লোকের ভীড়। মহল্লার সরদার মরহুম সায়াদ উদ্দিন ও তাহার ভ্রাতা আছাবউদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলেই হযরতের শেষকালিন লক্ষণ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। আছহাব উদ্দিন সাহেব হযরতের খেদমতে অতি কাতর ভাবে আরজ করিলেন, "হুজুর আপনার তবিয়ত ও শরীর দিন দিন কমজোর হইয়া যাইতেছে। কোন সময় আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া আপনার স্বস্থানে চলিয়া যান, তার তো কোন ঠিক নাই; হুজুর স্বয়ং থাকিতে হুজুরের বড় নাতী সৈয়দ মীর হাসানকে গদীতে বসাইয়া গেলে আমাদের জন্য ভাল হইত। আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েগণ, হুজুরের ভক্ত,

অনুরক্ত, আগন্তুকগণ আসিয়া হুজুরের গদীশরিফে সান্ত্বনা পাইতে এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতাম"।

হযরত আকদাস তাহাদের প্রতি উত্তর করিলেন, "মীর হাসান মিঞা নাবালেগ, আমার "দেলাময়না" বালেগ। দেলাময়নাই আমার গদীতে বসিবেন।" সৈয়দ মীর হাসান মিঞা বয়সে বড়, অথচ হযরত বলিতেছেন নাবালেগ; উপস্থিত জনগণ তাঁহার এই বিপরীত বাক্য-রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। হযরতের পরলোক গমনের তেতাল্লিশদিন পর যখন মীর হাসান মিঞাও জান্নাতবাসী হন, তখন সকলে হযরতের পবিত্র কালামের রহস্য বুঝিতে পারিল।

হযরতের পৌত্রের মর্যাদা নির্দেশে তাঁহার নবী অবয়বতার পরিচিতি

একদিন হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ হাসেম সাহেব ভোরবেলায় সৈয়দ মীর হাসান ছাহেবকে নিদ্রা হইতে একটু কর্কশ ভাষায় ডাকিয়া উঠাইতে শুনিয়া হযরত বলিলেন, "মিঞা রাসুলুল্লাহর (দ.) দুইজন নাতী হাসনাইনকে চিন না? (হযরত হাসান ও হোসাইন) আদবের মোকাম। আদব করিও"। সেইদিন হইতে সকলেই তাঁহাদের প্রতি হাসনাইনের সমান আদব ও সম্মান করিতেন।

হযরত কেবলার উপরোক্ত কালাম এই ইঙ্গিত বহন করিতেছে যে "হাকিকতান" বাস্তবে হযরত, নবীর ও তাঁহার পৌত্রদ্বয় হযরত হাসান হোসাইনের জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি।

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

তাঁহার বড় সন্তান শাহ্ সৈয়দ মৌলভী জিয়াউল হক সাহেব বর্তমানে যিনি আধ্যাত্মিক প্রেরণায় বিভোর আছেন, বি, এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় তিনি হযরত বাবাজান কেবলা কাবার আধ্যাত্মিক সুনজরে পড়েন। প্রেরণাধিক্যে ক্রমান্বয়ে তিনি আহার-নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ পান। কিছু দিনের মধ্যে যেন তিনি উন্মাদের মত হইয়া গেলেন। উহা তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ মনে করিয়া–অনেক প্রকার চিকিৎসা করা হইল। কোন প্রকার পরিবর্তন না দেখিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তাঁহার প্রেরণা আরও বাড়িতে

লাগিল। একদিন এমত অবস্থা হইয়া গেল যে, তাঁহার মাথার উপর অনেক পানি ঢালার পরও শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিল না। ইহাতে তাঁহার পিতা সাহেব বিশেষভাবে চিন্তাশীল হইয়া পড়িলেন। বড় সন্তানের এরূপ অবস্থা অথচ কোন ঔষধ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। এক রাত্রে তিনি চিন্তিত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, হযরত কেবলা সাহেব তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বলিতেছেন, "আপনি উদগ্রীব হইয়াছেন কেন? আমার ক'বা অর্থাৎ জুব্বাটী তাঁহার গায়ে পরাইয়া দিন।" তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া হযরতের স্মৃতি-কামরা হইতে ক'বাটী তালাস করিয়া নিলেন এবং ক'বাটী তাঁহার গায়ে পরাইয়া দিয়া তিনি আপন হুজুরায় বিশ্রাম করিতে আসিলেন। তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমতাবস্থায় তাঁহার উক্ত সন্তান আসিয়া তাঁহার হুজরার দরজা খুলিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি উঠিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনিও তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার এমন নিদ্রা আসিল যে, সারা রাত্র গত হইয়া পরদিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাইয়া রহিলেন। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার অবস্থা প্রায় শান্ত। তাঁহাকে স্নান ও আহারান্তে পুনঃ বিশ্রাম করিতে দিলেন। এইবারও তিনি সারারাত ও পরদিনের প্রায় ৯টা পর্যন্ত ঘুমে বিভোর হইয়া রহিলেন। সেই দিন হইতে দেখা গেল; তিনি সম্পূর্ণ ভাল ও শান্ত। কিছুদিনের পর পুনঃ তাঁহার প্রেরণাধিক্য দেখা দিল। তাঁহার পিতা সাহেব বিশেষ চিন্তিত হইয়া গেলেন। দেখিতে পাইলেন, জনাব মৌলানা নুরুচ্ছফা নামক হযরতের এক প্রিয়তম সাহেবে কশ্‌ফ খলিফা দরবার শরিফে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাতে গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! গত রাত্রে হযরত আকদছ আমাকে দেখা দিয়া নির্দেশ দিলেন, মিঞা! আপনি আমার মিঞাকে বলুন তিনি পেরেশান কেন? আমি প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতেছি। আপনি তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, জিয়াউল হক আমিই।" ইহা দর্শনে আমি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া নির্দেশ পালনে আপনার খেদমতে আসিয়াছি। এই ঘটনার পর তাহারা প্রত্যেকে দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা আধ্যাত্মিক প্রেরণাধিক্য মাত্র।

হযরতের ওয়ারেস

হযরত আকদছের ওফাত কালে তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না। তিনি তাঁহার একমাত্র স্ত্রী সৈয়দা লুতফুন্নেছা সাহেবা, কন্যা সৈয়দা আনোয়ারুন্নেসা সাহেবা, মরহুম একমাত্র পুত্র মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়েজুল

হক ফানীফিল্লাহ্ (র.) সাহেবের ঔরষজাত পৌত্রদ্বয় শাহ্ সুফি সৈয়দ মীর হাসান ও মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবান ও পৌত্রী সৈয়দা সবুরুন্নেসা বিবি সাহেবাকে একমাত্র উত্তরাধিকারী ওয়ারেস হিসাবে এইভবে রাখিয়া যান। এবং বিল অলায়েত আধ্যাত্মিক ওয়ারেস হিসাবে অসংখ্য কামেল অলি আল্লাহ্গণকে তাঁহার খলিফা বা উত্তরাধিকারী বিদ্যমান রাখিয়া এই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া অমর জগতে প্রস্থান করেন। তাঁহার ওফাতের ৪৩ দিনের মধ্যে তাঁহার বড় পৌত্র শাহ্ সুফি সৈয়দ মীর হাসান সাহেব তাঁহার চিরসঙ্গী ও স্বর্গবাসী হইয়া চলিয়া যান।

হযরতের ওফাত এবং আল্লাহ্তা'লার মহাজাতে মিলন
(ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন)

হযরত অনাবিল করুণাবারি বর্ষণের পর খোদাতা'লার তৌহীদ তোরণ চির উন্মুক্ত করিয়া সুদীর্ঘ ৭৯ (ঊনাশি) বৎসর কাল ভবে তাঁহার আধ্যাত্মিক লীলা সমাপনে, সকল জাতির ও সর্ব্ব ধর্মীয় মুক্তির তরণী, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অপূর্ব অদ্বিতীয় দোজাহানীয় বন্ধু, বিশ্ব দরদী-মানব কল্যাণ, জগতবাসীর অতুলনীয় আশার প্রদীপ, মাহবুবে নাজনীন উভয় জগতের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ, ভক্তদের শান্তি, পাপী-তাপী দুঃখী-দুস্থের একমাত্র ভরসা সহায় সম্বল ও আশ্রয়স্থল, নবীদের নয়নমনি, গুপ্ত খোদা রহস্যের ব্যক্ত খনি, সমস্ত গাউস কুতুবদের অত্যুজ্জ্বল রবি পীর আউলিয়াদের অগ্রনায়ক শাহানশাহ্ স্বাধীন বেলায়েতের ঝাণ্ডাবর্দার, নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন বাধাহীন বেলায়েতের মোহরধারী, গাউসুল আযম ও কুত্বুল আকতাব শিরোমনি গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ (ক.) মহান পবিত্র নবীর সর্ব্ব সিফাতের আদর্শ ও অধিকারী হইয়া শেষকালে বিশ্ববাসীর নয়ন গোচরে মহান প্রভুর মহাজাতে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলেন। একদা ইংরাজী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, হিজরী ১৩২৩ সনে, বাংলা ১৩১৩ সালে, ১২৬৮ মঘী'র ১০ই মাঘ মোতাবেক ২৭শে জিল্কদ সোমবার দিবাগত এক পবিত্র শুভ নিভৃত মুহূর্তে নিঝুম রাত্রে একটার সময় পরম প্রিয়তম একমাত্র মাহবুব মহান আল্লাহের শুভ মিলনে বিশ্ববাসীকে ছাড়িয়া এই ধরাধাম ত্যাগে পবিত্র অমর ধামে শুভ যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহে! তাঁহার পবিত্র মহান আত্মার উপর অবিরাম আল্লাহ্ তা'লার অসীম শান্তি করুণাবারি বর্ষিত হউক!

বিধির কি বিচিত্র লীলা! পরিবর্তনশীল জগতের কি আমূল রদবদল প্রকৃতির কেমন নিষ্ঠুর লীলা! কখন জগতবাসীকে আনন্দ তরঙ্গে ভাসাইয়া দিগ্বিদিক

উল্লাসিত ঢেউ তুলিয়া দেয়! আবার কখন মুহূর্ত কালের মধ্যে সারা বিশ্বভুবনে শোক উচ্ছ্বসিত বহ্নি বহাইয়া নেয়! আজ কারো মুখে হাসি নাই। আনন্দের লেশ নাই। আছে শুধু আর্তনাদ, আছে মাত্র করুণ কান্নার কুহরী রোল। আকাশ শোকাতুর হইয়া যেন নিচে নামিয়া আসিল। বাতাস যেন গতি রূদ্ধ হইয়া বন্ধ রহিল। জলধি যেন অচল হইয়া কাতর হইয়া তাহার হু-হু-রব হারাইয়া বসিল। স্থূল জগত নিরাশায় নিস্তেজ হইয়া তাহার উর্বরা শক্তিহীন হইয়া গেল। শীত ঋতু বিরহ হুতাশনে তাহার বিষাদ মাখা শিশির বিন্দু বরিষণে সমগ্র জগত ভিজাইয়া দিল। বৃক্ষলতা দুঃখে হতাশ হইয়া তাদের পত্রাশ্রু নিক্ষেপে ভু-বক্ষ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলের পরিধানে শোকের পরিচ্ছদ। চোখে মুখে অপূর্ব বিষাদময় হতাশের লক্ষণ। প্রকৃতির সুশোভিত সুন্দর সজীব চেহারা যেন একেবারেই বিগড়িয়া এক বিস্ময়কর বিকট বিমর্ষ আকার ধারণ করিল। দিগদিগাঞ্চলে দুঃখের ধ্বনি যেন সারা বিশ্ব প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। যেন এক অদ্ভূত মাতম ধরনীতে সমগ্র ভুবন আলোড়িত করিয়া দিল। হায়রে দুর্ভাগ্য! হায়রে ললাট! একী তোর বিধির বিধান! একী তোর অখণ্ডণীয় লিখন! আমাদের আশা-রবি প্রাণ-নিধি, নয়ন-মনি আজ বুঝি এই বিশ্ব ভুবন অন্ধকার করিয়া আমাদেরে অসহায় করিয়া চলিয়া গেলেন। হে হৃদয় সখা গাউস ধন! হে অফুরন্ত করুণা খনি! সর্ব্বজাতি দুর্গতের আশ্রয় ভাণ্ডারী! আজ বুঝি তুমি নারাজ হইয়া চলিয়া যাইতেছ? অতি অল্প সময়ে এই বিষাদ মাখা দুঃখ-সংবাদ দেশ-দেশান্তরে অলিতে-গলিতে নগরে কাননে হাটে-ঘাটে পবন প্রবাহের মত বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। ঘুমে-চেতনে, শেষ রাত্রে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া যাইতেছে, ভাণ্ডারী আর ভবে নাই। কেহবা স্বপ্নযোগে দৈব বাণীতে শুনিতে পাইতে লাগিল, আমাদের আশা রবি আজ অস্তমিত। ভোর হইল! চারিদিকে কান্না-কাটি বলাবলি শোক ধ্বনির যেন তুফান উঠিয়া গেল। সমস্ত দেশ-দেশান্তরের ভক্ত-আসক্ত অনুরক্তবৃন্দ শোক-উচ্ছ্বাসে মাতাল বেশে পতঙ্গসম দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কত আশেকবৃন্দ শোকে কাতর বেহুঁশ মৃতপ্রায় শায়িত রহিল, কত শত শত ভক্তকুল মনির সর্পের মত হারানো মনির শোকে

প্রাণ হারাইতে উদ্যত হইল। জন-সমুদ্রে বিষাদ তরঙ্গ মালা তরঙ্গায়িত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই বিশাল শোকোদ্বেলিত অনিয়ন্ত্রিত জনসমুদ্র জমায়েতে মুরিদ ভক্ত কামেল বুজর্গানের বিপুল সমাবেশে পরদিন মঙ্গলবার দিবা শেষে আসর পাঁচটার পরে হযরত আকদসের সে পীর-ভাই ও ভক্তশ্রেষ্ঠ মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ মছিহুল্লাহ্ মির্জাপুরী সাহেবের এমামতিতে জানাযার নামায কার্য্য সমাপন হয়। মগরেবের নামাযের পূর্বে তাঁহার পবিত্র দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হয়।

মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি তোমার মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ তোমারই ফুল ক্ষেত্র।
কোলাহল পরিহারে, নির্জনতার আসরে,
তোমারই প্রতিক্ষায় রহিয়াছে আজি তোমারই বাসরে।

– শাহ্ সুফি মৌলানা দেলাওর হোসাইন রচিত

(সূত্র : জীবনী ও কেরামত পূর্বোক্ত)

এপিটাফ

হযরতের সানে মৌলানা জুলফিকার আলী সাহেবের নাতিয়া

হযরতের এই বেলায়েতী প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া চট্টগ্রাম মোহছেনীয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মরহুম মৌলানা জুলফিকার আলী সাহেব (চট্টগ্রাম গর্ভুমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল সামশুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমদ আই, ই, এস, সাহেবের পিতা) তাঁহার শানে নিম্নলিখিত নাতিয়া লিখিয়া তাঁহার প্রেম ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা–

از دم فیض غوث میجھنڈار ☆ شرقیان سالک اند وصاحب حال

تر بتش راز ہے اثر کہ فنزود ☆ در مزارات رونق واجلال

احمد اللہ شاہ سرور درویش ☆ غوث اعظم صفت شدش چوں وصال

অর্থ– গাউসে মাইজভাণ্ডারীর নিশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশীয় লোকেরা খোদাপন্থি, হাল ও জজ্‌বার অধিকারী হইয়াছে। তিনি কবরস্থ হওয়ার ফলে বিভিন্ন কবরে উজ্জ্বলতা ও জালালী–দেখা দিয়াছে। আহমদুল্লাহ্‌ যিনি, তিনি সমস্ত অলিদের সর্দার, যাঁহার সিফাত গাউসুল আযম।। ইত্যাদি ...

অশ্লীলতামুক্ত ভাবজনিত গীতি জগতে মাইজভাণ্ডারী সুর ও সুরধ্বনি

বাংলা-গীতি জগত হযরতের পূর্ব্বে খোদায়ী রসশূন্য ও নানা প্রকার অশ্লীলতা রসে পরিপূর্ণ ছিল। বাংলার প্রায় সর্ব্ব স্থানেই অশ্লীল প্রেমের পাপজনিত রঙ্গ-রহস্য পূর্ণ গান বাজনার প্রচলন ছিল। কামরিপু প্রবণ নাছুতী স্তরের মানব

স্বভাবতঃ কৃত্রিম প্রেমের বশবর্তী হইয়া নাট্য গান, গাজো গানে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে আমোদ প্রমোদ বিশিষ্ট বৈঠক গান, নাউট্যা পোলার নাচগান, যাত্রা পালা গান, থিয়েটার ইত্যাদি বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ফলে উহার প্রচলন ও কুফল এমত চরমে পৌঁছিয়া ছিল যে গর্ভ্নমেন্ট কর্তৃপক্ষের প্রবল আইনগত বাধা সত্ত্বেও উহা নিবারণ ও গতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর প্রভাবে এবং তাঁহার শুভ দৃষ্টি ও ফয়েজ রহমত বরিষণের ফলে বাংলার অশ্লীল কৃত্রিম প্রেমের গীতি জগত সম্পূর্ণ উহার বিপরীত রূপ ও গতি ধারণ করিল। হযরত এদেশীয় জনগণের “মাজাক” রুচি অনুযায়ী তাহাদের প্রিয় গান বাদ্যের ভিতর দিয়া এমত অকৃত্রিম খোদা প্রেম, রহস্যবাজীর প্রস্রবণ বহাইয়া দিলেন, এমন খোদা প্রেমিক সঙ্গীত বিশারদ গায়ক, গান, গজল নাতীয়া রসমের পত্তন করিলেন, যাহার ফলে বাংলা গীতি জগত, আল্লাহ্, রাসুল ও আউলিয়ার প্রেমের লহরী তুলিয়া প্রেম রসে খোদা স্মরণে মত্ত হইতে বাধ্য হইল। ভক্ত প্রবৃন্ধ সুর সঙ্গীত বিশারদ আলাউদ্দিন, সঙ্গীত বিশারদ আফতাব উদ্দিন, রায়হান, ঈশান, মনমোহন, বিজয় দাস, রায় ভবন, শিষ্য প্রবর মৌলানা আবদুল হাদী, –আবদুল জব্বার, আবদুল্লাহ্, মৌলানা বজলুল করিম, মৌলানা ছৈয়দ মছাহাবুউদ্দিন, মৌলানা আমিনুল হক হারবাঙ্গীরী, কবি আবদুল হাকিম, কবি রমেশ বাবু ইত্যাদির প্রেম তরঙ্গ প্লাবিত গান গজল নাতীয়ার পুস্তকাদি হযরতের প্রভাবিত অবদানের অকাট্য নজির। হযরত বাংলার গান বাজনাকে নির্দোষভাবে রূপায়িত করিয়া খোদার প্রেম প্রেরণা জাগরণের রুচিপূর্ণ কৌশল ও যুগ উপযোগী জিকিরী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে সম্মতি দানে উহার গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন। তরিকত পন্থি খোদা প্রেমিকজন মাহফিলে পবিত্র গান গজল নাতীয়া বাদ্যসহ ব্যবহারে প্রেম জাগরিত বিভোর চিত্ত জজ্‌বা হালে হালকা জিকির ও অজদ পদ্ধতি একমাত্র গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত সাহেব কেবলারই অবদান।

এমতভাবে হযরত, রিপুজনিত স্বভাব ও আচরণ উৎস, অন্যজ্ঞান মানবতা বিরোধী বিশ্বে প্রচলিত রীতি নীতির ধ্বংস কারী, খোদা-দাদ পদ্ধতীর পরিপন্থি এবং একত্ব ও উন্নত পথের সহায়ক বহু অবদান বিশ্ববাসীর সম্মুখে আয়না সদৃশ্য বিদ্যমান রাখিয়াছেন। যাহা অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত মানব জগতে আদর্শ হিসাবে

সুরক্ষিত ও কার্যকরী থাকিবে। যাহার সুফল আহরণে মানব খোদার নৈকট্য ও চির শান্তি ভোগে আবহমান খোদার কৃতজ্ঞতা ও যশগীতি গাহিতে থাকিবে।"

এখানে নিবিড়ভাবে লক্ষ্যণীয় যে; হযরত খাজা বাবা, কবি আমীর খসরু (র.) প্রমুখের পর পরিকল্পিতভাবে কলুষতামুক্ত গীত-গজল রচনা ও সমবেতভাবে, সুরুচিপূর্ণ আবহে পরিবেশনার ঐতিহ্য মাইজভাণ্ডার শরিফেই দর্শনীয় প্রভাব বিস্তারকারী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম রূপে সূচিত হয়েছে, যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিকভাবে গৃহীত, আদৃত ও অনুসৃত হয়ে আসছে। বাংলা গানের জগতে এটা এক অতুলনীয় সংযোজন। এই সঙ্গীত-সড়ক ধরে মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটতে যা এখনো অব্যাহত এবং ভবিষ্যতে বহু শাখা-প্রশাখা-ফুলে-ফসলে সমৃদ্ধতর হতে থাকবে।

(সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত : পূর্বোক্ত)

হযরত আকদাসের বেলায়েত প্রাপ্ত প্রধান খলিফাদের নাম

দিকদিগান্তর হইতে তৃষ্ণাতুর পথিকের মত অগনিত ধর্মীয় মোজাহেদ আলেমগণ খোদা অন্বেষণ পথে খোদায়ী প্রেম প্রেরণাসুধা অর্জনে ভুবনব্যাপী মহাসাগররূপী বিশ্বগাউস হযরত সকাশে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ধাইয়া আসিতে লাগিলেন এবং হযরত তাঁহার প্রেম জোয়ারে ভক্ত-অনুরক্ত মোজাহেদ আলেম বাহিনীকে প্লাবিত ও দেশ দেশান্তরে প্রসারিত করিয়া বিশ্বসৃষ্টির তৃষ্ণানিবারণে বিশ্বকে প্রেম উম্মাদনায় সজীব করিয়া তুলিতে লাগিলেন। কত নির্জন অরণ্যে তিনি বাজার বসাইলেন, কত নির্ধনকে ধনী করিলেন, কত মানহীনে সম্মানীত করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

তাঁহার পবিত্র করুণা ধারা অর্জনে যাহারা ধনী হইয়া খোদা অন্বেষণে অলিআল্লাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার খেলাফত (প্রতিনিধিত্ব) অর্জন করিয়া সুপরিচিত “হাদীয়ে কামেল” হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান করা কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। সংগৃহীত তথ্যগুলিও এই সাধারণ ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই নমুনা স্বরূপ কয়েক জন সুপরিচিত স্মৃতিধারী অলি আল্লাহের পবিত্র নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি অছিয়র রহমান ছাহেব (র.), চরণ দ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
(২) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি কাজী আছদ আলী ছাহেব (র.), আহল্লা মৌজা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
(৩) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল আজিজ ছাহেব (র.), খিতাবচর, চট্টগ্রাম।
(৪) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি আমিরুজ্জমান ছাহেব (র.), পটিয়া-চট্টগ্রাম।
(৫) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি আবদুর রজ্জাক ছাহেব প্রকাশ হাকিম শাহ (র.), সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

(৬) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আমিনুল হক হারবাঙ্গিরী (র.), চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(৭) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি মজিবুল্লাহ ছাহেব (ক.), রাউজান, চট্টগ্রাম।

(৮) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি খলিলুর রহমান ছাহেব (র.), রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

(৯) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি রাহাতুল্লাহ ছাহেব (র.), রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

(১০) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি মোহছেন আলী (র.), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

(১১) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আমানুল্লাহ (র.), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

(১২) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি ফরিদুজ্জমান, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

(১৩) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আফাজুদ্দিন (র.), কালারমার ছড়া, মহেশখালী।

(১৪) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল আজিজ (র.) [মণ্ডল], আরকান, বার্মা।

(১৫) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি মিঞা হোসাইন (র.), খেনুদি, বার্মা।

(১৬) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল হামিদ (র.), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

(১৭) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল আজিজ (র.), সোনাপুর, নোয়াখালী।

(১৮) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল আজিজ (র.), কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।

(১৯) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি রেজওয়ান উদ্দিন (র.), সাহ নগর, চট্টগ্রাম।

(২০) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি মহব্বত আলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

(২১) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি রহিম উল্লাহ্ (র.), রাউজান, চট্টগ্রাম।

(২২) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি হাফেজ ক্বারী মোহাদ্দেছ সৈয়দ তফাজুল হোসাইন ছাহেব (র.), মির্জাপুর, চট্টগ্রাম।

(২৩) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি মুফ্তী সৈয়দ আমিনুল হক (র.), ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

(২৪) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি করিমবক্স প্রকাশ বজলুল করিম (র.), মন্দকিনী, চট্টগ্রাম।

(২৫) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ইফ্সুফ আলী ছাহেব (র.), হাওলা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(২৬) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল কুদ্দুচ (র.), হাওলা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

(২৭) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি এয়াকুব গাজী (র.), শ্রীপুর, নোয়াখালী।

(২৮) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি নজির আহাম্মদ প্রকাশ নজির শাহ্ (র.), সীতাকুণ্ড, মাজার-ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।

(২৯) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি হাছি মিঞা (র.), চাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

(৩০) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি এবাদুল্লাহ শাহ্ (র.), হারবাঙ্গ চকরিয়া, চট্টগ্রাম।

(৩১) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি জাফর আহাম্মদ প্রকাশ মামু ফকীর (র.), রেঙ্গুন, বার্মা।

(৩২) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি বাচা মিঞা ফকীর (র.), কাউখালী রাঙ্গুনীয়া চট্টগ্রাম।

(৩৩) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি বাচা শাহ (র.) ফতেহপুর, হাটহাজারী।

(৩৪) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি শাহ ওয়ালী মস্তান (র.), পার্বত্য চট্টগ্রাম।

(৩৫) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল আজিজ (র.), আজিম নগর, চট্টগ্রাম।

(৩৬) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি আবদুর রহমান ছাহেব (র.), ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

(৩৭) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি আবদুল জলিল প্রকাশ বালুশাহ, (র.), ছাদেক নগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

(৩৮) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি পানীশাহ (র.), ছাদেক নগর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

(৩৯) জনাব মৌলভী শাহ ছুফী মতিয়র রহমান শাহ (র.), পূর্ব ফরহাদাবাদ, চট্টগ্রাম।

(৪০) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি এয়াকুব নূরী (র.), নোয়াখালী।

(৪১) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল আজিজ (র.), কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী।

(৪২) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আসরাফ আলী (র.), দুখাইয়া, চান্দপুর।

(৪৩) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল আজিজ (র.), ফেনী, নোয়াখালী।

(৪৪) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি আলী আজম (র.) মণ্ডল, নোয়াখালী।

(৪৫) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল গফুর প্রকাশ কম্বলী শাহ্ (র.), মোহনপুর, ফরিদপুর।

(৪৬) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি গোলাম রহমান (র.), বরিশাল।

(৪৭) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল হাদী (র.), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।

(৪৮) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুল গণি (র.), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।

(৪৯) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি আবদুচ্ছালাম (র.), কাঞ্চনপুর, চট্টগ্রাম।

(৫০) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক ফানীফিল্লাহ, নিজপুত্র, মাইজভাণ্ডার।

(৫১) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল, নিজ ভ্রাতুস্পুত্র, মাইজভাণ্ডার।

(৫২) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি কুতবে রব্বানী মাহবুবে ছোবহানী গাউসুল আযম বিল বেরাছত সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.), নিজ ভ্রাতুস্পুত্র।

যাহারা হযরত আকদাস হইতে ফয়েজ এর্শাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার খলিফায়ে আজম জনাব "বাবাজান কেবলা হযরত মৌলানা শাহ্ সুফি গাউছল আজম বিল বেরাছত সৈয়দ গোলাম রহমান (ক.)-এর সাহচর্য্যতায় পূর্ণ কামালিয়ত অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি রজব আলী (র.), সাকরাপুর, কুমিল্লা।

(২) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি জমিরুদ্দিন (র.), তিশনা, কুমিল্লা।

(৩) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি সিরাজুল হক (র.), নোয়াপাড়া, চট্টগ্রাম।

(৪) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি অলিউল্লাহ সাহেব (র.), রাজাপুর, কুমিল্লা।

(৫) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি নূর বক্স সাহেব (র.), গোয়ালিয়া, নোয়াখালী।

(৬) জনাব মৌলানা শাহ্ সুফি মোহাম্মদ হোসাইন, ঢাকা।

(৭) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি আমিনুল্লাহ সাহেব, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

(৮) জনাব মৌলভী শাহ্ সুফি আবদুল্লাহ সাহেব, বাঁশখালী।

সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত, পৃঃ ১১৬-১১৯,
আলোকধারা বুকস, চট্টগ্রাম, ২০২১ ইং

হযরত আকদছের তরিকত পরিচয়

সজরায়ে আহম্মদীয়া কাদেরীয়া গাউছিয়া

"বিছ্‌মিল্লাহির রাহমানির রহীম"

আল্লাহুম্মা ছল্লেআলা সৈয়দনা মৌলানা মোহাম্মদিন ও আলেহি ওয়াছাহাবেহি ওআলে এর্শাদেহি গাউসুল আযম মহিউদ্দিন সৈয়দ আবদুল কাদের ওয়া গাউসুল আযম সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্‌ মায়দনিজ্জোদে ওয়াল করম। ওয়ালেহি ওয়াছাহাবেহি ওয়া জমিয়ে খোলাফায়ে তরিকতেহি ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লেম।

(১) এলাহী বহুরমতে রহমতুললীল আলমীন, রাহতুল আশেকীন মুরাদুল মোশতাকীন, শফিউল মজনাবিন, খাতেমুন্নবীঈন, সৈয়দুল আম্বিয়া, ওয়া আউলিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মোজতবা ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ওআলা আলেহি ওয়া আছহাবেহি ও আহলে বায়তেহি ওছল্লেমা তছলিমান কাছিরান;

(২) এলাহী বহুরমতে আছাদিল্লাহিল গালেব আমিরুল মোমেনীন আলী ইবনে আবী তালেব (ক.),

(৩) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুস্‌শোহাদা হযরত এমাম হোসাইন (রা.),

(৪) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুছ্‌ছালেকীন হযরত সৈয়দ জয়নাল আবেদীন (রা.),

(৫) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুল ওয়াছেলীন হযরত এমাম মোহাম্মদ বাকের (রা.),

(৬) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুল কামেলীন হযরত এমাম জাফর ছাদেক (রা.),

(৭) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুল আলম হযরত এমাম মুছা কাজেম (রা.),

(৮) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুছ্ ছাকলাইন হযরত এমাম আলী ইবনে মুছা রেজা (রা.),

(৯) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুল ওয়াছেলীন হযরত শেখ মারুফ কুরখী (ক.),

(১০) এলাহী বহুরমতে ছোলতানুল মাহবুবীন হযরত ছের্রে ছক্‌তী (ক.),

(১১) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুল আছফীয়া হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (ক.),

(১২) এলাহী বহুরমতে ছোলতানুল আউলিয়া হযরত আবুবকর শিবলী (ক.),

(১৩) এলাহী বহুরমতে মাহবুবছ্ ছালেকীন হযরত শেখ আবদুল আজিজ তমিমী (ক.),

(১৪) এলাহী বহুরমতে এমামুল কামেলীন হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ তমিমী (ক.),

(১৫) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুল আউলিয়া হযরত মৌলানা আবুল ফরহা ইউছুপ তরতুছী (ক.),

(১৬) এলাহী বহুরমতে সৈয়দু-চ্ছাকলাইন হযরত মৌলানা আবুল হাছান কোরাইশী (ক.),

(১৭) এলাহী বহুরমতে শেখুশ্ শউল হযরত আবুছায়িদ মখজুমী (ক.),

(১৮) এলাহী বহুরমতে কুতুবুল আলম গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (ক.),

(১৯) এলাহী বহুরমতে সোলতানুল আরেফীন হযরত শাহাবুদ্দিন ছরওয়ার্দি (ক.),

(২০) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুল আরেফীন হযরত নেজামুদ্দিন গজনবী (ক.),

(২১) এলাহী বহুরমতে হযরত ছুফিউল আছফীয়া সৈয়দ মোবারক গজনবী (ক.),

(২২) এলাহী বহুরমতে হাদীউল আশেকীন হযরত ছুফী নজমুদ্দিন গজনবী (ক.),

(২৩) এলাহী বহুরমতে সোলতানুল মাহবুবীন হযরত ছুফী কুতুবুদ্দিন রওশন জমির (ক.),

(২৪) এলাহী বহুরমতে হাদী এলাল্লাহ হযরত ছুফী ফজলুল্লাহ (ক.),

(২৫) এলাহী বহুরমতে জোবদাতুল কামেলীন হযরত সৈয়দ মাহমুদ (ক.),

(২৬) এলাহী বহুরমতে সোলতানুল মোকাররেবিন হযরত নছিরুদ্দিন (ক.),

(২৭) এলাহী বহুরমতে এমামুল মোশায়েখ হযরত ছুফী তফিউদ্দিন (ক.),

(২৮) এলাহী বহুরমতে মকছুদুত্তালেবীন হযরত ছুফী নেজামুদ্দিন (ক.),

(২৯) এলাহী বহুরমতে সৈয়দুল আরেফীন হযরত সৈয়দ আহালুল্লাহ (ক.),

(৩০) কোদওয়াতুচ্ছালেকীন হযরত সৈয়দ জাফর হোসাইনী (ক.),

(৩১) এলাহী বহুরমতে মতলুবুত্তালেবীন হযরত ছুফি খলিলুদ্দিন (ক.),

(৩২) এলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব হযরত মৌলানা মোহাম্মদ মোনায়েম (ক.),

(৩৩) এলাহী বহুরমতে এমাম হাইউল কায়েম হযরত ছুফী মোহাম্মদ দায়েম (ক.),

(৩৪) এলাহি বহুরমতে মোতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ হযরত ছুফী আহম্মদ উল্লাহ্ (ক.),

(৩৫) এলাহী বহুরমতে হাদী এলাল্লাহ হযরত হাজী ছুফী লকিয়ত উল্লাহ্ (ক.),

(৩৬) এলাহী বহুরমতে হাজীউল হারমাইন গাউছে জমান হযরত ছুফী সৈয়দ মোহাম্মদ ছালেহ লাহোরী (ক.)

(৩৭) এলাহী বহুরমতে কুতবুল আফখম গাউসুল আযম সোলতানুল আরেফীন রুহুল আশেকীন মুরাদুল মোশতাকীন খাতেমুল আউলিয়া হযরত মৌলানা সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ (ক.) খোদাওন্দা বহককে হাজেহিল আছমা, পুরাকর মেরে দিলকী আরমা।

সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত, পৃঃ ২৬৪-২৬৬,
আলোকধারা বুকস, চট্টগ্রাম, ২০২১ ইং

টীকাঃ

১. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত : চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

২. ইবিড, নবম পরিচ্ছেদ।

৩. দিল্লীর বাইশ খাজা : ড. জহুরুল হাসান শারেব, বঙ্গানুবাদ : এম. আনোয়ার তালুকদার (এম, এফ), সঞ্জরী পাবলিকেশন, শাখা জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লাহ্, চট্টগ্রাম, ২০০৯ ইং।

৪. জীবনী ও কেরামত

৫. টীকা ১, দশম পরিচ্ছেদ

৬. ইবিড

৭. ইবিড

৮. ইবিড

৯. ইবিড

১০. ইবিড

১১. হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর (একমাত্র কন্যা) তোতা ময়না: রফিক আনোয়ার, ২০০৮ইং, আবির প্রকাশন, চট্টগ্রাম।

১২. জীবনী ও কেরামত : দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

১৩. ইবিড

১৪. ইবিড

১৫. ইবিড

১৬. ইবিড

১৭. 'অলৌকিক'-এর পরিবের্তে "অতিলৌকিক" বলাই বেহতর, কারণ কারামত হিসেবে যা বহিঃপ্রকাশিত হয়, তা ব্যক্তির মানবীয় বা লোকসত্তা থেকেই উৎসারিত হয়।

১৮. জীবনী ও কেরামত, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

১৯. নিবেদিত কবিতাংশে তোফায়েল আহমদ নইয়র এর উর্দু কবিতা দ্রষ্টব্য।

২০. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী [একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা] আলোকধারা বুক্স দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০২৩ইং।

২১. জীবনী ও কেরামত, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশেষ নোটঃ

বিশ্বময় তাসাওউফসহ দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন স্তরে নিত্য ব্যবহৃত কতিপয় আরবি-ফার্সি পরিভাষার বাংলা অর্থ

কুরবে ইলাহীঃ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়া। **ফানাঃ** লয়প্রাপ্ত হওয়া। **ইমামে রব্বানীঃ** আল্লাহ্‌র দীন ও মা'রিফাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। **কুদ্‌ওয়াতুল আরেফীনঃ** অলীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। **তছলীমঃ** জাহের ও বাতেনকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সোপর্দ করিয়া আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সর্ব অবস্থায় খুশি থাকা। **তাওয়াজ্জুহ্ বা একাঃ** পীরের কাল্ব প্রভৃতি হইতে মুরীদের কাল্ব প্রভৃতির মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির ও মুহব্বত পৌঁছান। **রেযাঃ** দুঃখকষ্টকে সানন্দে বরণ ও কষ্টে পেরেশান না হওয়া। **নিয়াজমান্দীঃ** দীনতা হীনতা। **মুহাক্কিকঃ** বিচক্ষণ। **মুছান্নেফঃ** গ্রন্থ্‌কার। **তাহ্‌তাসারাঃ** যমীনের নিম্নস্তর। **এনায়েতঃ** দান। **হালাত ও কাইফিয়তঃ** অবস্থা। **মোরাকাবাঃ** যিকির করার পর আল্লাহ্ তরফ হইতে ফয়েযের প্রতীক্ষা করা। **কুত্‌বঃ** অলীগণের মধ্যে কুত্‌বের শান সবচেয়ে উঁচু। রূহানী জগতে প্রত্যেক কাজের ব্যবস্থাপনা তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। **আবদালঃ** ঐ সমস্ত অলী যাঁহাদের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বকে কায়েম রাখেন। তাঁহারা সব সময় সংখ্যায় ৭০ জন করিয়া থাকেন। **আওতাদঃ** দুনিয়ার চারিপাশে অবস্থানকারী চারিজন অলী। **গাওসঃ** সমস্ত কুত্‌বের সর্দারের ডান ও বামে দুইজন গাওস থাকেন। ফরিয়াদ পৌঁছান কাজ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। **নুজাবা (একবচন-নজীব)** সমস্ত বিশ্বে কর্মরত ৭ জন অলী। **নুকাবা (একবচন : নক্বীব)** তাঁহারা আল্লাহ্‌র অলী। বিশ্বে তাঁহাদের সংখ্যা তিনশত। **ইলমে লাদুন্নীঃ** যে ইলম কোন ওয়াসিলা ব্যতিরেকে মাবূদা এ-ফাইয়ায অর্থাৎ আল্লাহ্ নিকট হইতে লাভ হয়। **আহলে বাইতঃ**

রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধর। **ইরশাদঃ** শিক্ষা ও উপদেশ। **বর্গুজিদাঃ** মনোনীত। **উলুল আযম পয়গাম্বরঃ** বড়দর্জার পয়গাম্বর। **নিস্‌বতে ফরদিয়তঃ** ইহা তরীকতের একটি মাকাম ও উরুযের শেষ ধাপ। সুন্নতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসরণের ফলে ইহা লাভ হয় এবং সমস্ত বিশ্বে এরূপ হাস্তী সংখ্যায় তিনজন থাকেন। তাঁহারা কুত্‌বের আওতা বহির্ভূত। **ফয়েযঃ** নূরের প্রবাহ। **বেখুদীঃ** অচৈতন্য।

তৃতীয় ভাগ

(কবিতা-গজল পুষ্পাঞ্জলি :
মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের সূচনাপর্ব)

হযরতের শানে মহান সাধক কবিদের শব্দ ও কবিতা পুষ্পাঞ্জলি

১. এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বহুত্ববাদী সমাজ বিনির্মাণের ঊনবিংশ/বিংশ শতকীয় প্রভাবশালী নৈতিক-আধ্যাত্মিক-সামাজিক-ধর্মীয় প্রভাবশালী মহান-ওলী আল্লাহ্ শাহ্ সুফি হযরত গাউসুল আযম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অধ্যাত্ম জীবন ও নির্বিলাস জীবন-যাপনকে অবলম্বন করে তাঁর ভক্ত-অনুরাগী, বিদ্বজ্জন-সাধকরা সারগর্ভ কবিতা, গজল, কাওয়ালী রচনায় প্রবৃত্ত হন। কাব্য বিচারের মানদণ্ডে অতীব সুন্দর, ছন্দোময়, সুরমায়, ভাবোদ্দীপক এসব গীত-গজল-কাওয়ালী চট্টগ্রাম তথা বাংলা মুল্লুকের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। মাইজভাণ্ডারী ভক্তবৃন্দরা নিজ নিজ এলাকায় 'দায়রা শরিফ' গড়ে তুলেন। প্রতি সপ্তাহে সাধারণতঃ বুধবার, বৃহস্পতিবার রাতে এশার নামাযের পর ঢোলক, একতারা, দোতারা, খঞ্জনীসহকারে নিজেদের পছন্দমত এসব সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। অতঃপর নৈশকালীন আহার্যগ্রহণ করে নিদ্রাগত হতেন এবং আবার ফযরের আযানের পূর্ব ধলপহরকালে গাত্রোত্থান করে অযু গোসল সেরে দৈনন্দিন জীবিকা অর্জন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন। মাইজভাণ্ডারী দায়রা শরিফের স্বেচ্ছাভুক্ত সদস্য ভক্তবৃন্দের সেই শুভ্র-স্নিগ্ধ-পবিত্র পরিবেশ ও আচরণ বাঙালি আটপৌরে জীবনাচারের এক পুষ্পগন্ধময় অধ্যায়ও বটে। এই ধারা এখনো সচল বটে।

মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের সূত্রপাত এভাবে ভোরের বাতাসের মতো স্নিগ্ধতরঙ্গে বিস্তার লাভ করতে থাকে প্রথমতঃ গজল, কাওয়ালীর তরণীতে ভেসে। এর সাথে অনতিবিলম্বে যুক্ত হয় দার্শনিক, মারফতি, তত্ত্বসমৃদ্ধ উঁচুদরের গ্রন্থাবলী। সুফি সাধক আবদুল হাদি কাঞ্চনপুরী, মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী, মওলানা

বজলুল করিম মন্দাকিনী, কবিয়াল রমেশ শীল, মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী, অছিয়ে গাউসুল আযম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রমুখ বিদগ্ধ সৃজনশীল মহাত্মাদের চিন্তা ও রচনায় বিস্তার ঘটতে থাকে মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের। রচিত হতে থাকে বাংলা, উর্দু, ফার্সি, আরবি, ইংরেজি ভাষায় বহুবিধ গ্রন্থ। বাংলা মুল্লুকের বাইরেও স্থাপিত হতে থাকে মাইজভাণ্ডারী দায়রা শরিফ। গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সঙ্গীত, মারেফত ও দর্শন চর্চা সংগঠন। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা পর্যায়ে শুধু নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এসব সংগঠনের বিস্তার ঘটতে থাকে এবং উচ্চ শিক্ষিত, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, মারেফাত বিজ্ঞানে শাণিত পরিশীলিত শিক্ষাবিদগণ অব্যাহতভাবে সংযুক্ত হতে থাকেন মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের ক্রমপ্রসারমান প্রবালদ্বীপে। মাইজভাণ্ডারী গীত-গজল তথা সঙ্গীত প্রবাহ এই অঞ্চলে হাল্কা, নাচ-গান, অশ্লীল বিনোদন ও ভোগ-আনন্দ প্রবৃত্তিকে রুখে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ভাগের 'এপিটাফ' শীর্ষক অংশে অছিয়ে গাউসুল আযমের অর্থপূর্ণ বিবরণ ও অভিমত দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য অংশে বিজ্ঞ পাঠক ও ভক্তবৃন্দ সমীপে মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের সূচনা ও বিকাশ পর্বের কিছু বিবরণ, উপাদান, উপকরণ নিবেদন করা হলো। অবশ্য অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে উল্লেখ ও স্বীকার করতে হয় যে, মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের বহুবৃক্ষশোভিত বাগান সৃজনের প্রথম উদ্যোক্তা ও বাগবান অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর রচিত দর্শনগ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্লাকা' এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থে বিগত বিংশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ বর্ণিত ও বিশ্লেষিত তথ্যাবলীই এই অংশে সন্নিবেশিত বিষয়াদির প্রাথমিক ও মৌলিক উৎস। বিবরণ বা বয়ানের অপরিবর্তিত মৌলিকতা রক্ষার তাগিদে ক্ষেত্র বিশেষে এই পুস্তকসহ অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী ও পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতির সহায়তাও গ্রহণ করা হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য যে, মাইজভাণ্ডারী ধারার গীতিকবিতা-গজল প্রভৃতিতে ক্ষেত্র বিশেষে চট্টগ্রামী আঞ্চলিক শব্দের সুনিপুণ ও শ্রুতিমধুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রামের বাইরের গীতি গজল রচয়িতারাও তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের শব্দের ছন্দোময় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, যা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বর্তমান বাংলা

ভাষার খাস পূর্ববঙ্গীয় আদল ধারণ করে। লালন সাঁইয়ের গানেও শুধু স্থানীয় নয়, ভাটি ও উত্তরাঞ্চলীয় বাংলা বুলির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত। লালনগীতি, মাইজভাণ্ডারী গীত-গজল এবং একইভাবে বাংলাদেশ-এর অন্যান্য অধ্যাত্ম-দরবারের ভক্ত-আশেকদের রচিত গান, সাহিত্যে পূর্ববঙ্গীয় বাংলা শব্দ যেন অমর দুর্বা ঘাসের মতো মাথা তুলে আছে, শত পদপোষণেও যা নিশ্চিহ্ন হয় না। পাশ্চাত্য উপনিবেশিক পোষকতায় গড়ে উঠা শহুরে যান্ত্রিক বাংলার শব্দাবলী প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গীয় মাটি ও মানুষ ঘনিষ্ঠ শব্দ ভাণ্ডারের কাছে বহুলাংশে কৃত্রিম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মাইজভাণ্ডারী তথা পূর্ববঙ্গীয় মারেফতি সাহিত্য খাস বাংলা বুলির অবাধ চারণ ও বিচরণ ক্ষেত্র বটে।

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জবানীতে মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য উদ্যানের উদ্গম প্রসঙ্গ

॥ এক ॥

"তাঁহার সমসাময়িক সুধীবৃন্দ ও পরবর্তী খ্যাতনামা লোকেরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ও নানাভাবে তাঁহার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোদৃত বিষয়াদির প্রতি অবলোকন করিলে তাঁহাকে জানার ও বুঝার ব্যাপারে অনেক সাহায্য হইবে বলিয়া আশা করি।

কলিকাতা নিবাসী শামসুল ওলামা মওলানা জুলফিকার আলী সাহেব চট্টগ্রাম মোহছেনীয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শামসুল ওলামা কামালুদ্দীন আহ্মদ এম, এ, (লণ্ডন) সাহেবের পিতা হন। তিনি হজরতের ওফাতের পর তাঁহার শানে পাথর ফলকে খোদিত যে একখানা হস্তলিপি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হজরতের মাজার শরীফের দরজার উপরিভাগে "মেহরাবে" লাগানো আছে। তাহাতে ফারসী ভাষায় লিখা আছে ঃ–

গাউসে মাইজভাণ্ডারের নিশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশবাসীরা আল্লাহ্ পন্থী ও সাহেবে হাল্ জজ্বার অধিকারী হন, অর্থাৎ দেহ ও প্রাণের সহিত খোদা-প্রেম পরিব্যাপ্ত মানব প্রকৃতি জজবহাল অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মাজারে পাকের বরকতে যে তা'ছির, মাটিস্থ বুজর্গানের এই দেশীয় কবরের মধ্যে জালালী ও উজ্জ্বলতা বা রওনক আনিয়া দিয়াছে।

সর্দারে আওলীয়া হজরত আহ্মদ উল্লাহ শাহ্ যাঁহার সিফত বা উপাধি গাউসুল আযম, তাঁহার ওফাত তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জুলফিকার এক প্রকার প্রাণস্পর্শী বাণী শুনিল।

বিশ আর সাত ছিল জিলকদ চাঁদের রাতে ঃ
তেরশত তেইশ শতাব্দী হয় হিজরী সন মতে।।

শেষ পর্য্যন্ত খোদার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ, পূর্ণভাবে তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর বর্ষিত হউক।

॥ দুই ॥

মৌলভী আয়ুব আলীর অপূর্ব কবিতা

মোফাচ্ছেরে কোরআন (কোরআন শরিফের বাংলা অনুবাদকারী) ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের অন্তর্গত ধলই নিবাসী ভূতপূর্ব সাবরেজিষ্ট্রার ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মৌলবী আছুব আলী সাহেবের ৭/১/২৮ ইং তারিখের লিখিত "হযরত গাউসুল আযম শাহ্ আহ্মদ উল্লাহ সাহেব, চট্টগ্রাম" নামক কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ–

হ–হয়েছে উজ্জ্বল ধরা কিরণে তোমার।
জ–জয়কেতু উড়ে তব আকাশে আবার।।
র–রহিবে তোমার নাম এই নশ্বর ভবে।
ত–তপন বিমান দেশে যতদিন রবে।।
গ–গগনে উঠিয়া কভু যদিও মিহির।
উ–উজ্জ্বলিত করে ধরা বিনাশে তিমির।।
ছ–ছলবল পূর্ণ কিন্তু বিশাল সংসার।
ল–লভিয়াছে নিত্য জ্যোতিঃ প্রভাবে তোমার।।

আ–আশা-সবে মানুষের ফুল্ল ইন্দিবর।
জ–জয়গান করে তব কত মধুকর।।
ম–মধুকর মধু লোভে করয় গুঞ্জন।
সা–সাধুগণ সাধে গায় তোমার গায়ন।।
হ–হজ্জব্রত নিরাপদ নগরে যেমন।
মা–মাঘ দশে তব দ্বারে মহা সম্মিলন।।
আ–"আহাদ ছমদ" নাম ছুরা এখলাছে।
হা–হাসী হাসী পশে মীম আহাদে হরষে।।

ম-মনো ভিষ্ট হল পূর্ণ মীমের তখন।
দ–দরশনে আহ্‌মদ্ আহাদ গোপন।।
উ–উজ্জ্বলিত হৃদাগার তাহার নিশ্চয়।
ল–লয় যেবা বিভূনাম নিত্য মধুময়।।
লা–লাহুত সাগরে মগ্ন ক্রমে সেই জন।
হ–হর্ষ মনে রবি শশী করয় দর্শন।।
সা–সাধনা কামনা ফলে পুরে মনোরথ।
হে–হেরেছ "নজম সূরা" "শমস" অবিরত।।
ব–বশীভূত ষড় রিপু করিবে যখন।
অন্বেষণে সখা সনে তোমার মিলন।।

চ–চয়ন করেছি ফুল স্বর্গীয় কাননে।
টলমল পরিমল আশ্চর্য্য দর্শনে।।
ট–টলিবে মুনির মন হেরী নব হার।
গ–গগনের মাঝে যথা নক্ষত্র প্রচার।।
রা–রাত্রে শুধু তারা রাজি হয় বিভাসিত।
ম–মম মালা দিবা নিশি রবে উজ্জ্বলিত।।

(সূত্রঃ বেলায়তে মোত্‌লাকা, পৃঃ ৪৫-৪৬ আলোকধারা বুক্‌স চট্টগ্রাম ২০২১ ইং)

॥ তিন ॥

আজ তোফায়েল আহমদ নাইয়র রেঙ্গুনি

[মনঞ্জুস ছন্দে রচিত কাওয়ালী]
আজ তোফায়েল আহমদ নাইয়র রেঙ্গুনি।।
ইউঁ রক্বম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা,
ওয়াকেয়া হে এক মুরিদে বা ছাফা কিরদারকা।
এক মুরিদ উনকা থ্বা বিলকুল মুফলিছ ও বেকছ গরীব,
ওয়হ্ লাকড়হারে কা পেশা কর রহা থ্বা বদ নছিব।
হোথি যাতি থ্বি ফানা ফিশ শে'খ কি মনজিল ক্বরিব।

এত্তেফাকান পেশ আয়া ওয়াকেয়া ইয়েহি কেয়া আজিব,
দমবদম উছকো সাতানে লাগ গেয়ি ইয়াদে হাবিব।
দিল মেঁ পয়দা শওক্ব থ্বা জো পীরকে দিদার কা,
ইউঁ রক্বম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা।
ঘর মেঁ উছ বেকছকে গো দো ওয়াকৎকা খানা না থ্বা,
তরক্ শওক্ব দীদ করতা ফির ভী ওয়হ্ এয়ছা না থ্বা।
এনতেহায়ি গমকা প্যায়কর ছুরতে দিওয়ানা থ্বা।
পীরকি খেদমতকে লায়েক কয়ি নজরানা না থ্বা।
যর না থ্বা দৌলত না থ্বি সামান শাহানা না থ্বা।
চল পড়া ঘর ছে ওয়হ্ লেকর নাম উছ করতারকা।
ইউঁ রক্বম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা।
না মোনাছিব রাস্তা ওয়হ্ কোহ্সারোঁ কে দরাড,
উচিঁ নিচিঁ কাহায়েয়াঁ ওয়হ্ দশত ও জঙ্গল ওয়হ্ ঝাঁড়।
যা রহা থ্বা ওয়ালেহানা ইছতরহা মাস্তানা ওয়ার।
আলআমান ওয়হ্ কোহ্ কা দামান ওহি রঙ্গ পাহাড়,
ওয়ায় কিছমত কি খারাবি,ওয়ায় কিছমত কি বিগাড়।
এক ভয়ানক সলসামান থ্বা,ওয়াদিয়ে পুরখার কা,
ইউঁ রক্বম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা।

কাটকর জঙ্গল ছে উছ মরদে খোদা নে লাকড়িয়াঁ,
বাঁধকর এক বোঝ্ লাদা হো গেয়া আখির রাওয়াঁ।
ছোঁচ থা যাতা থ্বা দিল হি দিলমে ওয়হ্ আশুফতাহ্ জান,
বেঁচকর ইন লাকড়িওঁ কো যো রক্বম মিলযায়ে এয়ান।
মৌল লোঙ্গা দুধ অওর আক্বা কো দোঙ্গা আরমগান।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ ইয়ে কলিজা মোমিনে নাদারকা,
ইউঁ রক্বম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা।
পছ্ ওয়হ্ আপনি দেহেন মেঁ থ্বা এখলাছ কা প্যায়কর রাওয়াঁ,
দফআতান এক শের নর আয়া তড়প কর নাগেহাঁ।
হুঁশ উছকে গুম হুয়ে পছ দেখতেহি ইয়ে সামান,
থ্বা করিব উছপর ওয়হ্ হামলা করদে বড়হ্কর বেগুমাঁন।

গাউসুল আজম আল মদদ কেহ্‌কর যব দেহান,
আঁছেরা উছকো মিলা ফৌরান শাহে ভাণ্ডার কা,
ইউঁ রক্কম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা।
দোছরি জানিব কা ছুনিয়ে হাল আব তো হুবহু,
গাউসুল আজম কর রহে থ্বে উছ ঘড়ি বেইঠে ওযু।
থ্বে মুরিদ বা ছাফা ঘিরে হুয়ে ওয়ান চার সু।
এক ব এক হযরত নে ফেঁকা আফতাবা ছুয়ে জো।
ছবকে ছব থ্বে দম বখোদ করতে না থ্বে কুচ গুফৎগু।
কেয়া পাতা কেয়া রাজ থ্বা ইছ হামিলে আসরার কা,
ইউঁ রক্কম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা।

আব ইধরকা হাল ছুনিয়ে ওয়হ্ মুরিদে বা ছাফা,
আল মদদ এয়া গাউসুল আজম কেহ্‌কে ওয়হ্ সাম্বালা জরা।
চাহ্‌তা থ্বা শের উছপর হামলা করদে বরমলা।
দফআতান এক আফতাবা উছকে মস্তক পর পড়া,
দেখতে হি দেখতে ওয়হ্ শের ঠান্ডা হো গেয়া।
হো গেয়া এজাজ জাহির উছ শাহে দ্বীনদার কা,
ইউঁ রক্কম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা।
উছ মুরিদে বা ছাফা নে আফতাবা লে লিয়া,
অওর ছুয়ে মনজিলে মকছুদ ফৌরান চল দিয়া।
অওর পহুঁছ কর কাহা ছুনায়া উছনে ছারা মাজরা।
মুছকুরাকর বোল উঠে গাউসুল আজম বা ছাফা,
জো মদদ মাঙ্গেগা মুঝছে দোঙ্গা উছকো বরমলা।
হাশর তক্ শেওয়া রহেগা ইয়ে মেরে সরকার কা,
ইউঁ রক্কম হে এক কারিশমা ওয়ালিয়ে ভাণ্ডারকা।।

[বাংলা অনুলিপি : সৈয়দ মোহাম্মদ আবু সালেহ্]

তোফায়েল আহমদ নাইয়র রেঙ্গুনি রচিত কাওয়ালীর বঙ্গানুবাদ

ভাণ্ডার মালিকের এক অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করছি এখন,
আর সেটি হল একনিষ্ঠ প্রভূ-ভক্তের প্রেমের নিদর্শন।
তাঁর এমন একজন ভক্ত ছিল যে অসহায়, নিঃস্ব, গরীব।
সে কাঠুরে ভক্তের কাহিনী বলছি আমি যে বদ নছিব।
হয়ে যেত পীরের অস্তিত্বে বিলিন, সিঁড়ি যার সন্নিকটে
এমতাবস্থায় ঘটে যায় এক অদ্ভুত দৃশ্য অকপটে।
প্রেমাস্পদের স্মরণে ব্যাকুল থাকত সে সর্বদা,
প্রিয়ার দর্শনে মিটিবে তার অন্তরের ক্ষুধা।

ভাণ্ডার মালিকের এক অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করছি এখন,
আর সেটি হল একনিষ্ঠ প্রভূ-ভক্তের প্রেমের নিদর্শন।
ঘরে নাই তার দু'বেলার অন্ন,
এদিকে প্রিয়ার দর্শনাশায় হৃদয় চূর্ণ।
অবশেষে মুর্শিদের সুরত অন্তরে করে ধারণ ঘর থেকে বের হয়।
পীরের খেদমতে যাওয়ার সামান যদি নছিব হয়।
না আছে দৌলত না আছে শোহরত তাতে কি আসে যায়,
ঐ মহান সত্তার নাম নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।
ভাণ্ডার মালিকের এক অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করছি এখন,
আর সেটি হল একনিষ্ঠ প্রভূ-ভক্তের প্রেমের নিদর্শন।
পাহাড়ের আকাঁ-বাঁকা ছিড়ে ধরা পথ আর ঘুটঘুটে অন্ধকার,
উঁচু নিচু পাহাড় আর চারদিকে ঝোপঝাড়।
সেই পথ ধরে মাস্তান চলছে অবিরাম,
রঙ বেরঙের পাহাড় সাথী, সাথে মাওলার নাম।
হতে পারে ভাগ্যের পরিবর্তন কিংবা ভাগ্যের পরিহাস,
সে যে নিদারুণ কষ্ট এক পাহাড়ির ভয়ানক ইতিহাস।

ভাণ্ডার মালিকের এক অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করছি এখন
আর সেটি হল একনিষ্ঠ প্রভূ-ভক্তের প্রেমের নিদর্শন।

জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বস্তাবন্দী করে দিল সে রওয়ানা।
প্রিয়ের দর্শন পাব মনে মনে ছিল এ বাসনা।
বাজারে বিক্রি করে টাকা যে হাতে আসবে,
দুধ কিনে তোহ্‌ফা দিতে পারব মুর্শিদ সমিপে।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ গরীব মুমিনের এই আশা করিও পূরণ,
ভাণ্ডার মালিকের এক অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করছি এখন।
সে পবিত্র আশা অন্তরে নিয়ে চলছে সে গন্তব্যের দিকে,
এমতাবস্থায় আচানক এক বাঘ সামনে এসে দিল পথ রুখে।
এ দৃশ্য দেখে তার চৈতন্য যে হারিয়ে যায়,
এই বুঝি আক্রমণ করবে ভয়ে, প্রাণ যে যায় যায়।
এয়া গাউসুল আযম বাঁচাও! বলিয়া দিল সে চিৎকার,

সাথে সাথে সাহায্য করল ভাণ্ডারের সরকার।
ভাণ্ডার মালিকের এক অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করছি এখন
আর সেটি হল একনিষ্ঠ প্রভূ-ভক্তের প্রেমের নিদর্শন।
অপরদিকের ঘটনা শুনুন গভীর মনোযোগ দিয়ে,
গাউসুল আযম সে সময় করছিলেন অযু বদনা নিয়ে।
চারদিকে ভক্ত মুরিদান তাঁর রয়েছে যে ঘিরে
হঠাৎ তিনি বদনা মারলেন কোনো একদিকে ছুঁড়ে।
নির্বাক চিত্তে ভক্ত মুরিদান একে অপরের পানে চায়,
হয়তো থাকতে পারে কোনো রাজ-রহস্য এতে লুকায়।

ভাণ্ডার মালিকের এক অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করছি এখন
আর সেটি হল একনিষ্ঠ প্রভূ-ভক্তের প্রেমের নিদর্শন।

এদিকে একনিষ্ট ভক্তের অবস্থা দেখুন দিব্যচোখে,
বাঘ বুঝি এখনি খেয়ে সাবার করবে তাকে।
এয়া গাউসুল আযম বাঁচাও! বলল সে যবে মুখে।
হঠাৎ একটি বদনা এসে পড়ল বাঘের মস্তকে।
সাথে সাথে বাঘের ক্ষোভ হয়ে গেল শীতল,
পথ ছেড়ে চলে যায় গভীর জঙ্গল।

সে সাথে এক অলৌকিকতার,
প্রকাশ হল মোত্তাকি বান্দার।
অবশেষে ভক্ত সে বদনা নিল আঁচল ভরে,
রওয়ানা দিল মূল গন্তব্য তথা গাউসের দরবারে।
উপস্থিত হয়ে সে সকল ঘটনার ইতিবৃত্ত করল প্রকাশ,
গাউসে পাক মুচকি হেঁসে তাকে দিল অভয়ের আশ্বাস।

যে কেহ চাইবে সাহায্য আমি তাকে করব উন্মুক্ত সাহায্য,
হাশর তক্ রবে জারী এ ধারা সকলের তরে অনিবার্য।
ভাণ্ডার মালিকের এক অভূতপূর্ব কাহিনীর বর্ণনা করছি এখন,
আর সেটি হল একনিষ্ঠ প্রভূ-ভক্তের প্রেমের নিদর্শন।।

[বাংলা ছন্দে রুপান্তরঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আবু সালেহ্]

॥ চার ॥

উকিল বাবুর প্রেরিত কলা রাখিয়া দুগ্ধ ফেরত
॥ মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস, চট্টগ্রাম কোর্ট ॥

ফটিকছড়ি থানা নাম অতি সুন্দর,
মাইজভাণ্ডার গ্রাম এক তাহার ভিতর।
শুভক্ষণে শুভযোগে দয়া করি আল্লাহ্,
সেই দেশে জন্মাইল শাহ্ আহমদুল্লাহ্।।
সুপণ্ডিত আরবীতে মুখস্ত কোরান,
ফকীর মৌলবী বলি বিস্তর সম্মান।
বাল্যাবধি স্বধর্ম্মতে ছিলেন নিষ্ঠাবান,
করিতেন জগতের সতত কল্যাণ।।
নিরপেক্ষ লোক তিনি প্রসিদ্ধ ফকীর,
মনুষ্য কুলেতে হন সকলের পীর।
মানবের উপকার করিবার তরে,
সতত প্রস্তুত ছিলেন প্রফুল্ল অন্তরে।।

নানা জিলা হতে লোক আসিয়া তথায়,
ইচ্ছামত কার্য্য লভে তাঁহার কৃপায়।
দেশ-দেশান্তরে আছে তাঁহার বড় নাম,
সর্ব্বলোক ঘোষে যশঃ কীর্তি অনিবার।।
লোকের মনের কথা জানিতেন তিনি,
নানা প্রকার গুণ ছিল অতি বড় জ্ঞানী।
ভোগ লিপ্‌সা নাহি ছিল তাঁহার অন্তরে,
খেতে দিতেন অতিথিরে নানা উপাচারে।।
তার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিষ্য সাগরিদ আছে,
তাঁর নাম নিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় সবার।
ফটিকছড়ির নববাবু উকিল সরকার,
জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠ ভাই হয় সম্পর্কে আমার।।
কার্যোপলক্ষে আমি সেই বাসায় ছিনু,
ফকিরের গুণ দেখি আশ্চর্য হইনু।
উকিলবাবুর এক গাভী প্রসবিল,
বহুদুগ্ধ গাভী হইতে পাইতে লাগিল।।
ভাগ্যক্রমে সেই সময় বাসাতে তাহার,
পাকিল কাবুলি কলা অতি চমৎকার।
তাহা দেখি নববাবু ভক্তির সহিতে,
দুগ্ধ কলা দিতে চাইলেন ফকীর বাড়িতে।।
কহিল মনের কথা কেরাণীর ঠাই,
অদ্যকার দুগ্ধ সব তথা দিতে চাই।
কেরাণী শুনিয়া তাহা মনে মনে ভাবে,
তিন সের দুগ্ধ নাহি ফকীর খাইবে।।
জনৈক বাহক দিয়া কলা দুই কান্দি,
একসের দুগ্ধ দিল ভাণ্ড মুখ বান্ধি।
ফকীরের কাছে গিয়া বাহক কহিল,
উকিল সরকার বাবু দ্রব্য পাঠাইল।।
"এত দুধ নাহি খায়" ফকির কহিয়া,
কলা রাখি দুগ্ধ সব দিলেন ফিরাইয়া।

বাহক ফেরত আসি করে নিবেদন,
দুগ্ধ সব ফকীর না করিল গ্রহণ।।
বলিলেন, ফকির এত দুগ্ধ নাহি খায়,
বুঝিতে না পারি তার কিবা অভিপ্রায়।
তদন্ত করিয়া জানি কেরাণীর কথা,
পরদিন পাঠাইল সবদুধ তথা।।
ফকীর সন্তুষ্ট হইয়া রাখে সেই দুগ্ধ,
চক্ষে তাঁহার গুণ দেখি হইলাম মুগ্ধ।।

(সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত, আলোকধারা বুক্স চট্টগ্রাম ২০২১ ইং)

॥ পাঁচ ॥
প্রসিদ্ধ গায়ক ফকির গুরুদাস

ওহে জগ মহাঠক কেন কর দিলদারী
বাঁশের ঘরে বাস করিয়ে পাকাইনু চুল দাড়ী "ইত্যাদি–
(গুরুদাস রচিত)

প্রসিদ্ধ গায়ক গুরুদাস হযরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি হযরতের সামনে বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া বৈরাগী সুরে হযরতকে গান শুনাইতেন। হযরত উহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। তিনি গুরুদাস ফকির নামে পরিচিত (সমাধি বাড়বকুণ্ড)। বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গিত বিশারদ আফতাবুদ্দিন ও সুর বিশারদ আলাউদ্দিন প্রভৃতি হযরতের সামনে হাজির হইয়া বাঁশী ও এস্রাজ সমেত হযরতকে সঙ্গিত শুনাইতেন।

ইহা ছাড়া হযরতের মুরিদ শিষ্য পটিয়া থানার অন্তর্গত আহলা মৌজার কাজী মৌলবী আছদ আলী, গোবিন্দখীল মৌজার শাহ্ আমিরুজ্জমান, কাঞ্চনপুর নিবাসী মৌলানা আবদুল হাদি ছাহেবানের মধ্যেও কেহ কেহ হযরতের খেদমতে গান, গজল, নাতিয়া শুনাইতে অনুমতি চাহিলে তিনি অনুমতি দিতেন এবং শ্রবণ করিতেন।

প্রায় সময় দেখা যাইত, গান-বাজনার ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীগণ তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে গান বাজনা শুনাইতেন।

(সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত, আলোকধারা বুক্স চট্টগ্রাম ২০২১ ইং)

॥ ছয় ॥

হযরতের শানে মৌলানা জুলফিকার আলী ছাহেবের নাতিয়া

হযরতের এই বেলায়েতী প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া চট্টগ্রাম মোহছনীয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মরহুম মৌলানা জুলফিকার আলী ছাহেব (চট্টগ্রাম গর্ভুমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শামশুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমদ আই, ই, এস, ছাহেবের পিতা) তাঁহার শানে নিম্নলিখিত নাতিয়া লিখিয়া তাঁহার প্রেম ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা–

از دم فیض غوث میجھنڈار ☆ شرقیان سالک اند و صاحب حال

تربتش راز ہے اثر کہ فنزود ☆ در مزارات رونق واجلال

احمد اللہ شاہ سرور درویش ☆ غوث اعظم صفت شدش چوں وصال

অর্থ– গাউছে মাইজভাণ্ডারীর নিশ্বাসের বরকতে পূর্বদেশীয় লোকেরা খোদাপন্থি, হাল ও জজ্‌বার অধিকারী হইয়াছে। তিনি কবরস্থ হওয়ার ফলে বিভিন্ন কবরে উজ্জ্বলতা ও জালালী–দেখা দিয়াছে। আহমদুল্লাহ্ যিনি, তিনি সমস্ত অলিদের সর্দার, যাঁহার ছিফাত গাউসুল আযম।। ইত্যাদি ...

(সূত্রঃ জীবনী ও কেরামত, আলোকধারা বুক্‌স চট্টগ্রাম ২০২১ ইং)

॥ সাত॥

মওলানা শাহ্ সুফি ছফীউল্লাহ্ ছাহেব

নদীমপুর নিবাসী এক্সাইজ ইন্সপেক্টর মৌলভী মোহাম্মদ ইউনুচ মিঞা ও নানুপুর নিবাসী মৌং সৈয়দ আবু তাহের মিঞা, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত মোদাররেছ কুতুবে জমান হযরত মওলানা শাহ্ সুফি ছফীউল্লাহ্ ছাহেবের খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাহাদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা চট্টগ্রাম বলার উত্তরে শাহ্ ছাহেব বলিয়াছিলেন, "হযরত শাহ্ আহ্মদ উল্লাহ (ক.)কে চিন?" তাহারা উত্তরে বলিলেন, "হুজুর চিনি"। তখন তিনি জজবার হালতে বলিতে লাগিলেন, **"মিঞা চিন! কিরূপ চিন? ছয়শত বৎসরের মধ্যে এইরূপ অলীউল্লাহ পৃথিবীতে আসেন নাই"**।

হিসাব করিলে দেখা যায়, হযরত পীরানে পীর শাহে বগ্দাদী (ক.)এবং গরীবে-নাওয়াজ হযরত সোলতানুল হিন্দ শাহে আজমিরী (ক.) ছাহেবদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া যেন ছয়শত বৎসর বলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহা বেলায়তে ওজমার দায়রার দূরত্বের পরিপোষক।

॥ আট ॥

মওলানা আবদুল গনী কাঞ্চনপুরী (র.)

মওলানা আবদুল গনী (র.) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফটিকছড়ি থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানী আলেমে কামেল অলীউল্লাহ ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাঁহাকে "বাহরুল উলুম" বা জ্ঞান সাগর বলিয়া অভিহিত করিতেন। তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ফয়জপ্রাপ্ত খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শান ও ত্বরীকা সম্বন্ধে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলায় তত্ত্বমূলক বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞান দর্পন, প্রেম দর্পন, আত্ম পাঠ, আত্ম পরিচয়, গুলশনে উশ্‌শাক, আয়েনায়ে বারী, মোশাহেদায়ে মকবুলীয়া (ফছুজাতে গাউছিয়া), পন্দনামা, দেওয়ানে ছফী, দেওয়ানে মকবুল, মজাকে এশ্‌ক, তনকীহুল মফহুম ও শরহে কুল্লিয়াতে খাকানী ইত্যাদি আছে। তাঁহার লিখিত 'আয়নায়ে বারী' গ্রন্থের ১৪০ পৃঃ হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তওয়াল্লোদে গাউছিয়ার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

آئینہ باری صفحہ - ۱۴۰

آفتاب عرش عزواعتلاء پیدا ہوئے ☆ صورت انسان میں سر خدا پیدا ہوئے

آرزو میں جنکے تھے چرخ.برین و عرش وفرش ☆ آج وہ شاہ گل باغ منا پیدا ہوئے

انبیاء میں فخر جنکا کرتے تھے احمد رسول ☆ آج ہی وہ زیدہ اہل صفا پیدا ہوئے

"মহাপ্রভুর আসন রবি উদিত হইয়াছে, মানবাকারে খোদার গোপন রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। ত্রিভুবন যাহার আগমন প্রতীক্ষায় ছিল; আজ সেই আশার ফুলরাজ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যাহাকে নিয়া নবী-বর আহ্‌মদ মোস্তফা (দ.) গৌরব করিতেন, আজ সেই গৌরব, ছুফীদের সারতত্ত্ব খনি, জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।"

আয়নায়ে বারী কেতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় আছে :

آئینہ باری صفحہ - ۱۳۸

صد مرحبا صل علی غوث خدا پیدا ہوئے ☆ جان جہان و قبلہ اہل صفا پیدا ہوئے

صد مرحبا خورشید عرش اعتلاء پیدا ہوئے ☆ عالم میں اب تو جلوہ شان خدا پیدا ہوئے

دونوں جہاں پائے مبارک کا ہے جنگی کفش آب ☆ عالم میں وہ سلطان ملک اعتلاء پیدا ہوئے

فیض نظر سے جنگی ہوتی ہے رواحاجات خلق ☆ اب عالم دنیا میں وہ حاجت روا پیدا ہوئے

"অলীদের শিরোমণি খোদার গাউছ ভবে পদার্পণ করিয়াছেন। জগদ্বাসীর প্রাণ প্রিয়, ছুফীদের লক্ষ্যস্থল এমাম ভবে তশরিফ আনিয়াছেন। তাঁহাকে শত ধন্যবাদ, তাঁহার উপর শত শান্তিপূর্ণ দরূদ বর্ষিত হউক। দুই জগত যাঁহার কদম মোবারকের পাদুকা বিশেষ, জগতে শ্রেষ্ঠত্বের বাদশাহের শুভাগমন হইয়াছে; যাঁহার ফয়জের বরকতে বা অনুগ্রহের শুভদৃষ্টি মাত্র মানুষের বাসনা সিদ্ধ হয়। এই পৃথিবীতে সেই বাসনা-সিদ্ধ মহা পুরুষের আগমন হইয়াছে।

আয়নায়ে বারী ১৩৬ পৃষ্ঠা

آئینه باری صفحه - ۱۳٦

غوثنا الفوز لديك * نحن مقبل اليك

فصلوة الله عليك * بالتواتر والتوالى

يا حبيب الله العالى * يا خليل ذى النوالى

فسلامنا عليك * فى الحال والمال

انت غوث الله الاعظم * انت قطب الله الافخم

انت فرد الله الأكرم * خير مقدم تعال

উক্ত গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় আছে ঃ- "হে আমাদের ত্রাণকর্তা! বরকত তোমার নিকট নিহিত। আমরা তোমার দিকে অগ্রগামী এবং আগুয়ান হইয়াছি। সদাসর্বদা তোমার প্রতি আল্লাহ্‌তা'য়ালার পূর্ণ শান্তি আসিতে থাকুক।

হে মহান খোদার শ্রেষ্ঠবন্ধু! হে দয়ালু দাতার স্বীকৃত সখা! বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য তোমার প্রতি আমাদের সালাম বর্ষিত হউক।

তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা এবং খোদার সম্মানিত কুতুব। তুমিই সর্ব মর্য্যাদায় একচ্ছত্র ও অদ্বিতীয়।

আয়নায়ে বারী কেতাবের ১৩৮ পৃষ্ঠায় আরো আছে

آئینہ باری صفحہ — ۱۳۸

صد مرحبا صل علی غوث خدا پیدا ہوئے ☆ جان جہان و قبلہ اہل صفا پیدا ہوئے

صد مرحبا خورشید عرش اعتلاء پیدا ہوئے ☆ عالم میں اب تو جلوہ شان خدا پیدا ہوئے

دونوں جہاں پائے مبارک کا ہے جنگی کفش آب ☆ عالم میں وہ سلطان ملک اعتلاء پیدا ہوئے

فیض نظر سے جنگی ہوتی ہے رواحاجات خلق ☆ اب عالم دنیا میں وہ حاجت روا پیدا ہوئے

হে সম্মানিত অতিথি, তোমার শুভাগমন কামনা করিতেছি। শীঘ্র তাহা প্রতিপালিত হউক।

সুপ্রসিদ্ধ অলীয়ে কামেল ও হযরত আকদছের শুভ সাহচর্য ও ফয়জপ্রাপ্ত আল্লামা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী (র.) এর লিখিত আয়নায়ে বারী কেতাবের ১৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে, “হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজতাবা (দ.) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং রেছালত প্রাপ্ত নবীদের বাদশাহ্ ছিলেন। সেইরূপ হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি মওলানা সৈয়দ আহ্‌মদ উল্লাহ্ (ক.)ও বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগের খাতেম বা পরিণতিকারী। তিনি আওলীয়াদের বাদশাহ্ এবং দোজাহানের গাউসুল আযম বা পরিত্রাণকর্তা এবং হযরত রসুলে খোদা (দ.) এর বেলায়তের ওয়ারেছ বা উত্তরাধিকারী হন।

آئینہ باری صفحہ — ۱۵۱

حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم الانبیا اور سلطان المرسلین ہیں یہ ولی بھی اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالے میں خاتم الاولیا اور سلطان الاولیا اور غوث الثقلین اور وارث خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم ہے

“আমার মোরশেদে মোয়াজ্জাম শায়খে মোকাররাম, যিনি সমস্ত কামালিয়াত ও ফজিলতে রব্বানীর সমাবেশকারী এবং ফয়জ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের কেন্দ্র;

যাহার প্রভাব, অলৌকিক ঘটনাবলী ও কেরামতসমূহের মধ্যস্থতায় সর্বময় ব্যাপ্ত, তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ, পবিত্র "তুর" পর্বত সদৃশ চেহারাতে বা মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত। তাঁহার মেজাজ শরিফ বা ভাবভঙ্গী নূর বিশেষ। তাঁহার গুণাবলী হইতে দোষ বিবর্জিততার "ফয়জ" বিকীর্ণ হয়। তাঁহার আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বা কশ্‌ফ রাসুল করিম (দ.) এর মে'রাজ কালে আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষাৎ দর্শনে অবগত বস্তু। তাঁহার মোশাহেদা বা দর্শনসমূহ রাসুল করিম (দ.) এর মে'রাজী ছায়রের পরিদৃষ্ট রহস্যাবলীর চাক্ষুষ জ্ঞান। তাঁহার গুণাবলী আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী হইতে অর্জিত। তিনি আল্লাহ্ তায়ালার দেশসমূহে গাউসুল আযম রূপে নিয়োজিত" ইত্যাদি। (উক্ত গাউসুল আজমের অনুগ্রহের ছায়ায় আল্লাহ্‌তা'য়ালা আমাদিগকে স্থান দান করুন।)

॥ নয় ॥
মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী

চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদ গ্রাম নিবাসী অলীয়ে কামেল মওলানা আমিনুল হক (র.) ছাহেব তাহার আরবী ভাষায় লিখিত "তাওজিহাতুল বহিয়া" নামক কেতাবের ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পরিচয় দিতে গিয়া যাহা লিখিরাছেন, তাহার কিয়দাংশের অনুবাদ এখানে সন্নিবেশিত হইল ঃ-

উক্ত মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.) ছাহেব একজন জবরদস্ত মহান কামেল আলেম ও ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদ মুফ্‌তী ছিলেন। তাঁহার ফতোয়া সুদূর মিশর দেশে জামেউল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল।

মওলানা সৈয়দ আবদুল হামীদ বাগদাদী ছাহেব "হেরম শরিফ" বা কাবা শরিফের বারান্দায় আরববাসীদিগকে তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া তাঁহার ডান হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সরু হাতগুলি হাড়ের নহে; হীরার বলা যাইতে পারে। তাঁহার লিখার মধ্যে হীরার ধার আছে। বাংলা মুলুকে এইরূপ লায়েক আলেম আমি দেখি নাই। যদিও কোন কোন মাছয়ালাতে আমি তাঁহার সহিত একমত নহি।

হযরত কেব্‌লা তাঁহার শানে বলিয়াছিলেন; "আমার আমিন মিঞাকে আমার ছয়টি কেতাব হইতে একটি দিয়াছি।" জনাব মওলানা আমিনুল হক ছাহেব লিখিত "তোহফাতুল আখইয়ার" নামক কেতাবের ফতোয়াতে গাউসুল আযম জনাব হযরত কেব্‌লা স্বয়ং দস্তখত করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার মকবুলিয়তের জন্য মোনাজাত করিয়া দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্‌ব মোবারক সদা-সর্বদা খোদার জিকিরে জাকের বা জারি থাকিত। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাহারা নিশ্চয় অবগত আছেন, তিনি নেহায়ত সাদাসিধা প্রকৃতির দীনদার কামেল মোত্তকী আলেম ছিলেন।

তিনি নিম্নলিখিত কেতাবগুলি লিখিয়া গিয়াছেন।

১। শাওয়াহেদুল এবতালাত ফি তারদিদে মা-ফি রাফেইল্‌ এশ্‌কালাত।
২। দাফেউশ্‌ শোবহাত ফি জওয়াজিল এস্তেজারে আলত্‌ তায়াত।
৩। তোহফাতুল আখ্‌ইয়ার।
৪। তওজিহাতুল বহিয়া।
৫। রাফেউল গশাবী।
৬। গায়তুত তাহ্‌কীক ফি মা ইয়তায়াল্লাকু বিহি তালাকুত্‌ তায়ালীক।
৭। মেরা'তুল ফান্নে ফি শর্‌হে মোল্লা হাসান।

॥ দশ ॥

আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী ছাহেব (শেরে বাংলা)

আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী ছাহেব (শেরে বাংলা) চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত হাটহাজারী থানার অধিবাসী হন। তিনি তৎকালীন মশরেকী পাকিস্তানের আহলে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের আমীর। হযরতের শানে ফার্সী ভাষায় লেখা তাহার নজরে আকিদত শীর্ষক কছিদার নকল, অনুবাদ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হযরত শাহ্‌ আহ্‌মদ উল্লাহ কাদেরী, যিনি ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত কুতুবুল আকতাব। তিনি মাইজভাণ্ডার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গাউসুল আযম নামধারী বাদশাহ্‌। তিনি নবীর আহ্‌মদী মসরব উম্মতগণের চেরাগে হেদায়ত বা

আলোকবর্তিকা। হোমা পাখীর মত তাঁহার অনুগ্রহ ছায়া দুর্ভাগাকে ভাগ্যবানে পরিণত করে। জগদ্বাসীর জন্য তিনি লাল গন্ধক বা স্পর্শমণি সদৃশ। রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এর নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল।" যাহা বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী ও বেলায়তে মোতলাকায়ে আহ্মদী বলিয়া বুঝা যায়।

"এই সম্মান প্রতীক বা তাজ দুইটির মধ্যে একটি হযরত শাহ্ আহ্মদ উল্লাহ্ (ক.) এর মস্তক মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। যেই কারণে তিনি পূর্বাঞ্চলের গাউসুল আযম বলিয়া খ্যাত, সেই কারণে তাঁহার রওজা মোবারক মানব-দানবের জন্য খোদায়ী বরকত হাছেলের উৎসে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় তাজ বা সম্মান প্রতীক, জিলান নগরের বাদশা হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর (ক.) মস্তক মোবারকে প্রতিষ্ঠিত, যেই কারণে সমস্ত আওলীয়াদের গর্দানে তাঁহার পা-মোবারক প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমস্ত আওলীয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য।

মে'রাজ রাত্রে খোদার পেয়ারা নবী রফ্ রফ্ বা তাঁহার বেলায়তে ওজমার প্রভাবে [যাহা পীরানে পীর দস্তগীরের (ক.) জন্য রক্ষিত ছিল] বা গর্দানে পা রাখিয়া ঊর্ধ্বে "আরশ" মোবারকে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময় নবী করিম (দ.) মোজেজা বা অলৌকিক বাণীতে বলিয়াছিলেন, তুমিই "মুহীউদ্দীন" দীনে মোহাম্মদীকে জীবন দাতা। এই উপাধি তোমার বেলায়তী খেদমত বা আনুগত্যের পুরস্কার।

نظر عقیدت الحاج شیر بنگال حضرت مولنا سید عزیز الحق القادری صاحب امیر اہلسنت والجماعت مشرقی پاکستان چاٹگام شریف۔

حضرت شاہ احمد اللہ قادری ☆ قطب الاقطاب بلاد مشرقی

غوث الاعظم آں شاہ میجھنڈاری ☆ آں چراغ امتان احمدی

سایہ او چون ہمان سایہ براں ☆ بود او کبریت احمر در جہاں

تاج دو بودہ بدست پیغمبراں ☆ یک نہادہ بر سر شاہ احمد اللہ بیگماں

زیں سبب او غوث الاعظم در بلاد مشرقی ☆ فیضیاب روضہ آش جن و پری و آدمی

تاج دیگر بر سر آں شاہ جیلانی نہاد ☆ زاں سبب بر گردن ہر اولیاء پائش نہاد

در شب معراج محبوب خدا بر گردنش ☆ پا نہادہ رفت بر عرش بریں آں رفرفش
اندرا (دم گفت محبوب خدا از معجز بیاں ☆ تو محی الدین ہستی تحفہ خدمات بدا)
نام ناظم گر تو خواہی شیر بنگالہ بداں ☆ ای خدا محفوظ دارش از شر ور دشمناں

এই কবিতা লেখকের নাম যদি কেহ জানিতে চাহেন, শেরে বাংলা বলিয়া জানিবেন। হে খোদা! তুমি তাহাকে শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিও।"

"গাউসুল আযম হযরত শাহ্ আহ্মদ উল্লাহ্ (ক.) এর জন্য আমার মুখের হাজার হাজার (মারহাবা) প্রশংসা গীতি ধ্বনিত হউক। যিনি পূর্বাঞ্চলের কুতুব বলিয়া জগতে খ্যাত। পৃথিবীর প্রান্তসমূহ যাহার ফয়জ বরকতে পরিপূর্ণ। তাঁহার অলৌকিকত্ব, গণনার বহির্ভূত। বহু অখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার ফয়জ বরকতে বা আধ্যাত্মিক প্রভাবে পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত। মাইজভাণ্ডার শরিফে তাঁহার শান্তিময় অবস্থান। আজিজুল হক মন প্রাণে তাঁহার জন্য উৎসর্গিত।

হে মহান প্রভু! গাউসুল আজমের অছিলাতে তাঁহার আজিজকে– গাউসুল আজমে বিলীন করিয়া দাও।"

"আমাদের দিশারী, রক্ষক, পাকিস্তানের মহান সম্রাট, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ আহ্মদ উল্লাহ (ক.)এর প্রতি হাজার হাজার ধন্যবাদ, প্রশংসা গীতি ধ্বনিত হউক।

শাহীনশাহে মদীনার পক্ষ হইতে এই উপাধি ঘোষণা করা হইয়াছে। অলীগণের মুখেও এই ধ্বনির উচ্চবাণী শুনিতে পাই। তাঁহার প্রশংসা ও উচ্চমান, হীন আজিজের জ্ঞানের বাহিরে। যাহার আলোকে সমগ্র বাংলা আলোকিত হইয়াছে।

نظر عقیدت الحاج شیر بنگال مولنا سید عزیز الحق صاحب (القادری) صدر جمعیت علماء مشرقی پاکستان چاٹگام شریف۔

ہزاران مرحبا ورد زبانم ☆ برائے احمد اللہ غوث الاعظم
بقطب مشرقی مشہور عالم ☆ از وپر فیض شد اطراف عالم
کرامتش برون حد شمارست ☆ بسا ناقص رفیضش پر کمال ست

بمیجبهنڈار شده ارام گاهش ☆ عزیزالحق بجان ودل فدایش
خداوندا بحق غوث الاعظم ☆ عزیزش را بگردان غوث الاعظم

হে বারে খোদা! তাঁহাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমার এই দোয়া বিশ্বনবী মোস্তফার (দ.) উছিলায় কবুল কর।

এই কবিতার লিখককে যদি জানিতে চাও, শেরে বাংলা বলিয়া জান। তিনি অলীগণের মোনকেরদের, প্রাণ ঘাতি বিষতুল্য।"

॥ এগার ॥

মওলানা মোহাম্মদ শফী

হযরত গাউসুল আযম মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ্ (ক.)এর কামালিয়ত জহুরের সময়-এক জন লোকের আনিত হাদিয়া একটি বড় গোল তরমুজ, তাঁহার বাল্যকালের ওস্তাদ আজিমপুর নিবাসী জনাব মওলানা মোহাম্মদ শফী (র.) ছাহেবের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। জনাব মওলানা ছাহেব, তাহার কথা হযরত কেব্লার এখনও স্মরণ আছে দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলেন। এবং তরমুজটি হাতে লইয়া আল্লাহ্তা'য়ালার নিকট দোয়া করিলেন, তাঁহার কথা যেমন হযরত স্মরণ রাখিয়াছিলেন; গোলাকার তরমুজের মত পৃথিবীর লোকেরাও যেন তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণ করে। উক্ত বর্ণনাটি মওলানা মোহাম্মদ শফী ছাহেবের দৌহিত্র, ছিলোনীয়া নিবাসী মৌলানা আহ্মদুর রহমান ছাহেব, হাইদ চকিয়া নিবাসী হাফেজ মোহাম্মদ দৌলত ছাহেবের নিকট বর্ণনা করেন।

نذر عقیدت بحضرة عوث الاعظم قطب الاقطب حضرت مولانا شاه سید احمد الله القادری میجبھنڈاری باشنده چاڈگام شریف۔

مئجانب غازی ملت امام اہلسنت سید المناظرین سلطان الواعظین حضرت الحاج علامہ شاہ سید محمد عزیزالحق (شیر بنگالہ) القادری صدر جمعیت علماء مشرقی پاکستان و بانی جامعہ عزیزیہ وددیہ سنیہ ھاٹھزاری چاڈگام شریف بنگلہ دیش

بہر آن سلطان پاکستان ہزاراں مرحبا☆خواجہ ما احمد اللہ غوث الاعظم مرحبا

از شہنشاہ مدینہ ایں خطابش آمدہ☆از زبان اولیاء مشردہ چناں مسموع شدہ
از وجودش ملک بنگالہ شدہ روشن تمام☆وصف اورا کئی تواند ایں عزیز ناتمام
یاالٰہی جنت الفردوس اورا کن عطا☆ایں دعا مقبول گرداں از طفیل مصطفےٰ
نام ناظم گر تو خواہی شیر بنگالہ بداں☆منکراں اولیاء راسم قاتل بیگماں

॥ বার ॥

মৌলবী নজির আহ্‌মদ ছাহেব

নদওয়াতুল মোয়াল্লেফিনের ৪র্থ রচনা "আলহাদী" নামক গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় হাটহাজারীর মৌলবী নজির আহ্‌মদ ছাহেব লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাইজভাণ্ডার গ্রামের হযরত শাহ্ আহ্‌মদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)ছাহেব হাটহাজারী মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার বহুদিন পূর্বে অত্র মাদ্রাসার স্থান মাপিয়া, মাদ্রাসার স্থান নির্দেশ ও মাদ্রাসা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন।

মৌলভী নজির আহ্‌মদ ফাজেলে জামেয়া ইসলামিয়া সুরাট, বোম্বাই, নাজেমে নদওয়াতুল মোয়াল্লেফিন, হাটহাজারী চট্টগ্রাম ১৯৫৪ ইং।

উঠাইয়া দেওয়ার পরে দেখেন যে, তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

॥ তেরো ॥

আবদুর রহমান তেলওয়ালা

হযরতের "বেলায়তে মুহিত" বা সর্ব বেষ্টনকারী বেলায়তের পরিচয়

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ী থানার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ জুনির বাপের মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর আবদুর রহমান তেলওয়ালা পীং আবদুল আজিজ নামক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, একদা দিল্লী নগরীর রাস্তার ধারে একজন ভিক্ষুকের মত লোককে দেখিয়া এক আনা পয়সা হাতে লইয়া পাশ কাটাইতেই উক্ত লোকটি বলিয়াছিল "আমার পয়সা এক আনা আমাকে দাও।" পয়সা এক আনা দেওয়ার পর বলিল, "দেখত আমার নিকট কত পয়সা হইয়াছে!" লোকটি গুনিয়া বলিলেন, "এক পয়সা কম দশ আনা।" পুনরায় লোকটি বলিলেন, "আবার গুনিয়া দেখ"। পরে

গুনিয়া দেখিলেন, দশ আনা। উক্ত ফকির পরে বলিলেন, “তোমার সার্টের জেবে একখানা আট আনি আছে, তাহা আমাকে দাও এবং আমার এখান থেকে আটআনা তুমি নাও। পয়সা আমার বোঝা হইয়াছে।” পরে বলিলেন “আমার হাত এবং পায়ে ব্যাথা হইয়াছে একটু দাবিয়া দাও।” তিনি তাহাই করিলেন। ফকির আবার বলিলেন “এক আনার নান রুটি এবং এক আনার চনার ডাইল আনিয়া আমাকে খাওয়াও।” তিনি তাহাও করিলেন। পরক্ষণে বলিলেন, “তুমি টাকা পাঠাইয়াছ, তাহার রসিদ কলিকাতায় গিয়া পাইবে। চিন্তার কিছুই নাই। তোমার স্ত্রী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের খতনায় গিয়াছে, খুশিতে আছেন, ভাল আছেন। আমাকে উঠাইয়া দাও, তুমি তোমার পথে চলিয়া যাও।”

অনেক দিন পরের কথা। বর্ণনাকারী বোম্বাই গিয়াছেন, ষ্টীমার ঘাটে পূর্ব বর্ণিত লোকটিকে লাঠি ভর দিয়া রাস্তায় চলিতে দেখিয়া তাহার সামনে গিয়া দাঁড়ান। সামনে দাঁড়াইতেই লোকটি বলিলেন, “তুমি আমাকে চিন? আমিতো তোমাকে চিনিনা। খাজা বাবা তোমাকে কি বলিয়াছেন?” তিনি উত্তরে বলিলেন, “আমি আপনাকে চিনি। আমি বাঙালির ছেলে। খাজা বাবা আরবীতে কি বলিয়াছেন, আমি বুঝি নাই।” তখন ফকির বলিলেন “দেখ রসুনের কোষ অনেক হইলেও জড় এক। ইহা বলেন নাই?” বলিলাম, হাঁ বলিয়াছেন। পুনরায় বলিলেন, “সেই জড় ভাণ্ডারে। তুমি সেখানে চলিয়া যাও।” বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, তিনি জনাব মতিউর রহমান শাহ্ ছাহেবের পিছনেও অনেক ঘুরা ফিরা করিয়াছেন। শাহ্ ছাহেব বলিতেন, “তুমি বিনাজুরি যাও। তোমার জন্য ভাতের পাতিল রাখিয়াছেন। আমার কাছে আসিওনা।”

॥ চৌদ্দ ॥

হাফেজ দৌলত খাঁ

ফটিকছড়ী থানার হাইদচকিয়া নিবাসী মৃত আমিনুর রহমান মাতবর ছাহেবের পুত্র প্রখ্যাত হাফেজ দৌলত খাঁ ছাহেব বর্ণনা করেন ঃ–

আমাদের পার্শ্ববর্তী আজিমপুর গ্রাম নিবাসী মুন্সী আনোয়ার আলীর পুত্র মুন্সী আবদুচ ছোবহানের মুখে শুনিয়াছি। তাহার এক ভাই ও এক ভগ্নি একই সময়ে সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়। ঐ সময় তাহার পিতা তাহাকে মাইজভাণ্ডার ‘ফকির মৌলবী’ ছাহেবের নিকট পাঠান। তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে

আসিয়া হযরত ছাহেব কেবলাকে দায়েরা শরিফে শুইয়া থাকা অবস্থায় দেখিতে পান। কিছু বলার সুযোগ না পাইয়া মুন্সী ছাহেব বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পর হযরত খাদেমকে হুকুম করিলেন, "আজিমপুরের ছেলেটিকে বোলাও।" তিনি সামনে হাজির হইলে আদেশ করিলেন, "একলোটা পানি আন।" পানি আনিলে উহা তিনি সামনের গাছের গোড়াতে ঢালিয়া দিলেন এবং পর পর আরো দুই লোটা পানি আনাইয়া একলোটা গাছের গোড়ায় দিলেন। অপর লোটা দিয়া তিনি অজু করিলেন এবং তাহাকে বাড়ি চলিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি বাড়ি গিয়া জানিতে পারেন যে, তাহার মাতা ছাহেবানী পুকুরে গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন যে রোগী দুই জনের বিছানা পত্র ভিজিয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্তী গৃহের শত্রুভাবাপন্ন একজন মেয়েকে সন্দেহ করিয়া তিনি তাহার উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা বাক্য প্রয়োগ করিলে উক্ত মেয়েটি কসম করিয়া বলে যে, সে ইহা করে নাই। রোগীদের নিকট জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে যে, পানি কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা তাহারাও জানেনা। তবে তাহাদের গায়ে পানি লাগার পর হইতে তাহারা আরাম অনুভব করিতেছে। তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে। আবদুচ ছোবহান ছাহেব দরবার শরিফ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার পর সমস্ত কিছু শুনিয়া বুঝিতে বাকী রহিলনা যে, ইহা হযরত ছাহেবের "তাছার্রোফাত ছাড়া আর কিছুই নহে।

॥ পনের ॥

সৈয়দ আবদুল করিম মদনী (রহ.)

মওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মদনীর (রহ.) রায় ঃ–

নালাপাড়া নিজ বাসার অধিবাসী অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার শেখ মোছলেহুদ্দীন ছাহেব বর্ণনা করেন ঃ–

একদা উপরোক্ত সৈয়দ ছাহেব বলেন, শেখ মোছলেহুদ্দিন! আরব রাজ্য ছাড়া আমি বহু দেশে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত ছায়র করিয়াছি। চট্টগ্রাম আমার শেষ ছায়র। মাইজভাণ্ডারের মৌলানা সৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ (ক.) ছাহেবের মত জবরদস্ত অলীউল্লাহ আমি কোথাও পাই নাই।

॥ ষোল ॥

মৌলানা হাফেজ সৈয়দ আহমদ ছিরিকুটি (র.)

মৌলানা হাফেজ সৈয়দ ছিরিকুটি ছাহেবের রায় ঃ–

(ক) চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাস্থ খান ছাহেব মৌলভী আবদুল হালিমের সুযোগ্য পুত্র এডভোকেট মোঃ মাহমুদ জালাল সাহেব বর্ণনা করেনঃ-

মৌলানা ছিরিকুটি ছাহেবের একজন মুরীদ, মৌলানা ছাহেবকে বলেন! মাইজভাণ্ডারী ছিলছিলার মুরীদেরা গান-বাদ্য সহকারে মজলিস করে, ভাব বিভোর নৃত্য করে, এই বিষয়ে আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বলেন, দেখ! তিনি এই জমানার বাদশা আওলীয়া। হুকুমত তাঁহারই। ইহার আমি কি বলিতে পারি?

(খ) জনাব ছিরিকুটি ছাহেবের অপর মুরিদ আমির হোসেন পীং আজগর আলী সাং আবুর কান্দি, জিলা কুমিল্লা (D.S.B.) চট্টগ্রামে পুলিশের চাকুরী করে। তিনি বর্ণনা করেনঃ–

জনাব পীর ছাহেব বলিতেন, মাইজভাণ্ডারে দুইটি লাইন আছে। উত্তরের দিকে যাইওনা। দক্ষিণের হিচ্ছায় যাইতে পার। তবে তোমার পক্ষে না যাওয়াই ভাল। ফলে এতদিন আসি নাই। বিগত ১৫/২/১৯৬৯ ইং তারিখে আমাকে আসিতে নির্দেশ দেন। পরে ৫/৩/৬৯ ইং তারিখে আহ্বান পাই। বলেন ঃ "আস, আমার আওলাদ আছে।" তাই অদ্য ৬/৩/১৯৬৯ ইং তারিখে আপনার সঙ্গে দেখা এবং হুজুরের জেয়ারত উদ্দেশ্যে আসিলাম।

॥ সতেরো ॥

মৌলানা আবদুল হক মরিয়ম-নগরী

মৌলানা আবদুল হক মরিয়ম-নগরী ছাহেব বর্ণনা করেন ঃ

চট্টগ্রাম জামে মসজিদের ভূতপূর্ব ইমাম ও চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মোদার্‌রেছ, মোহাদ্দেছ মওলানা ছফিউর রহমান ছাহেবের জামাতা জনাব মওলানা আবদুল হক মরিয়ম নগরী ছাহেবকে "মাইজভাণ্ডারী" বলিয়া ঠাট্টা করায় মৌলানা ছফিউর রহমান ছাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জামাতাকে তিরস্কার

করেন। জামাতাকে ইহাও বলিয়া দেন যে, মাইজভাণ্ডার দরবার সম্বন্ধে যেন ভবিষ্যতে কিছু না বলেন। কারণ উক্ত দরবারের শান খুব বড়, ইহা তাহাদের বোধগম্য হইবে না।

॥ আঠারো ॥

মাওলানা হাফেজ আহমদ, মৌলানা শাহাবুদ্দিন, গাজীপুরী শাহ্ ছাহেব ও মোহাজেরে মক্কী

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সমসাময়িক "বুজুর্গানে দীনে মতীন"দের মধ্যে জৈনপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ অলী, মওলানা কেরামত আলী ছাহেবের বংশধর মওলানা হাফেজ আহ্মদ ছাহেব ও মৌলানা শাহাবুদ্দীন ছাহেব তাঁহার খেদমত শরিফে হাজির হইয়া ফয়জ হাছেল করিয়াছেন। তাঁহারা হযরত সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য করিয়াছেন। এইরূপ প্রসিদ্ধ গাজীপুরী শাহ্ ছাহেব ও মোহাজেরে মক্কী "ছাহেবে দলায়েল" হযরত সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হুজুরের জীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে।

॥ ঊনিশ ॥

তৈলঙ্গ স্বামী, তারাচরণ সাধু

হিন্দু সাধকদের মধ্যে তৈলঙ্গ স্বামী ও নয়াপাড়া মৌজার তারাচরণ সাধু প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার বেলায়তের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উচ্চস্তরের মন্তব্য করেন।

(১) কাশীর সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ। পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গধর। ইনি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি "মহাবাক্য রত্নাবলী" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেলরা কিরূপ তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়। তাঁহার ভক্ত অনুরক্তদের রচিত গান গজল প্রভৃতিতে তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও মনোভাব পরিব্যাপ্ত ও ব্যক্ত আছে।

মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী, মওলানা আমিনুল হক হারবাঙ্গিরী, মওলানা কাজী আছদ আলী, জনাব আমিরুজ্জমান

শাহ্ পটিয়া, চট্টগ্রাম, মওলানা সৈয়দ মোছাহেব উদ্দীন শাহ্পুরী, মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী, কবি আবদুল হাকীম ও ফজলুর রহমান চৌধুরী চট্টগ্রাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরে কবিয়াল বাবু রমেশ শীলও উল্লেখযোগ্য।

॥ বিশ ॥

শ্রদ্ধাস্মারক প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা

এইরূপ বিভিন্ন এলাকার জনগণ ছাড়াও স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন সমাজেরও স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন ঃ- নাজির হাট জামেয়া মিল্লিয়া "আহ্মদীয়া" সিনিয়র মাদ্রাসা তাঁহার পবিত্র নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। নানুপুর, গাউছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাও তাঁহার গাউছিয়তের ফজিলতের সাক্ষী স্বরূপ বর্তমানে আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জনাব মওলানা তোফাইল আহ্মদ ছাহেবের পিতা মরহুম জনাব মওলানা ওবাইদুর রহমান ছাহেব। তিনি হযরতের মুরীদ ও কামেল খলীফা ছিলেন। স্থানীয় চাড়ালিয়া হাটস্থ "মাইজভাণ্ডার আহ্মদীয়া" হাইস্কুলটিও হযরতের পবিত্র নামের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। ভাণ্ডার শরিফ আহ্মদীয়া ম্যানেজ্ড প্রাইমারী স্কুলটি তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত। এই এলাকার চার পাঁচটি ইউনিয়ন ও সদর চট্টগ্রামের সহিত সংযোগ রক্ষাকারী সি এণ্ড বি রাস্তার সঙ্গে যুক্ত "শাহ্ আহ্মদুল্লাহ্" নামক ডি বি রাস্তাটিও তাঁহার পবিত্র নামের স্মৃতির বাহক দেখা যায়। ইহার ফলে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চিমে নাজির হাট রেলওয়ে স্টেশন, চট্টগ্রাম সদর বা রামগড় রোড, এবং পূর্বে ইছাপুর সদর রোড, দ্বারা উত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম-এবং দক্ষিণে কাপ্তাই রাস্তার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে জরুরী যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে।

হযরতের পবিত্র স্মৃতিসমূহ সন্দর্শন ও ইহার অনস্বীকার্য্য উপকারিতায় স্থানীয় গুণ-মুগ্ধ জনগণ তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অহরহ নিবেদন করিতেছে।

হযরত কেব্লা কাবা "ছায়রে মা'আল্লার" অধিকারী মজজুবে ছালেক ছিলেন। তিনি রাসুল করিম (দ.) এর মত জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করিতে সমর্থ ছিলেন। হযরত মঙ্গল-ইচ্ছুক ও ত্রাণ-কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউসুল আযম ছিলেন। তাই তিনি তাঁহার নিকট আগত লোকের নাম পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহার ফরিয়াদের বা কিছু বলার অধিকার দিতেন এবং তিনি নিজ মঙ্গল-কামী ইচ্ছা শক্তিকে ঊর্ধ্ব শক্তি জগতে উত্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে ফরিয়াদকারীর মনোবাসনা

পূর্ণ হইয়া যাইত। ইহাকে সাধারণ লোকের পরিভাষায় দোওয়া এবং ছুফী পরিভাষায় তাছার্‌রোফ বলা হয়। যাহা সংঘটিত হইতে অবগতি, মঙ্গলকামী ইচ্ছা ও কাজ করার রূহানী শক্তির একত্র সমাবেশ একান্ত দরকার।

এই কারণে হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন জাতিরা তাঁহাকে অন্তর্যামী ফকীর মৌলবী এবং মুসলমানেরা গাউসুল আযম বলিয়া অভিহিত করেন।

তাঁহার উপরোক্ত ফজিলতাদির কারণে মাইজভাণ্ডার গ্রামখানি মাইজভাণ্ডার শরিফ নামে আখ্যায়িত হইয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যেহেতু জনগণ মনে করে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার দরবার শরিফ, ভক্ত জনগণের মনোবাসনা পূরণের ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় তিনি বিশিষ্ট জনগণের অন্তর বিজয়ী এবং সূক্ষ্ম জগতের বৈশিষ্ট্যাদির অধিকারী।

হাফেজ সিরাজীর (র.) পরিভাষায় বলিতে হয়, হে বারে খোদা! ইহা কেমন সুস্বাদু তেলচট্‌ আকর্ষি শরাব খানা, যাহার দরজা হাজত মকছুদ পূরণের "কেব্‌লা" ও দোওয়ার মেহরাবে পরিণত দেখিতেছি।

॥ একুশ ॥

মমতাজুল মোহাদ্দেছীন জনাব মৌলানা ওবাইদুল আকবর এম এ (কলিকাতা) প্রাক্তন এম পি এ ছাহেব

"বেলায়তে মোত্‌লাকা" বাংলা ভাষায় ছুফীবাদ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা সম্বলিত একটি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ। ইহা সৈয়দুল আওলীয়া রূহুল আছফিয়া গাউসুল আ'জম হযরত শাহ্‌ সুফি সৈয়দুনা মওলানা আহ্‌মদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জাতে মোবারক্‌কে কেন্দ্র করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, মহান মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার বৈশিষ্ট্য ও বহু রহস্যাবৃত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া বাংলা ভাষায় এই ধরণের একটি গ্রন্থের অভাব অনুভূত হইতেছিল। হযরতে আক্‌দাছের পৌত্র ও সাজ্জাদানশীন্‌ হযরত শাহ্‌ সুফি মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব মাইজভাণ্ডারী এই গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছেন।

ইহাতে হযরত আক্‌দাছের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও রূহানী বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন বুজর্গানে কেরামের মন্তব্য, তাঁহার রূহানী

বিরাটত্বকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে (কলিকাতা) মাদ্রাসা আলীয়ার প্রাক্তন মোদার্‌রেসে আউয়াল মশহুর অলীয়ে কামেল হযরত শাহ্ সুফি মওলানা ছফী উল্লাহ্ ছাহেবের (র.) উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থে তাঁহার রূপক কালামাদির ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার কেরামাত ও প্রকৃতির উপর তাছার্‌রোফাত বা প্রভাব বিস্তারের অলৌকিক ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি যে গাউসুল আযম ছিলেন, তার প্রমাণ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে এলমে তাসাওউফ বা সুফিবাদের বহু জটিল বিষয়াদি আলোচিত হওয়াতে এই গ্রন্থের মধ্যে এক অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভাবধারার দিক্ দিয়া এই গ্রন্থে শায়খে আকবর হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (র.) রচিত এলমে লদুন্নি এলহাম মোকাশেফা সমৃদ্ধ ফছুছুল হেকম নামক কেতাব ও মছনবীয়ে রূমী প্রভৃতি তাছাওউফের উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন কেতাবাদি অনুসৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় ছুফীবাদ সম্বন্ধে এই ধরণের গভীর আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ আর চোখে পড়ে নাই। এই দিক্ দিয়া ইহাকে বাংলা ভাষায় এক নূতন অবদান, বলা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থ আউলীয়া ভক্তদের জন্য পথ নির্দেশক ও নিরপেক্ষ পাঠক মণ্ডলীর জন্য গবেষণার খোরাক হউক, ইহাই কামনা করি।

॥ বাইশ ॥

অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র সিংহ

মৌলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইনের "বেলায়তে মোতলাকা" গ্রন্থখানি এক অপরূপ সম্পদ। "মাইজভাণ্ডার" শব্দটি লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইলেও উহার তাৎপর্য অনেকের কাছে খুব-স্পষ্ট নহে। এই গ্রন্থে উহার অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে শাশ্বত সত্যসমূহের মহিমা প্রকৃষ্ট সারল্যে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

আজ যখন মানুষের কাছে মানুষ যমমূর্তি অপেক্ষাও ভীষণতর, যখন মানুষ হিংস্রতার নগ্ন বিলাসে নিমগ্ন, যখন সে ভুলিয়াছে যে মানব প্রেমই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম এবং মানবকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া নির্মল আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করাই উন্নততম সাধনা, তখন এই গ্রন্থ আমাদের জীবন পথে আলোক বর্তিকাস্বরূপ।

সাম্প্রতিক রক্তপ্লাবনে আমরা বিপর্যস্ত; দানবীয় আসুরিকতার ধর্মধ্বংসী বিভীষিকার প্রলয়বহ্নিতে আমরা পরিদগ্ধ। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থ, আমাদের হৃদয়ের বিধিদত্ত আভ্যন্তরীণ সম্পদের পুণরুদ্ধারের পথে, দিব্য জ্যোতিরেখা স্বরূপ।

পাক বর্বতার অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বজ্রমন্ত্রনে যখন আমি সন্ত্রাসিত, যখন দিবসরজনী মৃত্যুর গর্জনে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত, যখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভ্রূকুটি জীবনকে করিয়াছিল দুর্বিষহ, তখনই এই গ্রন্থ আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে হতাশার অন্ধকারে দেখাইয়াছে নূতন জীবনের স্বর্ণালোক।

আজও দেখিতেছি চারিদিকে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য, অনির্বচনীয় মিথ্যা, কপটতা ও ভণ্ডামীর নগ্ন অভিব্যক্তি। দেখিতেছি ভদ্রবেশী বর্বরতা মানুষের মনুষ্যত্বকে পশুত্বের পঙ্ককুণ্ডে ডুবাইতেছে। তথাপি আমি বিশ্বাস করি, "মাইজভাণ্ডারী" যেই বিশ্ববিধাতার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারই অলজ্ঘ্য বিধানের সুনিশ্চিত পরিণামরূপে আসিবে পাপের নিশ্চিহ্ন বিলোপ, ছদ্মবেশী দানবের উচ্ছৃঙ্খল উৎকট অধর্মের অনিবার্য্য পতন। এই গ্রন্থে রহিয়াছে নরচিত্ত শোধনের প্রভূত অমূল্য উপাদান। মাইজভাণ্ডারীর সাধনা দ্বারা মানুষের মধ্যে ধর্মশক্তির নব-অভ্যুত্থান হউক, তাহাই কামনা করিতেছি।

॥ তেইশ ॥

এম. নুরুল ইসলাম
ফাজেলে আলীম (প্রথম শ্রেণি)

"বেলায়তে মোত্‌লাকা' এমন এক ছুফী সভ্যতার দর্পণ, যাহাতে তাজদারে মদীনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মোজতাবা (দ.) এর নবুয়ত জমানার পরবর্তী ১২০০ (বার শত) বৎসর এবং তৎপূর্ববর্তী গারে হেরার সাধনা যুগ সহ চরিতাবলীর "রূহানী" জীবন যাত্রার হদিস মিলে। যাহা বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ

জনিত ইতিকথার সংক্ষিপ্ত সারবস্তু। যাহাতে আদি যুগ হইতে দৈহিক প্রেরণা যোগে 'নাফ্ছ' প্রকৃতির সংশোধন, পশু প্রকৃতির বিনাশ; মানব আত্মা "রূহে ইনছানী"র সূক্ষ্ম ফেরেশ্‌তা প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন প্রণালী জনিত "রেয়াজত" সাধনা "মোজাহেদা" প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য স্থলের অভিন্নতার স্বরূপ মিলে। যদিও যুগের পরিবর্তন ও পারিপার্শিকতার তাকিদে অবস্থা ও বাহিরে পরিবর্তন দেখায়। কিন্তু প্রবৃত্তির বিরূদ্বাচরণে, দৃশ্য বস্তুর আড়াল অপসারণে "কল্‌বে ইনছানী" বা মানব অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতায় কাম ও লালসা প্রবৃত্তি হইতে বাঁচিয়া থাকা আর এমন সংসার ঝামিলা হইতে দূরে থাকা যাহার ফলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়। এই বেলায়তে মোত্‌লাকায় সর্বত্র একমতবাদী নমুনা পাওয়া যায়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এর নবুয়তপূর্ব এই সাধনা যুগকে গারে হেরা যুগ বলা যায়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় নবুয়তের পরেও এই রীতিনীতি বা উদ্দেশ্যে কোন ভাঙ্গন ধরে নাই। বরং সময় সময় হাল জজ্‌বা বিভোরতা এবং নিজ ও অপর হাস্তীর অবগতির অভাব পর্য্যন্ত প্রমাণিত হইতে দেখা যায়। তাছাওফে ইসলাম গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার ঘটনায় ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

تصوف اسلام۔ صفحہ 13

روایت ہے کہ آنخضرت (ص) پر کبھی کبھی وجد کی سی کیفیت نبوت کے بعد بھی طاری ہو جاتی تھی یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان دنیاومافیہا

کو، بلکہ خود اپنے آپ تک کو فراموش کر دیتا ہے چنانچہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ (رض) آپ (ص) کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، اور آپ (ص) اسی کیفیت میں تھے۔ آپ (ص) نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا، تو پوچھا۔

"تم کون ہو" ؟؟

وہ بولین! "مین عائشہ ہون !"

پھر آپ (ص) نے دریافت فرمایا - "عائشہ کون"؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ "ابو بکر کی بیٹی" آپ (ص) نے دریافت فرمایا۔ "ابو بکر کون"

وہ بولیں "محمدؐ کے دوست"

آپؐ نے دریافت فرمایا "کون محمدؐ؟"

اب حضرت عائشہؓ خاموش ہو گئیں کیونکہ انہون نے جان لیا تہا اس وقت آپؐ دوسری کیفیت مین ہیں

যাহাতে বুঝা যায় হযরত (দ.) এই সময় এমন ভাব-প্রবণতা বিভোর ছিল যে নিজ অস্তিত্বেরও কোন অবগতির অবকাশ ছিলনা।

এই "রূহানীয়তে ইনছানী" বা ছুফী সভ্যতার বিকাশ, "ছাহাবী" যুগের পরে জোরদার দেখা গেলেও তাহাতে সন্ত্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। যেহেতু ইহা গারে হেরা যুগেই জোরদার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহা খোদার নৈকট্য লাভের ও নবুয়ত প্রাপ্তির অগ্রদূত ছিল।

ইহাও অনস্বীকার্য্য যে, ছাহাবা যুগে রাসুল করিমের প্রত্যক্ষ দর্শন ও সাহচর্য্যতা জনিত সুযোগের আচার ধর্ম নিষ্ঠা ক্রমে অনুকরণ বস্তু যুগের দীর্ঘতার ফলে, ধর্মের ঐ সূক্ষ্ম দিকে শিথিলতা, প্রাণহীনতা আসা স্বাভাবিক ছিল। যাহার ফলে এই ছুফী সম্প্রদায় কর্ম পদ্ধতিতে এই অন্তর বস্তুকে বাড়াইয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা না হইলে ধর্মের আসল বস্তু অকেজো হইয়া পড়িত। "রিয়া" বা লোক দেখানো ধর্মের ফলে অহঙ্কার অহমিকা পর-মত অসহিষ্ণুতা, মতবিরোধ, ফাছাদ বৃদ্ধি, আসল মানবধর্ম বিলোপ, স্বভাবে পরিণত হইতেছিল। হযরত হাফেজ সিরাজী বলেন ঃ–

(۱) راز درون پرده ز رندان مست پرس
□ین حال نیست صوف□ عال□ مقام را
(۲) ریا حلال شمارند و جام باده حرام زہ□ طریقت وملت زہ□ شریعت و□یش۔
(۳) مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ ول□ معاشر رندان پارسا م□ باش۔

অর্থাৎ ঃ–

(১) পর্দার আড়ালে যেই রহস্য তাহা বিভোর-চিত্তদের নিকট তালাশ কর। যেহেতু এই অবস্থা উচ্চ মকামের ছুফীদের নিকটও থাকেনা।

(২) রিয়াকে যাহারা হালাল মনে করে আর সরাব পাত্রকে হারাম মনে করে; ইহা কোন ধরণের তরীকত ও ধর্ম? কোন্ ধরণের শরীয়ত এবং চরিত্র?

(৩) ওহে হাফেজ! যেই ব্যক্তি নিজ পরিচয় রাখেনা তাহার মুরীদ হইওনা। যাহারা লোকনিন্দার ভয় করেনা এবং পবিত্র অন্তর; তাঁহাদের সংসর্গ গ্রহণ কর।

এহেন অবস্থায় যাহারা ছুফী মতবাদ বা আধ্যাত্মিক ভাব-প্রবণতাকে ইসলামের বাহিরা, ধার করা মতবাদ বলে, তাহাদের দাবী মোটেই সত্য নহে। বরং ইহাই সত্য, যেইখানে "রছমী" ধর্ম বা যেই ফর্মালিটির দরুণ তাহার আসল বস্তু, ভাবপ্রবণতা হারাইতে ছিল সেইখানে তাঁহারা এই ছুফী আচার মাধ্যমে ধর্মকে প্রাণবন্ত সজীব করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই মুহিউদ্দীন উপাধিধারী দেখা যায়।

তাঁহাদের এই রূহানী ফজিলতের ফলে, দলে দলে জনগণ, ইসলাম ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে এবং ইসলামী সুশীতল ছায়াতলে দলে দলে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। প্রাণহারা আচার ধর্মের বা ধার্মিকের লোক দেখানো ধর্মের প্রভাবে ইসলাম যে জনপ্রিয়, এই দাবী ইতিহাস স্বীকার করেনা। বরং এদের একগুঁয়েমী, মানবজাতিকে ইসলামী সৌন্দর্য্যতা ও উদারতা বুঝার আগ্রহকে প্রশমিত করিতে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। যাহা চির সত্য। যেই কারণে মোসলমানেরা আজ বিচ্ছিন্ন ও দ্বিধা বিভক্ত। এতদ্ সত্ত্বেও আচার ধর্মে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করা সম্ভব না হইলেও এই নৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ববাসিকে একত্রক্রমে বিশ্ব-সাম্য প্রচেষ্টায় ছুফীয়ায়ে কেরামদিগকে একাধারে সচেষ্ট দেখা যাইতেছে। তাই এই সনাতন ইসলামী সাম্য প্রচেষ্টাকে জোরদার মানসেই "বেলায়তে মোতলাকা" এক অলীয়ে কামেলের জাতে-পাকে পূরবী সূর্য্যের মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যিনি বিগত আগত (নিছ্‌বতাইনে আ'দমীর) ছুফী সভ্যতার সূক্ষ্ম সাধনা পন্থার সমাবেশকারী বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন "গাউছুল আজম"। বিশ্ববাসিকে ঝামিলামুক্ত জীবন যাত্রার মাধ্যমে মুক্তি দিবার মানসে "উছুলে ছাবয়া" বা সংক্ষিপ্ত সপ্ত

পদ্ধতির প্রবর্তনকারী। হযরত শায়খে আকবর আল্লামা মুহীউদ্দীন আরবীর পরিভাষায় যিনি "খাতেমুল অলী" ও "খাতেমুল অলদ"।

যিনি বিশ্ববাসীকে স্বধর্মে বহাল রাখিয়া সত্য সত্ত্বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে এবং ঐ খোদায়ী শক্তির অধিশ্বর অলৌকিকত্ব সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি আস্থাশীল, নৈতিক ধর্মে বিশ্বাসী; নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোঁড়াবাদ হইতে মুক্তির সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং যিনি এই খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির আনুগত্যতায় উৎসাহিত করেন ও সাহায্যকামীর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। যাহা তাঁহার কর্মজীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রমাণিত। লিখকের প্রকাশিত জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে এই সব তত্ত্ব সম্পন্ন একখানা গ্রন্থ রচনার ফলে বাংলা সাহিত্যকে, ছুফী সভ্যতার আলোক প্রদানকারী এক অভিনব পন্থার সন্ধান দিতে সমর্থ দেখা যায়। যাহা নেহায়ত দার্শনিক সত্য।

ভাষা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছুফী সভ্যতার গন্ধযুক্ত উঁকিমারা পর্যায়ের এবং সত্যের আমেজ যুক্ত পক্ষপাতিত্ব হীন।

প্রমাণাদিও মূল কেতাবের অবিকল। পরিবেশন গুলি, নবীয়ে ছালাছা হইতে বেলায়তের শেষ স্তর, বেলায়তে মোতলাকা যুগ পর্য্যন্ত, শৃঙ্খলার সহিত বর্ণিত বলিয়া মনে হয়।

আশা করি পাঠক সূধীবৃন্দ বুঝিতে সক্ষম হইবে যে, ছুফী সভ্যতায় বিশ্ব ঐক্য ও ইছলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে ছুফীয়ায়ে কেরামের কত মহান গুরুত্বপূর্ণ স্থান! শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবে খোদায়ী ফজিলতের পরিচয় কি? খোদা সান্নিধ্যতার মনোভাব ও বিশ্ব ঝামিলা মুক্তির সরল, সহজ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাত্রার সন্ধান পাইতে সমর্থ হইবে এবং সুনেতৃত্বের প্রতি অনুরাগী হইবে। অনিয়মতান্ত্রিক ফাছাদী মনোভাব বিদূরিত হইয়া শান্তশিষ্টতা অনুরাগী মন লাভ করিবে এবং আশাকরি খোদাতায়ালার নৈকট্য আকাঙ্খী ও আল্লাহ্‌র প্রেরণা জাগ্রত লোকদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রবর্তিত সপ্ত পদ্ধতি দ্বারা তকাজায়ে নফ্‌ছানীর বিনাশক্রমে তকাজায়ে রূহানীর উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে।

চতুর্থ ভাগ

[শাশ্বত শিক্ষা]

উসুলে সাবআ [সপ্ত পদ্ধতি]

১. জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বজনীন মুক্তিদিশা

ইতিহাসের গভীরে চোখ বুলালে দেখা যায় যে; নিজের ভোগ প্রবৃত্তি দমন ও পরের কল্যাণার্থে কর্মসম্পাদনের উপকারী নীতির সাক্ষাৎ হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত সকল নবী-রসূলের জীবন সংগ্রামে পাওয়া যায়। প্রথম ওহী হেরা কন্দরে নবীজীর (দ.) ক্বলবে অবতীর্ণ হবার পর [সূরা আলাক: ৯৬: ১–৫] তিনি হযরত মা খাদীজার (রা.) কাছে তা ব্যক্ত করলে ওহীর অভ্রান্ততার প্রমাণ হিসেবে তিনি যে বাস্তব বিষয়গুলো তুলে ধরেন, সেগুলোতে সৎ-নির্বিলাস জীবন যাপন পদ্ধতির বীজ ও শিক্ষা নিহিত। মা খাদীজা (রা.) বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে কিছুতেই অপদস্ত করবেন না। কারণ, মানবিক পরম উৎকর্ষের মূল খাসনত ও স্বভাব সাতটা, যা আপনার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান : (১) আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, আত্মীয়তা রক্ষা করে চলেন, আত্মীয়দের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন না [ইন্নাকা লাতাসিলুর রাহিম], (২) আপনি সদা সত্যবাদী, আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না [ওয়া তাছদুকুল্ হাদিস], (৩) আপনি চিরকাল পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী আমানতদার, আমানতের খেয়ানত আপনি জীবনে কখনো করেন নি [লাতুওয়াদ্দিল আমানাতা], (৪) আপনি অনাথ-অক্ষম, এতিম, বিধবা, অন্ধ, খঞ্জের বোঝা বহন করে থাকেন, অর্থাৎ যাদের উপার্জন করার ক্ষমতা নেই, তাদের রুজি-খাওয়া-পরা ও থাকার ব্যবস্থা আপনি করে থাকেন [ওয়া তাহ্‌মিলুল কাল্লা], (৫) আপনি বেকার সমস্যার সমাধান করে দিয়ে থাকেন, উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজ না-পাবার কারণে অভাবগ্রস্তদের জন্য আপনি কর্মসংস্থানপূর্বক তাদের উপার্জনে সহযোগিতা করে থাকেন [ওয়া তাকসিবুল মাদুম], (৬) আপনি অতিথি সৎকার ও মেহমানের

খেদমত করে থাকেন [ওয়া তাক্বরিইদ দ্বায়ফা], (৭) আপনি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্ঘটনা ক্ষেত্রে দুঃস্থ জনগণের সাহায্যার্থ জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন [ওয়া তাঈনু আলা নাওয়াইবিল হক]।[১]

২. ওহীর ভার গ্রহণে ও বহনে ধাতস্থ স্থার্যপূর্ণ করার প্রক্রিয়ায় কিয়ৎকাল বন্ধ থাকার পর সূরা মুজাম্মিলের একেবারে প্রথমাংশে জাহেরী এবাদতের প্রকার বিষয়ক এবং একই সাথে সান্তনামূলক নির্দেশনা প্রদানের পর অবতীর্ণ। [সূরা মুদাস্সিরেও নবীজীকে (দ.) সান্তনা প্রদানের পাশাপাশি তৌহিদ প্রচারের পরামর্শ, আচরণ বিধির প্রাথমিক রূপরেখা, অতি সম্পদ অর্জনের লালসা সংবরণের উপদেশ, অন্যথায় এর করুণ পরিণতির হুঁশিয়ারীর তথ্য পরিবেশনপূর্বক ঘোষণা করা হয়েছে যে, "এই কোরআনই সর্বজন উপযোগী উপদেশ; অতএব যার ইচ্ছা হয় এটা থেকে উপদেশ করুক (৭৪: ৫৪–৫৪)।" অবশ্য এই সূরার বিভিন্ন অংশ মক্কায় প্রাথমিক প্রতিকুল অবস্থায় অবতীর্ণ হলেও পরবর্তীতে হযরত জিব্রাইলের (আ.) মাধ্যমে পরামর্শক্রমে এই সূরায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও প্রয়োগযোগ্যভাবে সন্নিবেশিত করা হয়। অতঃপর নবীজীকে (দ.) পৃথিবীতে মানবিক জীবনের কমন মানদণ্ড হিসেবে স্থাপন করে সূরা আদ্-দ্বোহায় একাধারে সান্তনা-আশ্বাস প্রদানের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক আবশ্যকীয় কর্তব্যকর্ম পালনের প্রেরণা দানের সাথে প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে রাব্বুল আলামিনের বাণী প্রচারের পরামর্শ দেওয়া হয়। (৯৩: ১-১১)। ৬১০ খ্রি. নবুয়ত প্রকাশের পর ওহীর মাধ্যমে পবিত্র কতিপয় আচরণবিধি তাঁকে অবহিত করা হয়। এরপর জাহেরী বাস্তব জীবনে ৬২১ খ্রি. আকাবার শপথ, ৬২২ খ্রি. আকাবার দ্বিতীয় শপথ, ৬২২ খ্রি. বিভিন্ন আঞ্চলিক গোত্র/গোষ্ঠীর (আধুনিক পরিভাষায় রাজ্যও বলা যায়) সাথে সম্পাদিত ঐতিহাসিক চুক্তিসমূহে তথা মদীনা সাধারণতন্ত্রের গঠনতন্ত্র, ৬৩০ খ্রি. মক্কা বিজয়কালীন ভাষণ তথা সনদ ৬৩১ খ্রি. বিদায় হজের ভাষণ তথা সর্বজনীন মানবাধিকার সনদসমূহে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মানবের স্বীয় চরিত্র নির্মাণের কায়দা ও সূত্রাদি অতি সহজ ভাষায় বর্ণিত। কারণ, ব্যক্তি সৎ ও শুদ্ধ না হলে নিজের জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক কোন জীবনই সুস্থ, অকপট, সুন্দর, শান্ত ও সৃজনশীল হতে পারে না। উসুলে সাবআয় এসব সূত্রের বিংশ শতকীয় মননোপযোগী সংক্ষিপ্ত যার অতি সহজ-সরলভাবে বিবৃত হয়েছে।

এই ধারাবাহিকতায় শ্বাশত বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এই ক্ষুদ্রগন্থের নেই বিধায় উসুলে সাওয়ার যথার্থতার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে যৎ কিঞ্চিৎ আলোকসমাত করার চেষ্টা করা হলো –

(১) নবীজীর (দ.) অব্যবহিত পর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বংশীয়, আত্মীয়বর্গ, প্রতিবেশি হামচায়াবর্গ, অন্য বিশ্বাস পোষণকারী, বিদেশী-বিদেশিনী, প্রাণী ও প্রকৃতি জগৎ সম্পর্কে আল-কোরআন ও হাদিসের আলোকে ফতোয়া বা আইনগত অভিমত প্রদানকারী, অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুসরণ বা প্রয়োগযোগ্য পন্থা নির্দেশ ও পরামর্শক হিসেবে সেই-ই তখন থেকে এখনো পর্যন্ত সর্বস্বীকৃত তুরিস্ট হিসেবে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন উম্মুল মু'মিনিন বিদূষী, জ্ঞানী মা হযরত আয়েশা (রা.)। আটপৌরে পার্থিব জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তিসিদ্ধ গাইড লাইনের প্রধান উৎস হিসেবে তিনি এখনো বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত ও অনুসৃত।[২]

(২) এরপর খোলাফায়ে রাশেদা বা পাঁচজন সৎ খলিফার অবস্থান, যাঁরা অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও রাষ্ট্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুভার বহনের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিগত-পারিবারিক ও আটপৌরে সামাজিক জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত হিসেবে একাধারে নিজেদেরকে স্থাপন করেছেন এবং এর পাশাপাশি তৎকালীন সময়কার পরিস্থিতিতে লিখিত পত্র বা ফরমান বা নির্দেশনা যথাপ্রেক্ষিতে অনুসরণীয় সূত্র বা মূলনীতি ব্যক্ত করে গেছেন, যেগুলো বিজ্ঞদের মতে শাশ্বত কর্মনীতির মর্যাদায় অভিষিক্ত।

(৩) এরপর আসেন চারিজন মহান ইমাম, যারা আধুনিক পরিভাষায় অতি উচ্চ মর্যাদার জুরিস্ট বা ব্যবহার বিশারদ হিসেবে স্বীকৃত এবং পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে আস্তিক্যবাদী বিশ্বে যথাপ্রেক্ষিতে অনুসৃত। অনাস্তিক্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলেও তাঁদের সূত্র শ্রদ্ধাভরে অনুসৃত হতে দেখা যায়। এই তালিকায় যুক্ত আছেন বিজ্ঞমহলে পঞ্চম ইমাম হিসেবে বরিত মহান দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, সুফি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে 'বৃত হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.)। তাঁর আরবী ভাষায় ইহ্‌হিয়াউ উলুমিদ্দিন' এবং ফারসি ভাষায় এর কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ততর ভার্সান 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' ভাষা-বর্ণ-ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেক যুগের প্র ‡ ত্যেক আদম সন্তানের জন্ম থেকে পৃথিবী ত্যাগ পর্যন্ত সময়ের প্রত্যেক স্তর ও পর্যায়ে

জীবন যাপন ও সর্বক্ষেত্রে অগ্রপদক্ষেপ প্রদানের সূত্র পরিপূর্ণ পার্থিব–জীবনের গণিতরূপে বিশ্বময় এ যুগেও বৃত।

(৪) এ পর্যায়ে 'বেলায়তে মোত্‌লাকার' জ্ঞানতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্বের অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হযরত ইমাম গাজ্জালীর (র.) ইহ্‌হিয়াউ উলুমুদ্দীন তথা কিমিয়ায়ে সা'আদাতের পৃষ্ঠা উল্টানো যাক। তিনি এই মহান পুস্তকের 'সূচনা' অধ্যায়ে বলেছেন : "কিমিয়া বা চিত্ত শুদ্ধি প্রণালী শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য এই যে, ইহার সাহায্যে মানবাত্মা অন্যায় ও অনিষ্টকর কাজসমূহ হইতে মুক্ত ও পবিত্র উপযোগী গুণাবলী এ স্বভাবের অন্ধকারে বিভূষিত হইতে পারে; স্পর্শমনি তাহাই-যাহার ক্রিয়ায় মানুষ ইহলোকের সুখ-সম্পদ হইতে বে-নিয়াজ হইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় প্রিয়তম রাসুলকে এই কিমিয়া অর্থাৎ মহামানবে পরিণত হওয়ার প্রণালী শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন "এবং আপনার রব্ব-এর নাম স্মরণ করুন, আর সমস্ত কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন ও বে-নিয়াজ হইয়া তাঁহার প্রতি উত্তমরূপে আকৃষ্ট থাকুন (৭৩:৮)।" এই আয়াতটির আর একটি উদ্দেশ্য হইল: যাবতীয় বস্তু এবং বিষয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।... প্রাণী স্বভাব মানুষকে আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য লাভের উপযোগী করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিদ্যার বিশদ বিবরণ বহু বিস্তৃত, বরং সীমাহীন।...এই বিদ্যার প্রাথমিক ভূমিকা স্বরূপ প্রথমতঃ চারিটি বিষয়ের মারেফাত বা দর্শনপূর্ণ জ্ঞান ও পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এই বিদ্যার রোকন বা প্রধান অবলম্বন ও খুঁটি স্বরূপ চার প্রকার আমল বা কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। প্রত্যেক আমল দশটি করিয়া বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চতুর্বিধ জ্ঞান এবং আমল বিভাগ চতুষ্টয়ই প্রকৃত মুসলিম (তথা খাঁটি মানুষ) হবার পথ। প্রথমোক্ত চারিস্ট বিষয়ের জ্ঞান খাঁটি মুসলিম হবার **প্রাথমিক আয়োজন** বা সুচনা বা ভিত্তি। শেষোক্ত আমল বা **কর্মানুষ্ঠান বিভাগ** চতুষ্টয় খাঁটি মুসলিম **হবার প্রধান অবলম্বন বা খুঁটি**।

কিমিয়ায়ে সা'আদাতের কর্মানুষ্ঠান চতুষ্টয়:

প্রথম কর্মানুষ্ঠান–আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতসমূহ পালন করা, ইহা এবা নামে অভিহিত। এতদসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অর্থাৎ এবাদৎ খণ্ডে দশটি পরিচ্ছেদ লিখিত হইবে। **প্রথম পরিচ্ছেদ–** সুন্নত আল জামাআতভুক্ত

মুসলমানদের 'আক্বীদা বা বিশ্বাসের বিবরণ। **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ–** বিদ্যা অর্জন করা। **তৃতীয় পরিচ্ছেদ–** দৈহিক পবিত্রতা বা অঙ্গশুদ্ধি। **চতুর্থ পরিচ্ছেদ–** নামায। **পঞ্চম পরিচ্ছেদ–** যাকাৎ। **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ–** রোযা। **সপ্তম পরিচ্ছেদ–** হজ। **অষ্টম পরিচ্ছেদ–** কোরআন শরীফ তেলাওয়াৎ। **নবম পরিচ্ছেদ–** আল্লাহ্ তাআলার যিক্র (স্মরণ) দোআ [প্রার্থনা এবং ওযীফা (নিত্য অভ্যস্ত দৈনন্দিন কর্ম)] সম্পাদন। **দশম পরিচ্ছেদ–** নিত্যাভ্যস্ত দৈনন্দিন কর্মের জন্য ধারাবাহিক সময় নিরূপণ। **দ্বিতীয় কর্মানুষ্ঠান–** লৌকিক আচার-ব্যবহার চলাফেরা, স্থিতি, জীবিকার্জনাদি কার্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাধা করিতে অভ্যস্ত হওয়া। ইহাকে 'সামাজিক আচরণ' বলা হয়। এতদসম্বন্ধীয় বিবরণ তৃতীয় অর্থাৎ আচার-ব্যবহার খণ্ডে দশটি পরি" ছদ বর্ণিত হইবে। ১। পানাহারের নিয়ম পালন ২। বিবাহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী। ৩। জীবিকার্জন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী। ৪। হালাল জীবিকা অন্বেষণ । ৫। সংসর্গ সম্বন্ধীয় বিধান। ৬। নির্জনবাসের নিয়মাবলী ভ্রমণের নিয়মাবলী। ৮। সঙ্গীত শ্রবণ সম্পর্কে পূর্ণ তাহকীক। ৯। সৎকার্যে নির্দেশ প্রদান এবং অসৎকার্যে নিষেধ সংক্রান্ত নিয়মাবলী। ১০। প্রজাপালন ও রাজ শাসন সংক্রান্ত বিধানাবলী। **তৃতীয় কর্মানুষ্ঠান–** মানবতা বিনষ্টকারী দোষসমূহের বিবরণ এবং উহার সংশোধন প্রক্রিয়া। কাম, ক্রোধ, বিদ্বেষ অহংকার, অভিমান ইত্যাদি চরিত্রগত দোষ এবং কু-অভ্যাসগুলি চিনিয়া নিজকে উহা হইতে সংযত বিরত রাখা। এই দোষ' লি মানবতা বিধ্বংসী এবং পরলোকে মানুষের বিনাশ-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া এ গুলিকে বিনাশকারী দোষ বলা হয়। এ সমস্ত দোষ সংশোধনের বিবরণ এই গ্রন্থের ৪র্থ অর্থাৎ বিনাশনখণ্ডে দশটি অধ্যায়ে বর্ণিত। (১) সুপ্রবৃত্তির উন্নতির জন্য আত্মিক পরিশ্রমের সাহায্যে রিপুসমূহের বিরুদ্ধাচরণ, (২) অতি ভোজন ও কাম রিপু দমন, (৩) অতিরিক্ত কথন প্রকৃতি এবং বাক সম্বন্ধীয় বিপদসমূহের প্রতিকার, (৪) রোষ, ঈর্ষা, কপটতা ইত্যাদি দোষসমূহের প্রতিকার, (৫) সংসারাসক্তি রোগের চিকিৎসা, (৬) ধনৈশ্বর্য এবং বিলাস-বিভবের স্পৃহাবিদুরীকরণ, (৭) জাঁকজমক ও পদমর্যাদার মোহ নিবারণ, (৮) এবাদতে রিয়াকারী বা কৃত্রিমতা এবং মোনাফেকী বা কপটতা বিদুরীকরণ, (৯) গর্ব ও অহমিকা দমন, (১০) আত্ম-প্রবঞ্চনা এবং অসাবধানতা বিতাড়ন।

৪র্থ কর্মানুষ্ঠান আত্মসৌষ্ঠব সম্পাদন সম্বন্ধে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, আশা, আল্লাহ্তাআলার প্রতি নির্ভর ইত্যাদিরূপ চরিত্রগত ও সৎস্বভাব গুণের পরিচয়

লাভ করিয়া আপ্রাণ চেষ্টায় তাহা অর্জন করা। এসমস্ত সৎগুণাবলী মানুষকে পরলোকের বিনাশপ্রাপ্তি হইতে পরিত্রাণ প্রদান করে বলিয়া এগুলিকে উদ্ধারকারী বা পরিত্রাণকারী গুণ বলে। এসমস্ত গুণের বিশদ বিবরণ গ্রন্থের এম বা পরিত্রাণ খণ্ডে দশটি অধ্যায়ে বর্ণিত। যথা (১) তওবা–অর্থাৎ কৃত। পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সৎপথের দিকে ধাবিত হওয়া, (২) শোকর ও ছবর– নেয়ামত প্রদাকারীর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং যাবতীয় বিপদে ধৈর্য ধারণ, (৩) শাস্তির ভয় এবং রহমতের আশা পোষণ, (৪) অল্পে পরিতৃপ্তি এবং বিভবে বৈরাগ্য অবলম্বন, (৫) এবাদতে নিয়্যত ঠিক রাখা, অকপটতা এবং সততা বজায় রাখা, (৬) মোরাকাবা অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও রিপুসমূহের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং মোহাসাবা বা আত্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, (৭) তাফাক্কুর অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে চিত্ত করা, (৮) তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার একত্ব জ্ঞান এবং তাওয়াক্কুল অর্থাৎ তাঁহার উপর ভরসা রাখা, (৯) আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি প্রেম এবং অনুরাগ, (১০) মৃত্যু এবং মৃত্যুর অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করা।

মুসলমানীর প্রধানতম অংশ জ্ঞান। ইহার অভাবে খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না। তজ্জন্য কখন কখন জ্ঞান অর্থে খাঁটি মুসলমান হওয়ার নীতিও ধরা হয়। আবার জ্ঞানের উপদেশ অনুযায়ী ‘আমল’ বা কর্মানুষ্ঠান না হইলে জ্ঞান লাভ কোন কাজে আসে না বলিয়া কর্মানুষ্ঠান প্রত্যেক মানবের কর্তব্য। কর্মানুষ্ঠানগুলিকে খাঁটি মুসলমান হওয়ার খুঁটি বা স্তম্ভের সহিত তুলনা করা হয়। আমরা কর্মানুষ্ঠানকে কখন কখন কর্তব্য-কার্যও বলিব।

মানবের কর্তব্য ত্রিবিধঃ যথা– (১) আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান বা এবাদত, (২) মানব জাতির প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান বা সামাজিক আচার, ব্যবহার (৩) নিজের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান; ইহাকে আবার দুইভাগ করা হইয়াছে, (ক) আত্ম-দোষ সংশোধন (খ) আত্ম-সৌষ্ঠব সম্পাদন[৩]। এই সমস্ত কথা লইয়া এই গ্রন্থটিকে ৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

৫. মন্দ-ভালোর অব্যাহত দ্বন্দ্ব এবং এর ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে ব্রতী মানুবকুলঃ

মানব-সভ্যতার জ্ঞাত ইতিবৃত্ত থেকে যে উপসংহার স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকিতেও লোকসমক্ষে উপস্থিত হয়, তা মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব, ভোগ-প্রবৃত্তি পূজার বিরুদ্ধে ত্যাগ-সংযম ও মানুষের অন্তর্জাত সৎসত্তার অব্যাহত সংগ্রাম। হযরত আদমের (আ.) সন্তান হাবিল-কাবিলের পরস্পর বিপরীতমুখী

মনন ও স্বভাব; হযরত শীসের (আ.) উপর নাযিলকৃত শাশ্বত শিক্ষা; এর ধারাবাহিকতায় যথাক্রমে হযরত ইয়ানিশ <কায়নাথ <মাহলীল <ইয়াকুদ-এর সময়কাল গড়িয়ে যায়। এরপর আসেন হযরত ইদ্রিস (আ.); যার উপর একটা সহিফা নাযিল হয় (গ্রীক ভাষায় তাকে আরমীস/তারমীস/হিব্রু ভাষায় যনুখ বা খানুক, আরবী ভাষায় আখলুক বলা হয়)। কলমের দ্বারা লেখা আবিষ্কার, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, ওজন ও পরিমাণ পদ্ধতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, বস্ত্র সেলাই, জলবায়ু বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, গৃহ বা অট্টালিকা নির্মাণ শিল্প, রাষ্ট্র গঠন ও প্রশাসন পদ্ধতি, ঐক্যবদ্ধ নগর জীবন গঠন এবং উপযোগী আচরণবিধি নিয়ম-কানুন প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়াদি তাঁর সময় থেকে সূচিত হয়। আল-কোরআনে ১৯:৫৬ এবং ২১:৮৫-৮৬ আয়াতে তাঁর কথা বর্ণিত আছে। বর্তমান ভূগোল খ্যাত মিশরে তিনি হিযরত করেন ব্যাবিলন থেকে তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে। তাঁর সময়ে ৭২টি ভাষা প্রচলিত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর প্রচলিত শিক্ষা ও উপদেশগুলোর মধ্যে কয়েকটা হলো, (ক) জ্ঞান-বিজ্ঞানই আত্মার জীবন, (খ) নিকৃষ্ট উপার্জন পরিহার করো, (গ) তোমরা তোমাদের সৎ শাসকদের আনুগত্য করবে, বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে অবনত থাকবে এবং সর্বদা মুখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে।

এরপর সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে সৎ-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন পদ্ধতির শিক্ষা ও জ্ঞানসহকারে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত নবী-রাসুল আগমন করেন। তাঁরা ধারাবাহিকভাবে উৎকট ভোগলিপ্সা, জুলুম-শোষণ-পীড়ন, দুর্বলের উপর অত্যাচার ও শোষণ তথা দাসপ্রথা [হযরত মূসা (আ.)], অর্থ ব্যবসা [হযরত ঈসা (আ.)] প্রভৃতি তথা আল্লাহ্‌র বহুত্ববাদী পালনবাদী বা রবুবিয়াত নীতির পরিপন্থী অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। নিজেরা নির্যাতিত হন, তবে পৃথিবীতে মানব সমাজের জন্য বিপুল অবদান রেখে যান, যা এখনো তরতাজা রয়েছে। সর্বশেষ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে প্রেরিত হন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)। সৎ শিক্ষার মশাল, শান্তিপূর্ণ সম্মিলিত জীবন যাপনের ছত্রছায়া স্বরূপ শাশ্বত সামগ্রিক নীতিমালা তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব সমাজে প্রেরিত হয়। মনে রাখা দরকার, মানুষকে আর্‌দ্ব বা পৃথিবীতেই আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।[৪]

৬. মন্দ ও ভালো দুটো সমান্তরাল পরস্পর বিরোধী বহমান ধারা

মানব ইতিহাসের ধারাবাহিক গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মন্দ ও ভালো এই দুটো চেতনা মানুষকে সৃজনকালেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে (৯১: ৭–৯)। মানব সমাজে একটা প্রবাদরূপী সত্য প্রচলিত আছে যে, একশ্রেণির মানুষ অন্যায় ও পাপ করে সজ্ঞানে, জেনে-শুনে। এর বিপরীতে পুণ্য ও কল্যাণসূচক অনেক কাজ সে নিজের অজ্ঞাতেই করে বসে। ভালো মন্দের এই দুটো ধারা সমান্তরালভাবে বইলেও কোন অবস্থাতেই একসাথে মিল-মিশ খায়না। নবীজীর (দ.) পর সংশোধনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ইতোপূর্বে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চারি ইমাম ও মহান সিহাহ্‌সিত্তার সংগ্রাহক-সংরক্ষকদের কথাও এসে পড়ে। মহান হাদিস সংগ্রাহকবৃন্দ মানবজাতির জন্য মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছেন, তা হলো ইতিহাসের সত্য ও শিক্ষা সংগ্রহ-সংরক্ষণের জন্য স্বীয় পার্থিব সুখ-শান্তি-কামনা-বাসনা, এমনকি পরিবার-পরিজনকে কুরবানী দিয়ে একনিষ্ঠ সাধনা করতে হয়। তৎকালীন কঠিন ও স্বল্পসুবিধাক্লিষ্ট সময়ে তাঁরা বড় জোর দুই প্রস্ত পরিধেয় বস্ত্র, আহার্য-পানি পান করার জন্য একটা কিম্বা দুটো পেয়ালা এবং নিজের কাফনের কাপড় থলেতে নিয়ে জ্ঞান ও সত্য অনুসন্ধানের অন্তহীন ময়দানের পথিক হতেন!!

পাঁচ সৎ-খলিফা অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদার (৬৩২–৬৩১ খ্রি.) পর বিশেষ করে অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং পরিবর্তিত প্রগতিশীল অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে জনগণের শিক্ষা ও চেতনার মান বিকশিত না হবার সুযোগে তৎকালীন রোমক, পারসিক প্রভৃতি রাজতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির আদলে মুসলিম অধ্যুষিত জাহানে সালতানাত বা রাজতান্ত্রিক প্রশাসনপদ্ধতি চালু হয়। বায়তুলমাল শাসকদের পারিবারিক সম্পদে পর্যবসিত হয়। পারসিক, রোমক শাসকদের অনুকরণে যাজক শ্রেণিকে শাসক বর্গের আজ্ঞাবহ গোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়। এই সালতানতের মধ্যে অনেক মেধাবী, সৎ শাসকের আবির্ভাব ঘটলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক বাস্তব কারণে আল-কোরআন, নবীজীর (দ.) পথ নির্দেশনা এবং পাঁচ সৎ খলিফার আদলে প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই সময়ে চিন্তাবিদ, ধর্মবিদ, গোষ্ঠীস্বার্থ কবলিত রথী-মহারথীদের মধ্যে বিবিধ প্রকার মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে কালামীয়া, ইমামীয়া, তালিমীয়া, মুতাজিলা, আশারিয়া প্রভৃতি ধর্মীয়-দার্শনিক উপধারা সৃষ্টি হয়, যার

ফলে মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বজনীন যুক্তিসিদ্ধ পরিচ্ছদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অনেক রক্তপাতও ঘটে। অবশেষে চারি ইমাম, ইমাম গাজ্জালী (র.) প্রমুখের অনন্য সাধারণ মেধাজাত রচনাবলী কার্যকরভাবে এসব মতানৈক্য ও বিভ্রান্তি প্রতিরোধে সক্ষম হয়, যার বিশদ বিবরণ জেনারেল ও ইসলামিক দর্শন, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই ধারাবাহিকতায় অনেকের মধ্যে হযরত দাতা গঞ্জেবক্‌শ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাজবিরী (র.), হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.) প্রমুখ ভোগবিমুখ মহান ওলী-আল্লাহ্‌রা। তাঁরা উম্মি মানুষকে নিজ নিজ কালে কেবল যথার্থ পথ নির্দেশনাই দেননি, উপরন্তু তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞান পুস্তকাকারে আমানত রেখে গেছেন সৎ, সহজ, সরল জীবন পথের পথিকদের জন্যে। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর (র.) আবির্ভাব ঘটে মুসলিম জাহানের প্রশাসন, ধমআচার, সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিশৃংখল অবস্থায়। তাঁর জীবদ্দশায় একাধারে ছয়জন শাসক তখ্‌তে আসীন ছিলেন। তবে তাঁর ব্যক্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইসলামী জীবন ও বিধানকে তিনি সুশৃংখলরূপ দান করেন এবং অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ভাষায় তিনি বেলায়তে মোকাইয়াদা গাউসুল আযম রূপে অভিষিক্ত ও অনুসৃত। তিনি তাঁর প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছিলেন : "অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ন্যায়-বিচারের হক-কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ (আবু দাউদ, তিরমিজি)।' তবে আশার কথা এই যে, সেই ৬৩১ খ্রিস্টাব্দের প্রায় ১৪০০ বছর পর সামন্ততন্ত্র, অবাধ পুঁজিতন্ত্র, বিংশ শতাব্দীতে একদিকে হিটলার-মুসোলিনী-তোজোদের ডিক্টেটরশীপ–ফ্যাসীবাদী মাফিয়াতন্ত্র– সমরতন্ত্রের পাশাপাশি ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের পতন, ন্যূনপক্ষে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উত্থান, সমাজতন্ত্রবাদী সমাজের উত্থান ও পত্তনের অস্থির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে মহৎ মানব সন্তানরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে মানব জাতির প্রত্যেক সদস্যকে অভাবমুক্ত অবস্থায় মানুষের মতো বাঁচার অবকাশ ও পরিবেশ সৃষ্টির প্রত্যাশায় 'মানুষের শাসনবাদের নীতির পরিবর্তে স্রষ্টার সর্বজনীন পালনবাদ বা রবুবিয়াতের উদার ক্ষেত্রে চিন্তা ও দর্শনের নতুন চাষাবাদে অবতীর্ণ হচ্ছেন, যা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নীতি ভিত্তিক সমাজ সংস্কার, সংশোধন ও বিনির্মাণের অন্যতম লক্ষ্য।

৭. উসুলে সাবআ পাঞ্জেরীদের কথাঃ

উসুলে সাবআ শিক্ষা ও বাণী মানব সমাজের শুরু থেকেই জীবন্ত ও সক্রিয়। নবুয়ত-রেসালত পর্বের সূচনা থেকে অন্ত পর্যন্ত এবং এর পরবর্তীকালে তার ধারাবাহিকতার ইতিহাস প্রতিকূলতাপূর্ণ। এই প্রতিকূলতার অন্যতম কারণ মানবের সহজাত নফ্সানিয়াত অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও ভোগ প্রবণতা, লালসা। তবুও যুগে যুগে কালে কালে এক শ্রেণির পবিত্র চিত্ত সৎ মানুষ নিজেদেরকে সমূহ ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করেও সংযম-সাধনাপূর্ণ মানবতার পাঞ্জেরি হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এর কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে বোদ্ধা মানুষদের জন্য লিপিবদ্ধ করা গেলঃ (ক) হযরত দাতা গঞ্জেবক্শ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাজবেরী (র.) তাঁর 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে বলেন, 'যে ব্যক্তি পার্থিব কোন বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথে এটাই তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর যে ব্যক্তি স্বীয় নফ্স এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু হতে অনাসক্ত হয়, সেই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। এটা মনে রাখা উচিৎ যে, নিজের প্রতি উদাসীন হওয়াই মানুষের পক্ষে কঠিন কাজ। তাই যখন তুমি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তখন অন্য কিছুর সংশ্রব ত্যাগ করাও সহজ হবে।" (খ) হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানীর (র.) 'ফত্হুল গায়ব'-এর ৬৭নং বাণী বা ডিসকোর্সে বলা হয়েছেঃ "কোরআন ও হাদিসে প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করার বহু ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে। যখন তুমি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, তখন আল্লাহ্ তোমাকে সার্থক জীবন প্রদান করবেন। নফ্স বা কুপ্রবৃত্তি তোমার নিকট প্রতিক্ষণে তার কামনা পূরণ করার জন্য চেষ্টা চালাবে, তোমাকে হারাম ও গর্হিত কাজে লিপ্ত করানোর জন্য চাপ দিতে থাকবে। এমতাবস্থায় তুমি যদি অটল ও অবিচল থেকে তার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দাও, তাহলে তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাকে অফুরন্ত সাওয়াব দান করবেন। এর কারণ হল, নফ্সের সাথে এই কঠোরতা অবলম্বন হলো বিরাট যুদ্ধ স্বরূপ এবং তাতে কামিয়াবী হলো বিরাট যুদ্ধে বিজয় সদৃশ। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন; ছোট জিহাদ থেকে আমরা বড় জিহাদের দিকে ফিরে আসলাম। ছোট জিহাদ দ্বারা প্রতিপক্ষ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ এবং বড় যুদ্ধ দ্বারা নফ্স বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। নফ্সের সাথে যুদ্ধকে বড় যুদ্ধ বলার কারণ হলো, প্রবৃত্তির সাথে বিরোধ কাফিরদের সাথে বিরোধের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর।

নফ্স সদাসর্বদা মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত রাখতে চায়। আল্লাহ্পাক তাঁর নবীকে নফ্সের সাথে বিরোধের মাধ্যমে ইবাদত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।" মালফুযাতে গাউসুল আযম (ক.) গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে: 'আমরণ নফ্সকে কৃচ্ছ্র সাধনায় নিয়োগ কর। তারপরই সে ফকীহ্ ও আলেম হয়ে পুনর্জ্জীবন লাভ করবে। তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার দ্বার বন্ধ করে দাও। যখন তা দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন তার কামনা-বাসনা তোমার বাতেনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং সাধনার ফলে ক্বলব রূপান্তরিত হবে।"

হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) যখন ফাঁসি কাষ্ঠে তখন তাঁর কাছ থেকে শেষ উপদেশ প্রার্থী এক ব্যক্তিকে তিনি বললেন, তুমি তোমার নফ্সকে তোমার খেদমতে লাগিয়ে দাও, যদি তুমি তাকে নিজের কাজে লাগাতে না পারো, তবে উহা তোমাকে তার কাজে লাগিয়ে দেবে (মালফুজাতে গাউসুল আযম, নবম অধ্যায়)। হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি (র.) তাঁর একাদশ মজলিশ বা ডিসকোর্সে বলেন; আল্লাহ্ যাকে বন্ধু বানান, তার মাথার উপর দুঃখ-কষ্টের বৃষ্টি বর্ষন করেন। আহলে সুলুকদের তওবা তিন প্রকারের (ক) কম আহার (খ) কম শয়ন (গ) কম কথা বলা। এছাড়া আরো তিনটি বিষয় আছে (ক) আল্লাহ্র ভয় (খ) আল্লাহ্র উপর ভরসা (গ) আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা (অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ পালন) [সূত্র : দলিলুল আরেফীন : হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.)]। হযরত খাজা ওসমান হারুনী (র.) তাঁর সপ্তদশ মজলিশে দুনিয়া ও সম্পদ-সঞ্চয় সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া (ভোগ-বিলাস প্রবৃত্তিতোষণে প্রবৃত্ত হওয়া) কোন ক্রমেই পুণ্যাত্মাদের উচিত নয়। বরং তার উচিত, যা কিছু তার কাছে আছে, তা যেন সে খোদার রাস্তায় বিলিয়ে দেয়। কোন অবস্থাতেই কোন বস্তুর মোহে আবিষ্ট হওয়া তার উচিত নয় [সূত্র : আনিসুল আরওয়াহ্ : হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি (র.)]।"

হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) তাঁর প্রথম মজলিশে বলেন, "হযরত মূসা (আ.) উপাসনা, একাগ্রতা ও নির্জনবাসে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিলেন। যখন তাঁকে দর্শনের জন্য আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আওয়াজ এলো, 'একে পৃথক রাখো, কারণ এর সাথে দুনিয়ার আবর্জনা রয়েছে।" হযরত মূসা (আ.) ভীত হয়ে পড়লেন এবং পার্থিব বস্তু খুঁজতে দেখতে পেলেন যে, তাঁর সঙ্গে রয়েছে একটা সুঁই ও কাসাসুবি (এক ধরনের পাত্র)। তিনি নিবেদন করলেন,

'ইয়া বারে এলাহী এগুলো কি করবো? ওহী এলো, 'ফেলে দাও'। যখন এই সামান্য ও নগণ্য জিনিসের জন্য একজন পয়গম্বর দর্শনে বাধা পেলেন, তাহলে যারা পার্থিব বস্তুর নিকট নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে, তাদের উপায় কি হবে? [সূত্র : ফাওয়ায়েদুস সালেকীন : হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শকর (র.)]। মাহবুবে রব্বানী হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (র.) তাঁর দশম মজলিশে (শুক্রবার, ১২ জিলহজ, ৬৮৯ হিজরী) হযরত লুৎ (আ.)-এর সময়ের সামাজিক অবনতির করুণ পরিণতির ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন "তাঁর উম্মতের চরিত্রের মধ্যে যখন নিম্নোক্ত বদ-অভ্যাসগুলো প্রবেশ করেছিল, তখন আল্লাহ্‌র আদেশে আসমান থেকে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো এবং মাটিকে নির্দেশ দেওয়া হলো ঐসব দুশ্চরিত্র ও পথভ্রষ্টদেরকে গ্রাস করে নিতে। ঐসব বদ-কর্মগুলো হলোঃ (১) মদ্য বা নেশা পান করা, (২) সমমৈথুন ও ব্যভিচার করা, (৩) রঙিন ও লাল কাপড় পরিধান করা, (৪) লেংটি বা খাটো কাপড় পরিধান করা, (৫) যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য কামান (মারণাস্ত্র) তৈরি করা, (৬) কবুতরবাজী করা, (৭) অন্য কারো গীবত করা, (৮) ভবঘুরের মতো জীবন যাপন করা, (৯) পরস্পরের লজ্জাস্থান দর্শন করা, (১০) অন্যকে হযরত লুত (আ.)-এর মতো মনে করা। এরপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) থেকে বর্ণিত একটা হাদিসের কথা বলেন, ঐসব বদ-খাসলত ছাড়াও আরো বদস্বভাব দেখা দেবে যে, স্ত্রী লোক স্ত্রী লোক দ্বারা যৌন ক্ষুধা নিবৃত করবে।... ঐসব বদ অভ্যাসগুলোর বিস্তার ঘটলে আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে, অসুস্থতা বেড়ে যাবে, নতুন নতুন রোগ দেখা দেবে এবং জগতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পাবে।" বিগত শতাব্দীতে ভোগ সামগ্রীতে উন্নত বিশ্বে সমকামিতার মতো নির্লজ্জ বিষয়ে প্রকাশ্যে মেতে উঠেছে কিছু লোক, যা প্রকৃতিতে বিরাজিত সর্ব প্রকার নিয়ম বিরুদ্ধ এবং সেই কারণে অনুৎপাদনশীল, জঘন্য নোংরা ও ঘৃণ্য। অথচ ইতর পশু-পাখিরা পর্যন্ত এহেন প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ অপকর্ম করে না। সূত্রঃ রাহাতুল্লিল মুহিব্বীনঃ মহাকবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হযরত খাজা আমীর খসরু (র.)]।

এ পর্যায়ে হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর (ইন্তিকাল : ৮৭৫ খ্রি.) একটা বাণী স্মর্তব্যঃ 'তোমরা যদি কোন লোককে কারামত দেখাতে দেখো, এমনিকি সে বাতাসে ভাসতে পারে, তার ব্যাপারে প্রভাবিত হয়োনা, যতোক্ষণ না জানো যে, সে লোক আদেশ-নিষেধ, সীমারেখা রক্ষা ও শরিয়ত আদায়ে কতটুকু যত্নবান'

(তাজকেরাতুল আউলিয়াসহ বিভিন্ন গ্রন্থ)। মহান সাধক, সুফি, দার্শনিক, হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.), হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.), হযরত যুন-নুন সাওবান ইবনে ইব্রাহিম আল মিসরী (র.) শায়খুল আকবর মহীউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.) প্রমুখ আহওয়াল (আধ্যাত্মিক অবস্থা) ও মাকামাত (আধ্যাত্মিক অবস্থান) ভুবনের তাসাওউফী ইমামগণ আল-কোরআন, আল-হাদিস, শরিয়তের পতাকা সদা সমুচ্চ রাখতে পরিষ্কার তাগিদ রেখে গেছেন।[৫]

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ দৃশ্যমানভাবে মুখ্যতঃ এই তাগিদ ও সাধনারই বিংশ শতকীয় সংস্করণ, যা ভোগবাদে নিমজ্জিত, সংঘাত বিক্ষুব্ধ বিশ্বকে শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের পথের দিশা দেখাচ্ছে। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ঐ সব শিক্ষার সারবস্তু উসুলে সাবআ বা সপ্তপদ্ধতি রূপে বিন্যস্ত করে রেখেছেন তাঁর রচিত 'মানব সভ্যতা' পুস্তিকা বেলায়তে মোত্‌লাকা'র অষ্টম পরিচ্ছেদে 'সপ্তকর্ম পদ্ধতি' অংশে। এই সপ্তকর্ম পদ্ধতির পটভূমি হিসেবে তাঁর নির্মিত অধ্যাত্ম-সামাজিক সংগঠন 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী (১৯৬৯ইং) এর গঠনতন্ত্রে তৎ লিখিত ভূমিকা অংশও হুবহু নিম্নে পরিবেশিত হলো:[৬]

(ক) গঠনতন্ত্রের ভূমিকা :

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم
اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্‌তায়ালা, বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্বগুণে বিশ্ব-দরদী "খোদায়ী অনুগ্রহ" পাপীদের জন্য আশীষ-বাণী দাতা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর আদর্শ জীবন যাত্রায় "আল্ আমিন" বা বিশ্বস্ত জিম্মাদার উপাধি বাল্যকাল হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত শত্রু, মিত্র সকলের দ্বারা স্বীকৃত বিশেষণ। সেই বিশেষণের প্রভাবে বিশ্ববাসীকে "আদলে মোত্‌লাক বা বিচার সামোর" দিকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিতেছেন

فاعدلوا ان العدل ذات التقوى

(বিচার-সাম্য রক্ষা কর, কেননা বিচার সাম্যই পরহেজগারীর মূল।)

وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

আমি তোমাদের মধ্যে বিচার-সাম্য রক্ষার্থে আদিষ্ট হইয়াছি। (৪২ : ১৫)

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিচার-সাম্য, ধন সঞ্চয় ও বণ্টনে বুঝ-ব্যবস্থা এবং সামাজিক মানের ব্যাপারে, ধর্ম প্রাধান্যতার বিভিন্ন মতবাদের গোড়ামীর দ্বারা এই "আদলে মোত্‌লাক" বা বিচার-সাম্য, অতীতে মোকাইয়্যাদা যুগে নির্বিঘ্নে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু, বিশ্বের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পারিপার্শ্বিকতায় এই মানবীয় সত্য-সত্ত্বা মানবোধ অস্ত্রবলের নিকট মাথা নত ছিল। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও জাতিগত কল্যাণকামী ইচ্ছা বা স্বাধীনতার মান-বোধ পরিস্ফুটিত হইতে গৌণ বা দেরী ছিল। নবুয়ত যুগ ব্যক্তি মর্যাদা উন্মেষ যুগ বিধায় সর্বাত্মক বেষ্টিত চেতনা দান করিতে স্বভাবতঃই দুর্বল ছিল। তাই,

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰ□

"অলল্ আখিরাতু খায়রুল্ লাকা মিনাল উলা", কোরাণ বাণী মতে, অনন্ত স্থিতিশীল বেলায়ত যুগের চাহিদা মতে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' যুগের বিকাশ দান করিতে সমর্থ হয়। পাপীদের জন্য আশীষ স্বরূপ "শফিউল মোজনেবীন, রাহমতুল্লিল আলামীন"-এর অমর হেদায়ত ধারা এই বেলায়তে মোত্‌লাকা যুগে পূরবী-সূর্যের মতো বহু বিঘোষিত এক অলীয়ে কামেলের জাতে পাকে ভৌগলিক মধ্যরেখার পূর্ব পার্শ্বে প্রাকৃতিক বিশ্বাদর্শভূমি, সাধনার পীঠস্থান চট্টলে, বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মালামিয়া কাদেরী (ক.) আল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন আশীষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সার্বজনীন ঝামিলা মুক্ত সংসার জীবনে স্বাচ্ছ্যন্দদায়ী নিজ দৈহিক বা ভৌতিক আড়াল মুক্তি ও খোদা সান্নিধ্যতায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই অতি কামনার হাড়-ভাঙ্গা মেহনতী যুগে সহজসাধ্য ও গ্রহণযোগ্য দেখা যায়; তাঁহারই প্রবর্তিত মুক্তিবাণী **"সপ্ত পদ্ধতি বা উছুলে ছাবয়া"**।

অতএব, বিশ্ব-দরদী শান্তিকামী সেবক হিসাবে আমরা হজরত আকদাছের বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ববাণী বিশ্বের মুক্তি উন্মুখ খোদানুরাগী জন-গণের নিকট পৌঁছাইতে মনস্থ করিয়া, এই সেবা-ধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি। যাহা বিগত ১৯৪৯ ইং সালে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে প্রথম পত্তন হয়।

সাজ্জাদানশীন
খাদেমুল ফোক্বারা
সৈয়দ দেলাওর হোছাইন, মাইজভাণ্ডারী
প্রতিষ্ঠাতা,
আজুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী।[৬]

উসুলে সাবআ বা সপ্ত পদ্ধতি

মছনবী রুমী বলেন ঃ–

বলিয়াছেন নবীবর – আমার উম্মতে
আছে মোর সমকক্ষ গুণে আর হিম্মতে।
তাঁহার সপ্ত পদ্ধতি ঃ–

(১) "দেহ তত্ত্ব– পরদোষ পরিহার, নিজ দোষধ্যান পর মুখাপেক্ষিতা বর্জন। যাহার ফলে খোদা পথচারী ছালেক হিংসা ও ঈর্ষা মুক্তিতে আত্মশক্তি সামর্থের প্রতি আস্থাবান ও সৎরুজিতে সক্ষম হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে ঃ– **"ফানা আনিল খাল্ক"**।

(২) অনর্থ পরিহার– যাহা না হইলে চলে সেই কাজ কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা। যাহাতে মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসার ক্ষেত্রে ঝামিলা মুক্ত, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সংসার জীবন যাপন ও পরকালীন নিশ্চিত স্বর্গের অধিকারী সাব্যস্ত যাহা কোরানের বাণী। ছুফী পরিভাষায় বলে ঃ– **"ফানা আনিল হাওয়া"**।

(৩) স্রষ্টার ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ বাসনা কামনার নত ভাব, যাহার ফলে লক্ষ্যহীন ব্যক্তির সত্য জ্ঞান উন্মেষ এবং মুর্খতার বিলোপ হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে ঃ– **"তছলিম" ও "রজা"**।

এই গুণাবলীতে প্রথম স্তরের সংসার আসক্ত কু-স্বভাব বর্জনে মুখ্য ব্যক্তিদের স্বভাব অর্জিত হয়।

(৪) অধিকারলব্ধ বৈধ কাজে সংযম লাভ ও পাপ বিরত অভ্যাস মানসে বর্জন করা। যথাঃ– "রোজা" ইচ্ছাকৃত উপবাস। ছুফী পরিভাষায় বলে ঃ– "তাকওয়া" স্রষ্টা ভয়। যাহার ফলে এই পথচারী সূক্ষ্ম জগতের সন্ধান-আলো পায়।

(৫) পরের নিন্দাতে আত্মশুদ্ধি। যেহেতু নিজের অগোচর দোষের অবগতিতে দোষ মুক্তির সুযোগ, ফলে আক্রোশের পরিবর্তে বিশ্ববন্ধু ভাব লাভ হয়। ইহাতে উর্দ্ধশক্তি জগতে নিজের শক্তি অর্জিত হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে ঃ– **"কালো মৃত্যু"**।

(৬) কামভাব এবং লালসা মুক্ত হওয়া। যাহার ফলে খোদা পথচারী ব্যক্তি "মুখ্য" বা অলি উল্লাহ্দের মধ্যে গণ্য হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে ঃ– **"লাল মৃত্যু"**।

(৭) নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। যাহার ফলে "ছালেক" অর্থাৎ খোদা পথচারী প্রভাব সম্পন্ন বেলায়তে খিজরীর অধিকারী হইবে। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় বলে ঃ– **"সবুজ মৃত্যু"**।

এই সপ্ত পদ্ধতি ব্যক্তিকে, সম্প্রদায়, জাতি নির্বিশেষে মানবতা অর্জনে সহায়তা করে। মুক্তির দিশারী মনন প্রকৃতির সপ্তস্তর উন্নত মার্গে স্রষ্টা সান্নিধ্য দানের সহায়ক হয়। কামনা, বাসনা, অনর্থ ও অপচয় এবং ভৌতিক প্রেরণা আড়াল মুক্তিদান করে। সুতরাং, জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে সক্ষম যে, এই বেলায়ত বিশ্বজনিন ছুফী ধ্যান ধারণার প্রতীক। তিনি একজন বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গুণে গুণান্বিত বিধান শিথিল সকল ধর্ম শাস্ত্র গোড়ামী বিধান কঠোরতামুক্ত এবং "বেলায়তে মোত্লাকা" জামানার আরম্ভকারী, অতীত বিশ্ব বেলায়তের খোদা আনুগত্য বা সনাতন ইছলামের নৈতিক পূর্ণতাদানকারী। যাহা বিশ্বমান্য "এলহামী" মকাশেফার এলমে-লদুনীর কামেল অলিউল্লাহ্র কেতাব "ফছুছুল হেকম, হজরত তোরাব আলী কলন্দর রচিত "মতালেবে রশিদী", হাদিছ, কোরান ও কেতাব স্বীকৃত ভবিষ্যত বাণী মতে এবং সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য বুজর্গানেদীনের বাণী ও কাজ কর্মে সমর্থন আছে। তাঁহার জীবনী ও কেরামত নামক গ্রন্থ এবং বাংলা ভাষায় "বেলায়তে মোত্লাকা", উর্দু "আয়না-ই-বারী" তেও প্রমাণিত। মৌলানা রুমি বলেন–

১। "শেষ জামানার বিপদ মুক্তির জন্য ঐ ব্যক্তির আঁচল ধর, অনুসারী হও, যেই ব্যক্তির পার্থিব ভাব শিথিল এবং খোদায়ী ভাবধারা সজাগ-চেতনা সম্পন্ন।"

২। মনে কর সেই ব্যক্তি খোদার প্রতিচ্ছবি খোদাভাব দ্বারা জীবিত।

دامن او گیر زوتر بیگمان ☆ تارہی از آفت آخر زمان

سائیہ یزدان بود مرد خدا ☆ مردہ ایں عالم وزندہ خدا

উপরোক্ত বর্ণনাদির দিকে নজর দিলে সহজে বুঝা যায়, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) কি ধরনের খোদা পেয়ারা বুজর্গ। সংসার ত্যাগি না হইয়া সংসার বিরাগী খোদা অনুরাগী নীতিতে খ্যাত সম্পন্ন "ছায়েরে মা-আল্লার" অধিকারী। এরশাদী গাউছিয়াত "মসরব" চলত ভঙ্গি বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব পীরে কামেলের নিদর্শন।

বর্তমান পৃথিবীর হালচাল রীতিনীতি, খোদা-ভুলা ও নবী অলিগণের নীতি বিমুখ বল্গাহীন জনগণের অবস্থার পরিণাম চিন্তা করিলে দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবে যে, সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার মানসে "মছনবী রুমীর" হিত উপদেশ মতে এই বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন অলিয়ে কামেলের নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু বিশ্বমানবতার বিপদ মুক্তির জন্য এইরূপ স্বতস্ফুর্ত মুক্তির ফরমূলা বা রীতিনীতি অন্য কেহ বিশ্ববাসীর সামনে তুলিয়া ধরেন নাই।

তাই তিনি খোদা পেয়ারা বিশ্বঅলি এবং তাঁহার "ফজিলতে রব্বানী" খোদা প্রদত্ত, শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব। সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ঝামিলা মুক্ত ধর্মীয় রহস্য প্রধান হেকমত কৌশল। পবিত্র কোরানের বাণী মতে, "যাহাকে ধর্মের রহস্য হেকমত শিক্ষা দিয়াছেন সেই অনন্ত ভালাইর অধিকারী, ছুরায়ে বাক্বারা দ্রষ্টব্য।" বেলায়তে মোত্লাকা।

"হযরতের কিছু শাশ্বত শিক্ষা"

হযরত কেবলা বেলায়তী অমৃতধারা, মানবতার মলিনতা দূর মানসে যেইভাবে বিকাশ লাভ করিতে দেখিয়াছি; আমার স্মরণ মতে কতেক কথামৃত যথাযথ প্রকাশ করিতে যত্নবান হইলামঃ (১) কোরআন তেলাওয়াত (২) চান্দ্রমাসী [১৩,১৪,১৫] তারিখাদিতে উপবাস, রোযা, সংযম আদেশ (৩) তাহাজ্জুদ, এশরকে বা সালাতুত তছবীহের নামাযের হুকুম করিতেন। (৪) কাহাকেও বলিতেন, "হালাল খাও হারাম খাইওনা, দেখনা কবুতর বাছিয়া খায়, নিজ বাচ্চা নিয়া আনন্দে খোদার নেয়ামতের প্রশংসা কর।" (৫) কাহাকে বলিতেন, "চানচড়া যেইরূপ নিজের বাসায় চুপচাপ ধ্যানে খোদার "জিকির" স্মরণ করে, তুমিও ঐভাবে খোদা স্মরণরত হও।" (৬) কাহাকে বলিতেন, একটি পাটী পাতা ফুল বা "ঘইস্যা-ডাওলসের" ফুল (অর্থ-স্বচ্ছতা ও মিষ্টি খোদা প্রেম) নিয়া আসিতে পার নাই? (৭) কাহাকে বলিতেন, "ফেরেশ্‌তা কালেব" হও [পাপ বিরত, খোদা অনুগত] (৮) মৌলবী নুরুচ্ছাফা সাহেবকে বলিয়াছেন "আমপাড়া পড়" (সুফি পরিভাষায় দরূদ শরিফ যুক্ত) অযিফা "তেলাওয়াত" কর।

এই কথামৃতগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজে ধরা পড়িবে, এইগুলি তাঁহার ত্রাণকর্তৃত্ব সপ্ত পদ্ধতির খণ্ড অংশ, যাহা বিশ্ববিজয়ী ভাবধারা। হাফেজের বাণীঃ তোমার বিশ্বজয়ী চক্ষের পলক যখন বাহির হইয়া আসিল, দিল ঘায়েল জিন্দা মানবকুল একের ওপর অপর ঝাপাইয়া পড়িতে লাগিল।

এহেন অবস্থায় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি সর্বজনীন। সকল শ্রেণির লোক তাঁহার খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের সুফল গ্রহণ করিতে সুযোগ সুবিধায় অধিকারী। হযরত আকদাছ জীবিত থাকা অবস্থায়ও বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বেলায়তী সুধা বিতরণকারী "জজ্‌বাতি" "কামেল" খোদা নৈকট্য অর্জিত ব্যক্তির

খোদায়ী প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলনের ফলে মানব গৌরব উজ্জ্বলকারী খেলাফতের মশালধারী ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব বিকাশ লাভ করিয়া ছিল[৭]।"

টীকা:

১. সহীহ বুখারী, প্রথম খণ্ড, ৩নং হাদিস, (রাসুলুল্লাহ্‌র প্রতি ওহী নাযেল হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা অধ্যায়; বাংলা তরজমা, মওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরী ও মওলানা আজিজুল হক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৭ ইং, ঢাকা)

২. উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রা.) সংক্রান্ত ইতিহাস, বিবরণ বর্তমান বিশ্বের সকল ভাষায় রচিত, অনুদিত গ্রন্থাদিতে বর্ণিত।

৩. কিমিয়ায়ে সা'আদাত বা সৌভাগ্য পরমশ মণি, প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদঃ মওলানা নুরুর রহমান এম. এস (বরেণ্যে ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ এছহাক-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত; ১৯৭০ইং (নতুন সংস্করণ)।

৪. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড থেকে চতুর্দশ খণ্ড দ্রষ্টব্য, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৫. 'ইসলাম' প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম সংগঠিত লোকায়ত ধর্ম। মানব সমাজের ইতিহাসের অতীতের সব সুশিক্ষা ধারণ করে শাশ্বত সৃজনশীল শান্তিবাদী জীবন যাপনাচারের পথ নির্দেশনাই এ ধর্মের অন্যতম প্রধান ব্যবহারিক উদ্দিষ্ট। এতে কোন প্রকার বক্রতা, জটিলতার মার প্যাঁচ নেই। মানুষকে সব ধর্মের ইঙ্গিত পবিত্র প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ার তালিম ও প্রেরণা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। নবীজী (দ.) পরবর্তী পাঁচ সৎ খলিফা, মহান মুসলিম দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক কবি, শিল্পী প্রমুখ মূলতঃ প্রগতিশীল বিবর্তনবাদী পালনবাদী সমতাবাদী দর্শনই প্রচার ও অনুশীলন করে গেছেন। ইটালীতে উদ্ভূত রেনেসাঁ পরবর্তী যন্ত্রশিল্পোন্নত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক রাজশক্তিগুলো অনুন্নত কৃষিনির্ভর এশিয়া-আফ্রিকা-দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র দেশসমূহ শক্তি ও ছলে দখল করে তথাকার সম্পদ লুণ্ঠনের পাশাপাশি সহজ-সরল-মানবতাবাদী যৌথ সহাবস্থানমূলক সমাজ বিন্যাস ধ্বংস করে দেয়। ভারতবর্ষ চীনসমেত সর্বত্র তারা নিজেদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্মাচার প্রবর্তন করে, নিজেদের সব কিছুকে আধুনিক বিতর্কিত বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার লেবেল এঁটে চেপে দেয় এবং প্রাচ্যের গণমানসে এক ধরনের হীনমন্যতা চাপিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষ, চীনের কৃষক প্রধান সমাজের শ্রমজীবী কৃষিসম্পদ উৎপাদনকারীরা গোড়া থেকেই পশ্চিমা ঔপনিবেশিক দখল-শাসন-শোষণ মানেননি। ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেবার ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলামের পরিচ্ছন্ন মানবতাবাদী শিক্ষাকে কৌশলে কোণঠাসা করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্তানী শাসনামলেও ইসলামের মূল শিক্ষাসহ মহান দার্শনিক, ওলী-আল্লাহ্দের শিক্ষাকে শিক্ষাঙ্গণের বাইরে রাখা হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর মানবাতাবাদী এসব শিক্ষাকে নব নব প্রজন্মের কাছে সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পেশ করা হবে বলে প্রত্যাশা করা হলেও কার্যতঃ সেগুলো উপেক্ষিত রয়েই গেছে। অথচ এসব শিক্ষা সর্বমানবিক শান্তিবাদী সমাজ গঠনের শিক্ষা ও প্রেরণাদায়ক ও মানস গঠনে কার্যকর উপাদান বটে। স্কুল-কলেজ ধারা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ধারায় অপরাপর পেশাগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরে এসব মহান শিক্ষার সাথে নবতর জেনারেশনকে পরিচয় করিয়ে দিলে সমাজ-সংস্কৃতি বহুতর গতিশীল ও সমৃদ্ধ হবে।

৬. গঠনতন্ত্রঃ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী, ১৩৭৬ বাংলা, ১৯৬৯ইং।

৭. বেলায়তে মোত্লাকা।

পঞ্চম ভাগ

কারামত

[তত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত]

প্রথম পর্ব

কারামত: তত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত

[কারামত সম্পর্কে সাধারণ দর্শন-ধারা বহির্ভূত বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ ধারণা পরিশোধন]

১. অধ্যাত্মজগত তথা মারেফাত ও রুহানী জগতে কারামত তথা দৃশ্যমানভাবে সাধারণ লোকাতীত ঘটনা অস্বাভাবিকতার মানদণ্ডে পরিমাপ্য নয় বলে বিজ্ঞজনদের অভিমত। কেবল মুসলিম ট্রাডিশন নয়; খ্রিস্টান, হিন্দুসমেত অপরাপর ট্রাডিশনেও এই সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এটা কোন মরণশীল মানুষের স্রেফ ব্যক্তিগত কারবার নয়। এটা কোন মানবাত্মার নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে কল্যাণমূলক ক্রিয়া, যার ফলাফল ক্ষেত্রবিশেষে দৃশ্যমান হয়। পরিশোধিত, পবিত্র মানবাত্মা মহাজাগতিক সত্তার সাথে একাত্ম, বিলীন হয়ে স্থিতি বা বাক্বা লাভে সক্ষম হলে বিশ্ব প্রকৃতিতে তার সূক্ষ্ম বিচরণ ঘটে এবং প্রয়োজনে সক্রিয় হয়ে কল্যাণ বর্ষণ করে। স্মরণাতীত কাল থেকে এটা দর্শন, অধিবিদ্যা, মিস্টিসিজমের আলোচ্য বিষয়। আধুনিক পাশ্চাত্যদর্শনেও এ বিষয়টা নিজস্ব একটা ক্ষেত্র রচনা করেছে। মশহুর দরবেশ, আউলিয়া, সাধু, সন্ত থেকে শুরু করে মজ্‌জুব ফকিরগণ 'কারামতের মাঠে' নিরবচ্ছিন্নভাবে চাষ করে যাচ্ছেন। তাঁদের বিশাল কর্মপরিমণ্ডল ধারণাতীত। এগুলো খুব ঘাঁটাঘাঁটি করার বস্তুও নয়। আমাদের চোখের সামনে বড়পীর হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (র.), সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.), হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.), গাউসুল আযম বিলবিরাসত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.), শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী

(ক.), চট্টগ্রাম মহানগরীস্থ হযরত শাহ্ সুফি আমানত শাহ্ (র.), হযরত নজীর শাহ্ (র.) প্রমুখের প্রকাশ্য কারামতের ঘটনাবলী এখনো লোকের মুখে মুখে ফিরে।

২. কারামত: প্রাসঙ্গিক আলোচনা, তত্ত্ব ও প্রকৃতি

কারামত শব্দটা 'কারুমা' শব্দের ক্রিয়ামূল বলে ধারণা করা হয়; যার অর্থ উদার, দয়ালু, সম্মানিত হওয়া। এটা আল্লাহ্‌র ৯৯টা সুন্দর নামের অন্যতম। শব্দটা আল-কোরআনে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ আল্-কারিম অর্থাৎ উদার বা দয়ালু হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। তবে 'কারামত' শব্দটার প্রকৃত রূপ সেখানে ব্যবহৃত হয়নি। ধর্মীয় পরিভাষায় 'কারামত' শব্দটা 'আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দান, সম্পূর্ণ মুক্ত ও অবারিত অনুগ্রহ (ইহ্সান, ইন'আম) বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে অধিকতর যথাযথ ব্যাখ্যা হলো; কারামত শব্দটা গঠিত হয়েছে আল্লাহ্‌র বন্ধুদের (আওলিয়া, একবচনে ওয়ালী) অলৌকিক ঘটনাবলীকে নির্দেশ করার জন্য, যা আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহ করে তাঁদেরকে এগুলো সম্পাদনের ক্ষমতা দান করেছেন। এসব ঘটনা সাধারণতঃ বস্তুজগতে সংঘঠিত অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনার সমবায়ে গঠিত অথবা এর **ভবিষ্যতের কোনও পূর্ব সঙ্কেতস্বরূপ, নতুবা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোনও ব্যাখ্যা স্বরূপ**। কারামত শব্দের ভাবার্থ 'মুযিযা' থেকে ভিন্ন। তবে উভয়ই বস্তুর স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গের (খারিকুল-আদা) সাথে জড়িত, অর্থাৎ এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা, যা ঐশী নিয়ম-কানুনের (সুন্নাতুল্লাহ্) স্বাভাবিক ধারাকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু মুযিযা হলো; পার্থিব ঘটনা সংবলিত, যা কোনও দাবি বা চ্যালেঞ্জের (তাহাদ্দী) মুকাবিলায় নবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত, যা দ্বারা নবীগণ তাঁদের শ্রোতাদের অক্ষমতাকে অখণ্ডনীয়ভাবে সুনিশ্চিত করেছেন। **কারামত হলো সাধারণ ব্যক্তিগত অনুগ্রহ, এটা গোপন রাখা উচিত এবং কোন ক্রমেই এটা নবীর মিশনের নিদর্শন নয়।** গতানুগতিক স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী নবীগণ কর্তৃক সম্পাদিত বিস্ময়কর ঘটনাবলীকে 'মুযিযা' বলা হয় এবং ওলী-দরবেশ কর্তৃক সাধিত বিস্ময়কর ব্যাপারকে 'কারামত' বলা হয়। দার্শনিক-বিজ্ঞানী ইবনে সীনা (৯৮০–১০৩৭ খ্রি.) সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা-বিচারে মুযিযা ও কারামতকে "অপরিহার্য ও আত্মসচেতন ইচ্ছাসম্পন্ন" উদ্ভবের অস্তিত্বমূলক অদৃষ্টবাদের মাঝে স্থান দিয়েছেন। নবীগণ তাঁদের মানবীয় প্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও বাহ্যিক বস্তুনিশ্চয়ের উপর প্রকৃতিগত আত্মিক শক্তির কারণেই

তাঁদের আবির্ভাবকে মুযিযা দ্বারা নিশ্চিত করে থাকেন। তিনি তাঁর "রিসালা ফী আকসামিল-উলুম গ্রন্থে বলেন, কারামত প্রকৃতিগতভাবে মুযিযার সমর্থক"। এছাড়া তাঁর 'ইশারাত' গ্রন্থে এ কথা সমর্থন করেন যে, আধ্যাত্মিক গভীরতার কল্যাণে যাঁর আত্মা জাগতিক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল এবং যিনি এই ক্ষমতা কল্যাণকর ও নীতিসিদ্ধ পন্থায় ব্যবহার করেন, তিনি 'মুযিযাত' আল্লাহ্‌র দান হিসেবে লাভ করেন অথবা তিনি যদি ওলী হন, তাহলে কারামতের গৌরব লাভ করেন। নবীগণ নবুয়তপ্রাপ্ত হন আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁদের প্রকৃতিগত সহজাত প্রবৃত্তি, প্রজ্ঞার ত্রিবিধ পরিপূর্ণতা, চিন্তাশক্তি ও কঠোর সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে। সিদ্দিক (ওলী) বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি (আরিফ) এই পরিপূর্ণতা 'অর্জন করেন সঠিকভাবে সাধনা বা মুজাহাদার পথ অনুসরণের মাধ্যমে। জ্ঞান-ধর্ম-দর্শনের ভুবনে পাশ্চাত্যে-প্রাচ্যে হাজার বছর ধরে প্রবল প্রভাব বিস্তারকারী দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ ইবনে রুশদের (১১২৬–১১১৮ খ্রি) 'তাহাযুতু'ত তাহাযুত' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছেঃ শুধু সেগুলোই অলৌকিক ঘটনা, যাহাতে গুণগত পরিবর্তন নিহিত। কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব হলেও তাহা সম্ভব। মুযিযাতের এই সমর্থন, কম হউক আর বেশি হউক, কারামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১] উল্লেখ্য, নবী-রাসুলগণের মুযিযা শক্তির কথা আল-কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে।

৩. বিভিন্ন মহলে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত অসম্পূর্ণ ধারণা

মহান পল্লী কবি জসীম উদ্দিন তাঁর সুবিখ্যাত 'মুর্শিদা গান' গ্রন্থে হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে শত শত ফকিরের বৈঠকে গিয়ে সারা রাত জেগে মুর্শিদা গান শুনেছেন এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। পুস্তকে বিভিন্ন দরবারে মুরিদ হবার নিয়ম, জিকির, মারফতী গানের বৈঠকের কিছু কিছু বিবরণও দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদা গান, বিচ্ছেদ গান, বন্দনা গান, মুনার গান, প্রার্থনা গান, নৌকার গান, মাঝির গান প্রভৃতি শিরোনামে বিবিধ প্রকার গানের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে এ পুস্তকে। ফরিদপুরের সুরেশ্বর দরবার এবং মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে সর্বদা গীত কিছু গানও এ পুস্তকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। মাইজভাণ্ডারী গানগুলো নেওয়া হয়েছে রমেশ শীলের 'নুরে দুনিয়া' 'আশেকমালা', সংকলিত গ্রন্থ 'রত্ন ভাণ্ডার',

'যুগের আলো' গানের বই থেকে। তাঁর এ গ্রন্থে তিনি এসব গানের ভাবোদ্দীপক ও মারেফতি বৈশিষ্ট্যের উপর কবি ও সাহিত্যিকসুলভ সুবিন্যস্ত সুগভীর আলোকপাত করেছেন।

হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনী অংশে তিনি মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) রচিত 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থ্ থেকে ৪৭টি অলৌকিক ঘটনার শিরোনাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন; "শাহজালাল পীরের মতোই মাইজভাণ্ডারের সুপ্রসিদ্ধ পীর আহমদুল্লাহ্ সাহেবের জীবনের প্রকৃত মহিমা জানা যায় না। ভক্ত-শিষ্যরা তাঁহার জীবনের অতিরঞ্জিত কতগুলি অলৌকিক কাহিনী মাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। কল্পনাপ্রবণ ভক্তরা এই সব মহাপুরুষের বিষয়ে এত অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের যা কিছু মহত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, তাহা সেই অলৌকিক কাহিনীগুলির আড়ালে পড়িয়াছে। আমরা এই অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও এই পীর সাহেবের জীবনে যে অনেক আত্মত্যাগ, অনেক সাধনা, সহৃদয়প্রবণতা ছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারি এবং সেই জন্যই তাঁহার ভক্তরা তাঁহার উপরে বহু অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন[২]।"

কবির এই অভিমত তাঁর সমসাময়িক কালের শুধু নয়, বর্তমান সময়েও কারামতের ব্যাপারে দর্শনের নিরীক্ষণ বহির্ভূত একটা অসম্পূর্ণ ধারণার বহিঃপ্রকাশ।

প্রায় অর্ধশতাব্দীপূর্বে তৎকালীন আবহে মহৎ কবির এই উপলব্ধি ও ধারণার পার্শ্বটীকারূপে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংযোজনযোগ্য। কালপ্রবাহে এসব ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ সমীক্ষণমূলক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ **(ক)** তাঁর জীবনের 'প্রকৃত মহিমা' উদ্‌ঘাটনপূর্বক খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক 'বেলায়তে মোত্লাকা' শীর্ষক এক মূল্যবান দর্শন গ্রন্থ্ রচিত হয়েছে, **(খ)** 'অলৌকিক কাহিনী' রূপে অভিহিত ঘটনাগুলো কারামতের বহিঃপ্রকাশ, যার দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় পটভূমি সম্পর্কে ১নং অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে আল-কোরআন ও হাদিসসহ বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে বিশ্বনন্দিত দার্শনিক ইবনে সিনা ও আবু রুশদের বরাত দিয়ে। কারামত সম্পর্কে এ ধরনের অসম্পূর্ণ ধারণার অসারবত্তা

প্রতিপন্ন করেছেন তাঁরা সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেই, **(গ)** কারামতের ঘটনাবলী তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন, সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের তাৎক্ষণিক আঞ্জাম-আয়োজন যে কোন বিবেচনায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কারণ, এগুলো সংঘটিত হয় জনান্তিকে। এগুলো বিকশিত হয়ে প্রকাশ পাওয়া এবং লোকসমাজের গোচরীভূত হওয়া যৌক্তিকভাবেই কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। **(ঘ)** অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের রেওয়াজ অনুযায়ী, কারামতরূপী বিষয়গুলো গোপন রাখা আওলিয়াদের অবশ্য পালনীয় নৈতিক কর্তব্য। তা প্রকাশ পায় কারামতের বেনিফিসিয়ারীর তরফ থেকে বিভিন্নভাবে; **(ঙ)** অলৌকিক ঘটনাগুলো যে কেবল 'অলৌকিক কাহিনীমাত্র' কিম্বা 'অতিরঞ্জিত' নয়, বরং নিতান্তই বাস্তব জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয়, তা নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে আল-কোরআন ও হাদিস শরিফের হাওলা সহকারে সংক্ষিপ্তভাবে পরিবেশিত হলো।

বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানসম্মত ধারণা অনুযায়ী মহাজগৎ বা আলামীন একক ইউনিট। উদাহরণস্বরূপ, 'রসুনের কোষ অনেক হলেও জড় এক'– দৃশ্যমান এই বাস্তবতার বিজ্ঞান বা হেকমতের অন্তর্নিহিত শিক্ষা সম্যক আত্মস্থ করতে পারলে তৌহিদের মর্মবাণী, কারামত, সময় ও দূরত্বের ব্যবধানের অনস্তিত্ব প্রভৃতির উৎস হৃদয়½ম করা কঠিন নয়। উল্লেখ্য, আল-কোরআনে দৃশ্যমান মখলুক প্রভৃতির আচরণ, বিবর্তন প্রক্রিয়া প্রভৃতি অধ্যয়ন ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে বার বার।

আল-কোরআন, হাদিস এবং চাক্ষুষ প্রামাণ্য বাস্তব ঘটনার নিরিখে কারামত

(ক) কারামতের দৃশ্যমান অনুষঙ্গঃ তাইয়্যে যমান ও তাইয়্যে আরদ্

এ নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, 'কারামত' সংঘটনের ক্ষমতা যথোপযুক্ত সিদ্ধপুরুষ আওলিয়াদের জন্য আল্লাহ্র খাস অনুগ্রহ। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলিফা এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাকে ভালো-মন্দ বিচারের মানদণ্ড ও ক্ষমতাসমেত সৃষ্ট অনেক বিষয় তার আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হয়েছে। আশরাফুল মাখলুকাত, আহসানে তকবীম মানুষের মর্যাদা ও প্রদত্ত ক্ষমতার বহর পরিমাপের ক্ষুদ্র একটা মানদণ্ড হচ্ছে কারামত। এটা তার মর্যাদা, ক্ষমতার ও অন্তহীন সম্ভাবনার পরিচায়ক। আল-কোরআনের বয়ানে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানব জাতি/শ্রেণিকে [(উমামুন) ৬:৩৮] সৃষ্টি করে পার্থিব জীবনকালে পৃথিবীতে প্রয়োগযোগ্য সীমিত কিছু শক্তি, ক্ষমতা আমানত হিসেবে ডেলিগেট করেন নির্দেশিত পন্থায় সদ্ব্যবহারের শর্তে। আল্লাহ্ তাঁর এই প্রকল্প কার্যকর করার উদ্দেশ্যে "নিজ অনুগ্রহে আসমান ও জমিনের সব কিছুকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল কওমের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে (৪৫:১৩)।" একই সূরায় উক্ত আয়াতের পূর্ব আয়াতে পার্থিব জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তবতার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে : "আল্লাহ্ই তো নদী-সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁরই নির্দেশে নৌকা-জাহাজ উহার মধ্যে চলাচল করতে পারে। যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং তোমরা শোকর আদায় করো (৪৫:১২)।" আরো বলা হয়েছে, "অতঃপর উহাকে (মানুষকে) উহার অসৎকর্ম ও উহার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন (৯১:৮)।

প্রকৃতির উপর মানবের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের কৌশল-ক্ষমতা বরাদ্দের তথ্য প্রদানের মধ্যেই আল-কোরআনের বয়ান সীমাবদ্ধ থাকেনি। উপরন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণের সহজ সরবরাহের বিবরণও বর্ণনা করা হয়েছে: "তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের জন্য আমার (কুদরতের) হাতে সৃষ্ট জিনিষগুলির মধ্যে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুও সৃষ্টি করেছি! অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়েছে। আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে তারা এগুলোর কোনটার উপর সওয়ার হয় এবং কোনটিকে আহার করে। তাদের জন্য এগুলোর মধ্যে বহু উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবু কি তারা শোকর করবে না? (৩৬:৭১–৭৩)।" আল-কোরআন এভাবে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে প্রকৃতি জগৎ, প্রাণী জগৎ, বস্তুজগতের উপর মানুষের নিজের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার রূপরেখা অঙ্কন করে দিয়েছে।

তবে এ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাগামহীন নয়। মহান ওলী ও আলিম, দার্শনিক হযরত হাসান বসরীর (র.) এক পত্রের জবাবে নবী দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.) লিখেন: "..তিনি (আল্লাহ্) তাঁর রাজ্যে কাউকে বল্গাহীনভাবে ছেড়েও দেন না। বান্দার মালিকানাধীন সমস্ত কিছু এবং তার আওতাধীন সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্..।"[৩]

(খ) কোরআনের প্রত্যেক বয়ান বা বিবরণ পাশাপাশি বাস্তব দৃষ্টান্তপুষ্ট: আল-কোরআনের অন্যতম বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গ্রন্থের প্রত্যেক বয়ানের (proposition/statement) সপক্ষে স্বীকৃত দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এসব দৃষ্টান্ত চর্মচক্ষে দৃশ্যমান, লিখিত তথ্যপুষ্ট, ক্ষেত্র বিশেষে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণসমৃদ্ধ। এসব দৃষ্টান্ত সমবায়ে একটা বিশেষ জ্ঞানগর্ভ গ্লোসারী (glossery) প্রণীত হতে পারে। উপরের প্রথম অধ্যায়ে মানবকে অর্পিত ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।

হযরত দাউদ (আ.) (খ্রি. পূ. ১০৮৬-খ্রি. পূ. ১০১৫ সন) : আল-কোরআনের নয়টি সূরায় মোট ১৬ স্থানে হযরত দাউদের (আ.) প্রাসঙ্গিক বর্ণনা রয়েছে। তাঁকে শৈশবে মেষপালকের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। সমকালীন নবী হযরত শামূয়েল (আ.) জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তালুতকে প্রশাসক নিযুক্ত

করেন (২:২৪৬-৭)। তিনি জালেম হানাদার জালুতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লুণ্ঠিত তাবুত-ই-সাকিনা (Ark of the Covenant) উদ্ধারের জন্য। এ যুদ্ধে হযরত দাউদ (আ.) সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। যুদ্ধে অসম সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং সমগ্র ইস্রাইলী জাতির প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। তালুত তাঁর পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক রাজত্বের অর্ধেক এবং স্বীয় কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এভাবে একজন অপরিচিত মেষ পালকের সন্তান দাউদ (আ.) শাসকপদে অভিষিক্ত হন। অতঃপর, আল্লাহ্ তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করেন এবং যবুর কিতাব দান করেন (৪:১৬৩; ১৭:৫৫)। হযরত দাউদের (আ.) নির্জন সাধনা এবং সুপ্রশাসন মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল বিকাশের ইতিহাসে বিশাল মাইল ফলক। পাহাড়-পর্বত ও বিহঙ্গকুল হযরত দাউদের (আ.) সাথে আল্লাহ্‌র যিকির ও মহিমা ঘোষণা করে (২১:৯৭)। আল্লাহ্ তাকে বিপুল প্রজ্ঞা দান করেন। লৌহের ব্যবহারসহ যুদ্ধবর্ম তৈরি শিক্ষা দেন। তিনি নিজ শ্রমে উপার্জিত সম্পদে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি পাখীদের ভাষাও বুঝতেন।

তাঁর প্রতি এতো অনুগ্রহ ও কল্যাণ প্রদান সত্ত্বেও সূরা ছোয়াদ-এর ৩৮:১৭-২৬ আয়াতে তাঁর ও তাঁর পুত্র হযরত সোলায়মান (আ.)-এর কিঞ্চিত আইনী ও বিচার বৃত্তান্ত বর্ণনার পর ২৬নং আয়াতে কঠোরভাবে বলা হলো: "হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি। অতএব, আপনি লোকদের মধ্যে হক্ব বিচার করুন, খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। করলে, তা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে দেবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ, তারা বিচার দিবসকে ভুলে যায়।"

(গ) হযরত সুলায়মান (আ.) (খ্রি. পূ ৯৯২-খ্রি. পূ ৯৪২ আনু:) হযরত সুলায়মান (আ.) হলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র। আল-কোরআনের সাতটি সূরায় ১৫টি আয়াতে মোট ১৭ বার তাঁর নামের উল্লেখ রয়েছে। নবী-রাসুলদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম। যিনি অন্যান্য নবীদের মতো সমাজের একেবারে তৃণমূল সর্বহারা স্তর থেকে উদ্ভুত নন; কিন্তু তিনি জ্ঞানে গরিমায়-বিচক্ষণতায়-বিজ্ঞান চর্চায় শীর্ষ স্থানীয়দের অন্যতম। হযরত দাউদ (আ.) ধাতব পদার্থের ব্যবহারে যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনি বিচার-বুদ্ধি-প্রশাসন ক্ষেত্রে ছিলেন আদর্শ স্থানীয়, যে কারণে তিনি

‘খলিফাতুল্লাহ্’ বা আল্লাহ্র খলিফা উপাধিতে ভূষিত আল-কোরআনে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ছিল এই মহান উত্তরাধিকার এবং আল্লাহ্র অবদান ধারণ ও আত্মস্থ করার মতো ক্ষমতা।

এই মহান পিতা-পুত্র সম্পর্কে আল-কোরআন এর সাক্ষ্য: “আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁরা উভয়েই বলেছিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুলায়মান হয়েছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী এবং তিনি বলেছিলেন, “হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে, এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে–জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে (২৭:১৫-১৭)। আরো বলা হয়েছে: “আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যাতে প্রভাতে এক মাসের পথ, সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন। আমি তাঁর জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম (৩৪:১২)।” আরো আছে: “আমি তাঁর অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা তাঁর আদেশে, তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন, সেখানে মৃদু-মন্দভাবে প্রবাহিত হতো (৩৮:৩৬)। হযরত সুলায়মান (আ.) এক বিশাল সামুদ্রিক নৌবহর, জাহাজনির্মাণ শিল্প, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবৃত্ত গড়ে তুলেছিলেন।

অতএব, আল-কোরআনের এই দুটো মাত্র সাক্ষ্য থেকে পরিস্কার বোধগম্য হয় সূরা জাসিয়ার ১৩নং আয়াতের মর্মবস্তু, যা নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং যা মানবকে অর্পিত আল্লাহ্র প্রদত্ত ক্ষমতার কিঞ্চিৎ প্রমাণস্বরূপ।

(ঘ) হযরত দাউদকে (আ.) ‘তাইয়্যে আরদ্ ও তাইয়্যে যমান’ সূচক ক্ষমতা মঞ্জুর: উপরের অধ্যায়ে দেখা গেল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হযরত দাউদকে (আ.) পৃথিবীতে তাঁর জীবৎকালে মানব ছাড়াও অপরাপর প্রাণীকুল, পাহাড়-বৃক্ষ প্রকৃতিকে তাঁর অনুসরণকারী সাথী বানিয়ে দিয়েছিলেন, যে মেহেরবানী হযরত সুলায়মানের (আ.) উপরও বর্ষিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁকে তাইয়্যে আরদ্ (দূরত্ব সঙ্কোচন), তাইয়্যে যমান (সময়ের ব্যবধান সঙ্কোচন) সূচক ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়েছিল।

বোখারী শরিফের এক হাদিসে হযরত আবু হোরায়রার (রা.) বরাতে বর্ণিত আছে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাউদের (আ.) পক্ষে আসমানী কিতাব যবুরের তেলাওয়াত অতি সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তিনি স্বীয় যানবাহনের উপর জিন বা গদি ও আসন বাঁধবার নির্দেশ দিয়ে যবুর তেলাওয়াত আরম্ভ করতেন। জিন বাঁধা শেষ হবার পূর্বেই দাউদ (আ.) যবুর তেলাওয়াত সমাপ্ত করতেন। আর হযরত দাউদ (আ.) শুধু নিজ হস্ত-কার্যের উপার্জন দ্বারা স্বীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন।”

এই তাৎপর্যপূর্ণ হাদিসের সূত্র ধরে মহান হাদিসবেত্তা ও মুফাস্‌সিরগণ জানান: আল্লাহ্‌র কুদরতের অনির্বচনীয় চিহ্নের অন্যতম ক্ষুদ্র দুটো নিদর্শন হলো; তাইয়্যে আরদ্‌ অর্থাৎ অনেক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত দুটো স্থানের দূরত্ব ও ব্যবধান যথার্থ ব্যক্তি বিশেষের জন্য বাস্তবে হ্রাস করে দেওয়া। একই প্রক্রিয়ায় আর একটি ব্যবস্থা হয় সময় ও কালের ক্ষেত্রে, যা ‘তাইয়্যে যমান’ নামে অভিহিত। অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিমাপক হিসাবে যা দীর্ঘ সময়, তা ব্যক্তি বিশেষের জন্য স্বল্পতর হয়ে যাওয়া। হযরত দাউদের (আ.) যবুর তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। এটা বিস্ময়কর তেমন কিছু নয়। সূরা ইয়াসীনসহ অন্যান্য কতিপয় আয়াতে যেমনটা বর্ণিত হয়েছে: “ওয়া হুয়াল্‌ খাল্লাকুল আলিম। ইযা আরাদা শাইয়ান্‌ আঁই ইয়াকুলা লাহু কুন ফা ইয়াকুন। ফাসুবহানাল্লাজী বিয়াদিহী, মালাকুত কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুরজাউন (৩৬:৮১-৮৩)। [বাংলা তরযমা: তিনি মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু উহাকে আদেশ করেন, ‘হও’। তখনই তা হয়ে যায়। অতএব, পবিত্রতা আল্লাহ্‌রই, যার হাতে সব কিছুর সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।]

আল্‌-কোরআনে বিবৃত তৌহিদবাদে বিশ্বাসীরা নিজেদের ক্ষুদ্রত্ব ও সসীমতা সম্বন্ধে সচেতন থেকে মহাজ্ঞানী মহাস্রষ্টার অন্তহীন ব্যাপকতায় আত্মসমর্পণ করেন। কাজেই তাঁরা আল্লাহ্‌র ‘ইচ্ছা-আদেশের কার্যকারিতায়, নিরঙ্কুশ বিশ্বাসী, যা ঈমানের সর্বপ্রধান ও প্রথম শর্ত। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে নব নব তথ্য মানব জাতির সম্মুখে তুলে ধরছে, যা আল-কোরআনের রসায়নে চমকপ্রদ অনুঘটক বটে।

দ্বিতীয় পর্ব

এবার হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন-ক্ষেত্র অবলোকন করা যাক

(১) 'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে **'হযরতের অপূর্ব কেরামতঃ ব্যাঘ্রের কবল হইতে প্রাণ রক্ষা'** শীর্ষক নিবন্ধে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত ও বহুলজ্ঞাত যে বাস্তব ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, মাইজভাণ্ডার শরিফে আগমনকারী বরিশাল নিবাসী এক বিপন্ন ভক্তকে তাৎক্ষণিকভাবে লাঠির আঘাতে বাঘের কবল থেকে রক্ষা করেন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)। নিজামপুর থেকে পার্বত্য পথে আসার সময় এ ঘটনা ঘটে। উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হযরত আকদাসের পাশে লাঠি দেখে চিনে তাঁর কদমে ডুকরে কেঁদে লুটিয়ে পড়লে তিনি যে উক্তি করেন, তা নিতান্তই প্রণিধানযোগ্য। হযরত বলেন, "মিঞা! আল্লাহ্‌র কুদরত দেখিয়া এতই আশ্চর্যান্বিত হইতেছ কেন? আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা অপেক্ষা আরো দয়ালু। আরো ক্ষমতাবান। তিনি সব কিছু করিতে পারেন"। তাঁর এই উক্তি উপরে উল্লিখিত সূরা ইয়াসিনের শেষ তিন আয়াতের মর্মবাণীর সাথে কতোই না সঙ্গতিপূর্ণ![৪]

(২) একই গ্রন্থে বর্ণিত **'হযরতের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রভাবে ব্যাঘ্রের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার'** শীর্ষক ঘটনার বিবরণে দেখা যায় যে, হযরত আকদাস তাঁর বর্তমান রওজা সংলগ্ন পুকুরে তাঁর হস্তস্থিত লোটা আচম্বিতে এই বলে নিক্ষেপ করেন যে, "হারামজাদা! তুই এখান হইতে দূর হস নাই?"। লোটা সকলে পুকুরে নিক্ষিপ্ত হতে দেখল। কিন্তু বহু খুঁজেও পুকুরে পাওয়া গেলো না।

ঘটনার দু'দিন পর রাঙ্গুনিয়া নিবাসী দরিদ্র আছমত আলী ঐ লোটা নিয়ে দরবারে হাজির হলেন এবং সর্ব সমক্ষে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দেন। সেই লোটা এখনো বিদ্যমান। হযরত আকদাসের উপরোক্ত দুটো ঘটনা দৃশ্যতঃ তাইয়্যে আরদ সূত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৫] [এ প্রসঙ্গে আজ তোফায়েল আহমদ রেঙ্গুনির রচিত প্রসিদ্ধ কাওয়ালী তৃতীয় ভাগের-----পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

(৩) তাঁর জীবনী গ্রন্থে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে 'সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব' শীর্ষক নিবন্ধে বর্ণিত ঘটনা 'তাইয়্যে যমান' সূত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এতে বর্ণিত হয়েছে; নানুপুর নিবাসী মুন্সি খায়ের উদ্দিন ডাক্তার সাহেবের পর্দানশীন ভ্রাতুষ্পুত্রী দরবার শরিফে রাতভর ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করে সূর্য উঠার আগে বাড়ি ফিরতে মনস্থ করেন, যাতে কোন পুরুষের নজরে না পড়েন। তন্দ্রা টুটতে তিনি দেখেন সূর্য উঠি-উঠি করছে। তিনি হযরত আকদাসের কাছে আর্জি দিলেন, কী করবেন। হযরত বললেন, "তোমার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই। তোমাকে কেহ দেখিবেনা। সূর্য উদয়ের পূর্বেই তুমি বাড়ি পৌঁছিয়া যাইবে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিয়া নিরুদ্বেগে বাড়ি ফিরিয়া যাও।"[৬] দরবার শরিফ থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে নিজ বাড়িতে তিনি পৌঁছলেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই। এর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এটা সাদা-মাটাভাবে তাইয়্যে যমান সূত্র সংশ্লিষ্ট ঘটনা।

(৪) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবৎকালে একই সময়ে একাধিকস্থানে উপস্থিত, বিভিন্নজনকে আল্লাহ্র ইচ্ছায় মদদ প্রদানের ঘটনার বিবরণ তাঁর জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। জামাল আহমদ সিকদার বিরচিত তাঁর প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত বহু ঘটনা 'তাইয়্যে যমান ও তাইয়্যে আরদ্-সূত্রের' সাথে সম্পর্কিত, যা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে সহজেই প্রতিভাত হয়।

তাইয়্যে যমান ও তাইয়্যে আরদ্ সংশ্লিষ্ট কারামতের আরও কয়েকটা বাস্তব ঘটনা

ক. হযরত শাহ্ আমানত শাহ্ (র.)

চট্টগ্রাম মহানগরীর মহান অলি-আল্লাহ্ হযরত শাহ্ আমানত শাহ্ (র.) চট্টগ্রাম আদালতে দৃশ্যতঃ জজের পাখাবরদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কক্সবাজারের এক ফরিয়াদী তার মামলার কাগজপত্র বাড়িতে ভুলে রেখে এসে খুব ঝামেলায় পড়ে। জজ পরদিন তাকে কাগজপত্র আদালতে পেশ করার হুকুম দেন। কিন্তু তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় তা মোটেও সম্ভব ছিল না। তার আকুল কান্নায় ব্যাকুল হয়ে হযরত শাহ্ আমানত (র.) তাকে জিজ্ঞেস করে ঘটনা অবহিত হন এবং তাকে চোখ বন্ধ করে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার পরামর্শ দেন। এভাবে সে এক পলকে বাড়ি পৌঁছে কাগজ হাতে নিয়ে আর এক পলকে চট্টগ্রাম শহরে হাজির হয় এবং পরদিন আদালতে তা পেশ করে। মাত্র এক রাতে কক্সবাজার থেকে কাগজ আনার ঘটনা জজ সাহেবের প্রত্যয় হয়নি এবং তাকে সত্য গোপনকারী সাব্যস্ত করতে উদ্যত হলে সে প্রকাশ্য আদালত কক্ষে পাখাবরদারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সব কথা খুলে বলে। হযরত আমানত শাহ্ (র.) ঐ দিনই আদালত কর্মস্থল ছেড়ে তাঁর বর্তমান মাজার শরিফ এলাকায় নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে রুহানী কর্মজগতে ব্যাপৃত হন। এই মশহুর ঘটনা এখনো জীবন্ত। এটা তাইয়্যে যমান ও তাইয়্যে আরদের যৌথ দৃষ্টান্ত।

খ. হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.)

প্রতিরাতে একাধিকবার কোরআন তেলাওয়াত খতম করতেন, যা সর্বজনবিদিত। এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর যবুর পাঠের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি প্রতি রাতের প্রথমাংশে নামায প্রভৃতি সমাপন, দ্বিতীয়াংশে জিকির আজকার এবং তৃতীয়াংশে এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক খত্ম কোরআন আদায় করতেন। তাঁর দৈনন্দিন ইবাদত বন্দেগীর এই রুটিনে হযরত দাউদের (আ.) সাপ্তাহিক কর্ম রুটিনের আঁচ পাওয়া যায়।

গ. তাইয়্যে যমান ও তাইয়্যে আরদ্ বিষয়ক আরো কয়েকটা নজীর

(ক) "বোখারী শরিফ-এর বাংলা তরযমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নবীদের ইতিহাস খণ্ডে, (৪র্থ খণ্ড)" হযরত দাউদের (আ.) অধ্যায়ের টীকায় বর্ণিত হয়েছে:[৭]

"হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যেও অনেক অনেক ওলীর দ্বারা এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। হিজরী একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম শেখ নুরুদ্দিন আলী ইবনে সুলতান– মোল্লা আলী ক্বারী (র.) মিশকাত শরিফের ব্যাখ্যায় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'মিরক্বাত' ৫-৩৪৪ পৃষ্ঠায় মোল্লা জামীর এক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, একজন বিশিষ্ট বুজুর্গ কা'বা শরিফের তাওয়াফ করা কালে হাজ্‌রে আসওয়াদ ও কা'বা শরিফের দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থান, যা মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করিতে পারে–এই সামান্য স্থান অতিক্রম করিতে করিতে পূর্ণ কোরআন শরিফ খতম করিয়াছেন।"

চর্তুদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলেম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার মুহাদ্দেস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.)-এর বোখারী শরিফের ব্যাখ্যা ফয়্যুল বারী ৪-৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, সুফিকুল শিরোমনি শেখ সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.) একদিন এক রাত্রে ষাট (৬০) বার কোরআন শরিফ খতম করিতেন এবং দিল্লীর শাহ্ ইসমাইল (র.) আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ধীর স্থিরতার সহিত কোরআন শরিফ খত্‌ম করিতেন।"

"কোরআন হাদিসের অসংখ্য প্রমাণাদিতে সুস্পষ্ট যে, হযরত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ মেরাজ শরিফের ঘটনা উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছিল, স্বপ্ন ছিল না।"

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং হযরত আমানত শাহ্ (র.)-এর যে ঘটনাবলী এ নিবন্ধে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো একেবারে আধুনিক কালের ঘটনা, যা প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত মানুষের জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির রহস্য ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক কায়দায়। পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নয়নে সাধনা মানুষের কাছে মখলুকাতের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে থাকবে। মানুষের দরকার যথার্থ মানুষ হওয়া। মানুষের মস্তিষ্কে ও শরীরে আল্লাহ্ কী চেতনা ও শক্তি ডেলিগেট করেছেন, তা চিহ্নিত করতে পারলে মানুষ যে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি, তা সম্যক প্রমাণিত হবে।

এসব বাস্তব দৃষ্টান্তের মধ্যে মহান পবিত্র অধ্যত্ম ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্মের বিশালতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

ঘ. ভবিষ্যতের পূর্ব সঙ্কেতঃ 'যব্ কুন্ কাহা, সব হো গ্যায়া। ফের গায়েব 'কাঁহা হ্যয়?'

হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবল বাংলাদেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে আপন মহিমায় দেদীপ্যমান এক বিশাল সূর্য। এই বেলায়েতী সূর্যের অমল কিরণ লক্ষ কোটি মানুষের মন, হৃদয়, মস্তিষ্ককেই কেবল আলোকিত করেনি, বরং অনেকের আঁধার ঘর করেছে আলোকিত। কূন্য কোল দিয়েছে ভরিয়ে। অনেক বেদনার ক্ষত তিনি মুছে দিয়েছেন। অনেক হতাশ অসহায় মুখে ফুটিয়েছেন হাসি। শুরুতেই তাঁর অমর অস্তিত্বের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। তাঁর শানে নিবেদন করি এই গীতি-পুষ্পার্ঘ ঃ

ভাব্ দরিয়ায় উঠলে তুফান ক্বলবে্ জিকির হয় জারী,
আল্লাহ্ নামের নূরের নায়ের বৈঠা ধরেন ভাণ্ডারী ॥
হক্ব মাওলা, আমার দিশা গাউসুল আযম ভাণ্ডারী ॥

গাউসুল আযম আহমদ উল্লাহ্ মহান মানুষ আউলিয়া,
তাঁহার নূরের অমল আলোয় কালো আঁধার যায় সরিয়া,
সেই আলোতে পথ চিনিয়া অচিন পথে দিই পাড়ি ॥
হক্ব মাওলা, আমার ছায়া গাউসুল আযম ভাণ্ডারী ॥

আরশ-কুরসী লাওহ-কালাম সবই খোদার রহস্য,
সে-সব জানেন আউলিয়ারা, তাঁরা মোদের নমস্য।

গাউসুল আযম বাবার কাছে গোপন কিছুই ছিলনা,
দিব্য চোখে দেখতে পেতেন আউয়াল-আখেরঘটনা।
জীবন-নদীর উজান-ভাটায় তিনিই মোদের কাণ্ডারী ॥
হক্ব মাওলা আমার নাইয়া গাউসুল আযম ভাণ্ডারী ॥

হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী'র (ক.) জীবনী গ্রন্থে (খাদেমুল ফোক্বারা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সংগৃহীত তথ্যমূলে মৌলানা মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া প্রণীত) এক সুন্দর তথ্য বর্ণিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে 'হযরত মজহাবী মসায়েলের উত্তর দান শিরোনামের অনুচ্ছেদে 'গায়েব প্রকাশ' শীর্ষক একটি উপ-শিরোনাম রয়েছে। এই উপ-শিরোনামের বয়ান নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত হলোঃ

"ফরহাদাবাদ নিবাসী মৌলানা আবদুল জলিল সাহেব একদিন হযরতের খেদমতে গায়েব বলার মসায়েলা জানিতে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর"! গায়েব বলা, প্রকাশ করা কি জায়েয আছে?

হযরত উত্তর করিলেন,
"যব্ কুন্ কাহা, সব হো গয়া। ফের গায়েব কাঁহা হ্যায়?"

অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা যখন 'হয়ে যাও' বলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গিয়াছে। তখন আর অদৃশ্য কোথায় রহিল?"

জ্ঞানী মানুষ গভীর একাগ্র সাধনাবলে নিজের আত্মা বা রূহ্কে উন্নত স্তরে বিকশিত করতে সক্ষম হন। প্রকৃতির উপর কায়িকভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। নিজেকে প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে দিতে কিংবা নিজেকে অণুতে পরিণত করে মহাশক্তির আধারে রূপান্তরিত করে প্রকৃতিতে মিশে যেতেও সক্ষম হন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে এসব তত্ত্ব বর্ণিত আছে। ধর্মগ্রন্থ, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, মারেফাত প্রভৃতিতে তো এ ধরনের বর্ণনা, ইশারা, ইঙ্গিত রয়েছেই। মানুষ "আহসানে তকবীম"। মানুষ অনন্ত সম্ভাবনার আধার। মহানবীর (দ.) 'মিরাজ' এই সাক্ষ্যই বহন করে। অতএব, প্রকৃতি জগৎ তথা সৃষ্টি জগতের আদি-অন্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়া মানুষের জন্য অসম্ভব নয়, তবে তা আল্লাহ্ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত এহসান সাপেক্ষ।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) 'গায়েব-প্রকাশ' সম্পর্কিত অভিমতে মানুষের এই সম্ভাবনা ও শক্তির প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

এবার আমরা 'ভবিষ্যতের তথ্য' প্রকাশ সংক্রান্ত হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) একটি ইশারামূলক অথচ সুনিশ্চিত ঘটনার উল্লেখ করছি। ঘটনাটি এই গ্রন্থকারের নিজ বংশের পূর্বপুরুষের সাথে সম্পর্কিত।

এখানে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, মহান আউলিয়ায়ে-কেরাম 'ভবিষ্যৎবক্তা' হিসেবে অভিহিত হন না। দার্শনিকরা ভবিষ্যৎবক্তাদেরকে ঐসব সাধারণ গণকের বেশি মর্যাদা দেননা, যাদের কথা-বার্তার উপর ষোল আনা আস্থা রাখা যায় না। এ ধরনের বহু উদাহরণ দর্শনের ইতিহাসে পাওয়া যায়। অলি-আল্লাহ্‌রা তাঁদের আত্মিক বিকাশের ফলশ্রুতিতে যে কাশ্‌ফ শক্তির অধিকারী হন, তার বদৌলতে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের অনুমতিক্রমে কখনো কখনো কোন কোন ক্ষেত্রে ইশারা-ইঙ্গিতে, রহস্যপূর্ণ ভাষা কিম্বা ভঙ্গীতে কোন বিষয় সম্পর্কে আভাস দেন। কুত্‌বে ইরশাদীরা সাধারণতঃ এসব ইশারা-ইঙ্গিতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আলোচ্য ঘটনা বা ওয়াকেয়া আমার দাদা মোহাম্মদ হাসমত আলী ও আমার দাদী মোসাম্মৎ জেবুন্নিসাকে নিয়ে। ঘটনাটা আমার বাবা আলহাজ আবদুস সোবহান বলে গেছেন আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে। ঘটনাটা ১৮৯০ এর দশকের প্রথম দিকে হবে। আমার দাদা হাসমত আলী অত্যন্ত সাদা-সিদা-সৎ জীবন যাপন করতেন। তিনি ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অলি আল্লাহ্‌দের সান্নিধ্যে যেতেন। লোকে তাঁর চলাফেরা জীবনযাপন পদ্ধতির সারল্যের কারণে তাঁকে 'সুফি সাহেব' বলেও অভিহিত করতেন। তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দরাবরেও যেতেন। সংসার জীবনের প্রথম দিকে সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় আমার দাদী জেবুন্নিসা হযরত সাহেব কেবলার দরবারে কিছু হাদীয়া মানত করেন। ঐ সময়ে নগদ কয়েকটা পয়সা জমানো সহজ ছিলনা। গ্রাম-সমাজে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমেই জীবন যাত্রা নির্বাহ হতো। তবু আমাদের দাদী কিছু পয়সা সঞ্চয় করতে সমর্থ হন। সেগুলো নাকি তিনি বেড়ার বাঁশের ফোকড় কিম্বা কখনো ঘরের কোণায় রেখে জমিয়েছিলেন।

আমাদের দাদা হাসমত আলী দাদীর দেওয়া ঐ কয়টা পয়সা হাদিয়া নিয়ে হযরত গাউসুল আযম কেবলার দরবারে হাজির হন এবং তাঁকে ঐ নজরানা পেশ করেন। হযরত সাহেব কেবলা হাসিমুখে ঐ নজরানা গ্রহণ করেন। অতঃপর,

একবার উত্তর শিয়রে শুয়ে সাদা কাপড়ে নিজেকে পুরোপুরি ঢেকে নেন। এরপর উঠে বসেন এবং মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে নেন। আবার উত্তর শিয়রে শুয়ে সাদা কাপড়ে নিজেকে ঢেকে নেন এবং আবার উঠে বসে মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে নন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে আমার দাদীর প্রেরিত ও দাদা কর্তৃক সমর্পিত পয়সা কয়টি নিয়ে এদিক-ওদিক গুঁজিয়ে রাখার ভঙ্গী প্রকাশ করেন, যেমন করে কেউ কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আমার দাদী যে আমার দাদার অলক্ষ্যে কষ্ট করে এসব পয়সা সঞ্চয় করেছিলেন এদিক ওদিক গুঁজিয়ে রেখে, যা ঐ সময়ে আমার দাদা তখনো জানতেন না; হযরত সাহেব কেবলা গুঁজিয়ে রাখার ভঙ্গী করে আমার দাদাকে ঐ পয়সা কয়টি সঞ্চয়ের ইতিবৃত্ত জানিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন।

এবার হযরত সাহেব কেবলার উত্তর-শিয়রে শোয়া-বসার রহস্য দেখা যাক। আমার দাদা-দাদীর প্রথম সন্তান অকালে মারা যান। দ্বিতীয় সন্তান আমার বাবা। তৃতীয় সন্তান অকালে মারা যান। চতুর্থ সন্তান আমার চাচা আবদুস সাত্তার। হযরত সাহেব কেবলা সাদা চাদরে মুখ ঢেকে উত্তর শিয়রে শুয়ে দু'জনের অকাল মৃত্যুর ও দু'জনের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে এ রহস্য বুঝা সম্ভব না হলেও আমার দাদা এ বিষয়ে বহু ভেবেছিলেন। জীবনের উপান্তে এসে তিনি হযরত সাহেব কেবলার ঐদিনকার আচরণের রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং আমাদের পিতা আলহাজ্ব আবদুস সোবহানকে তা প্রকাশ করে যান। আমার বাবা এবং চাচা মাইজভাণ্ডার দরবারে যেতেন। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১৯৪০ এর দশকের একেবারে শেষ দিকে আমার বাবা আবদুস সোবহানকে ১০ মাঘ উরস্ শরিফে হযরত কেবলা আলমের রওজা শরিফের দরজায় লোকেদের নজরানা গ্রহণার্থ বসিয়েছিলেন। হযরত সাহেব কেবলার অপার দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ্ তাঁদের সকলকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন!

হযরত সাহেব কেবলার উক্তিঃ

'যব্ কুন্ কাহা, সব হো গয়া। ফের গায়ব কাঁহা হ্যয়?'

উপরে বর্ণিত আমাদের পরিবারের অতীতের এ ঘটনাটা তাঁর এ উক্তির যথার্থতার সাক্ষ্যও বটে।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আধ্যাত্মিক শান ও মর্তবার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী এই ধরনের কত ঘটনা যে রয়েছে, সে হিসাব একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই জানেন।[৮]

জনাব হাসমত আলীর পুত্ররা তো বটেই, বংশের অধস্তন ধারা পৌত্রদের মধ্যে মোঃ মাহবুব উল আলম, অধ্যাপক জহুর উল আলম, প্রপৌত্রদের মধ্যে ড. হাসনে আয়মুন, এডভোকেট জাকিয়া আয়মুন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিবরান আলম এই মহান দরবারের স্নিগ্ধ সামিয়ানা তলে আশ্রয় নিয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে আমার একমাত্র পুত্র সন্তান মোহাম্মদ জিবরান আলম-এর জন্ম মেহেরবাণীর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৭ইং সনে আমার বিয়ের পর লুৎফুন্নাহার বেগম আর আমার ঘরে কোন পুত্র সন্তান জন্মায়নি। তা নিয়ে আমার মা কুলসুমা খাতুন মনে মনে উৎকণ্ঠাবোধ করতেন এবং প্রায়শঃ বাদ মাগরিব আমার দুই মেয়েকে দুই পাশে নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে সজিদায় পড়ে চোখের জলে ভাসতেন। এই ফরিয়াদ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হন আমার শাশুড়ী মোহসেনা বেগম। আম্মাজান উম্মুল আশেকীন মোসাম্মাৎ মনোয়ায়ারা বেগম-এর সাথে তিনি সুযোগ পেলে সালাম নিবেদন করতে যেতেন। একবার কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই গাউসিয়া হক মন্জিলে গেলেন। আম্মাজানের সাথে সাক্ষাৎ হলো। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ঐ সময় নিজ হুজুরায় ছিলেন। আমার শাশুড়ী এ তথ্য পেয়ে কালবিলম্ব না করে দ্রুত তাঁর জানালায় হাজির হলেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে সামনে দেখেই শাহানশাহ্ হুজুর (ক.) আনন্দ ঝঙ্কৃত স্বরে চাটগাঁইয়া ভাষায় বলেন : "বুঝ্ঝি। মরদ পোয়া দরকার। মরদ পোয়া চাই।" [বুঝেছি, বুঝেছি, ছেলে সন্তান চাই!] এরপর তাঁর চিরাচরিত রেওয়াজ মতো পশ্চিম দিকে অর্থাৎ হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরিফের দিকে হস্ত নির্দেশ করে শান্ত-মধুর স্বরে বললেন : ঐয়ত যাইয়ারে আল্লাহ্র দরবারত আর্জি দিন। আল্লায় দিব। আল্লায় দিব।" [ঐখানে গিয়ে আল্লাহ্র দরবারে আর্জি দিন। আল্লাহ্ দেবেন। আল্লাহ্ দেবেন।]

উল্লেখ্য, শাহানশাহ্ হুজুরের জীবদ্দশাতেই আমার পুত্র সন্তান মোঃ জিবরান আলম-এর জন্ম হয়।

৬. নির্বিচারবাদী দর্শন, মুসলিম দর্শন, ধর্মের অর্থ সম্পর্কে প্রাচ্য-প্রাতীচ্য চিন্তাধারার মিল-অমিল, কারামতের বাস্তবতা, অনুমান ও সত্যের ফারাক সম্পর্কে আল-কোরআন

মানব সমাজ ও সভ্যতার সূচনাকাল থেকে তার চিন্তা ও কর্মের যে ধূসর বিবরণ পরবর্তীকালে বিজ্ঞানোন্নত মানব সমাজে লিপিবদ্ধ হয়েছে; তাতে দেখা যা যায় যে, অবস্তুবাদ ও বস্তুবাদ এই দুটো ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত। খ্রিস্টয় ঊনবিংশ/বিংশ শতাব্দীতে দর্শন-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞতর একাংশ বস্তুবাদকে নির্বিচারবাদ (dogma) নামে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, বস্তুবাদ অস্তিত্বের বা হাস্তির স্বরূপ বিষয়ক তত্ত্ব বা ontology হিসেবে দুর্লংঘ্য বিষয়াদিতে জড়িত হয়; কিন্তু কার্যতঃ কোন যৌক্তিক এমনকি গাণিতিক সমাধানেও উপনীত হয়না। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে কিম্বা বিলিয়ে দিয়ে মহাজগতে মিলে যাবার মানবিক সাধনা সুপ্রাচীন এবং সেই সুদূর অতীতের বৈদিক দর্শন থেকে শুরু করে গ্রীক দর্শন প্রভাবিত পাশ্চাত্য দর্শন ও মুসলিম দর্শনের সুফিবাদসহ বিভিন্ন চিন্তা-সমীক্ষণ প্রক্রিয়ায় পরিলক্ষিত। এতে ভাববাদ, বস্তুবাদ, সংশয়বাদ, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি চিন্তা-সমীক্ষণ শাখার উদ্ভব ঘটেছে। প্রত্যেক মহান দার্শনিক তাঁর পূর্ববর্তী কিম্বা সমকালীন দার্শনিকদের চিন্তা ও যুক্তির সীমাবদ্ধতা উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং তা পূরণে কিম্বা সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছেন। সেই খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪–৫৪৭ অব্দ সময়কালের 'প্রকৃতির দার্শনিকদের' সময় থেকে শুরু করে ডেনমার্কের সরেন কিয়ার্কেগার্ডের (১৮১৩-১৮৫৫ খ্রি.) সময়কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যদর্শন ধারা, প্রাচ্যে চীনের কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রি. পূর্ব), লাওজু, চুংজু, ওয়াংচাং প্রমুখ দার্শনিকের তাওবাদ এবং তাঁদের বিবিধ পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার উপজাত হিসেবে আবির্ভূত জাপানী দর্শন প্রভৃতি বস্তু, ভাব, স্রষ্টা, সৃষ্টির উৎস নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। এদের মধ্যে আবার কনফুসিয়াস ও তাঁর অনুসারীরা মানব সমাজ, রাষ্ট্র, প্রভৃতি সম্পর্কে কল্যাণমূলক ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে ইউরোপীয় রেনেসাঁর অন্যতম ফসল হিসেবে শোষক পুঁজিবাদ প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের মতো চীনকেও গ্রাস করে। সমাজ, দর্শন, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি চিরন্তন নিয়মে বিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা, রূপরেখা কিম্বা গাণিতিক সূত্রে মানব জীবন ও সৃষ্টি জগতকে সংজ্ঞায়িত করা যায়নি। ডেনমার্কের সরেন কিয়ার্কেগার্ডও তাঁর পূর্ববর্তী

জার্মান দার্শনিক লিবলিয, হেগেল, হল্যান্ডের স্পিনোজা প্রমুখ মহান দার্শনিকদের চিন্তা ও তত্ত্ব ঘাঁটাঘাঁটি করে আইদার /অর (অর্থাৎ হয়/নয়; ‘ভয়’, সিকনেস আনটু ডেথ (আমৃত্যু মৃত্যু) গ্রন্থত্রয়ের মাধ্যমে হতাশাবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে উর্বরতা সঞ্চার করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, “ধর্মীয় বিশ্বাসে আত্মসমর্পণই হচ্ছে মানুষের পক্ষে হতাশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।” তবে অপরাপর দার্শনিকবৃন্দ তাঁর এই দর্শনে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রলেপ দেখেছেন। কিয়ার্কেগার্ড তাঁর পূর্ববর্তী প্লেটো, এ্যারিস্টটলের এই অভিমতকে অস্বীকার করেন যে, ‘জ্ঞান অর্জনের অর্থ হচ্ছে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তা সম্পর্কে ব্যক্তির চেতনা লাভ’। কিন্তু কিয়ার্কেগার্ডের মতে “জ্ঞান অবশ্যই ব্যক্তির জন্য বহিরাগত বিষয়। ব্যক্তিকে জ্ঞান আহরণ করতে হয় তার শিক্ষক কিম্বা বিধাতার কাছ থেকে।” তবে সক্রেটিসের ‘কিয়াসের’ সাথে তার এতটুকু মিল দেখা যায় যে, বিশ্ব সম্বন্ধে অনুমান অপেক্ষা **আত্মজ্ঞানই** পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং **অজ্ঞানতাই মিথ্যাচারের উৎস**। কিয়ার্কেগার্ড মানুষের নিজ অস্তিত্বের স্বরূপের সন্ধানে নেমে গৌতম বুদ্ধের ‘নির্বান সমুদ্রে’ অবগাহন করেন, যা মুসলিম দর্শনে ‘ফানাহ্’ নামে সাধারণ্যে পরিচিত; অবশ্য ‘ফানা’ বলতে শুধু আত্মানির্বান নয়, মানবিক মানসিক ও রিপুজাত সকল প্রকার চাওয়া ও অনুভূতি থেকে উত্তরণও এর আওতাভুক্ত। ফানা-এর পরে মুসলিম দর্শনে রয়েছে ‘বাকা’-এর দর্শন। জ্ঞান, ফানা ও বাকা সম্পর্কে মুসলিম দর্শনের অভিযাত্রাকে আধুনিক আঙ্কিক যুক্তিতে (mathematical) অনুধাবন করা যায়। প্রকৃতির মধ্যে মহৎ সাধনাবলে বিলীন বা একাত্ম হতে পারলে মানব-ক্বলবের কাছে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ হলোগ্রাম আকারে প্রতিভাত হয় বলে বিজ্ঞ দার্শনিকদের একাংশের অভিমত। অবশ্য কিয়ার্কেগার্ডের পূর্ববর্তী মহান দার্শনিকবৃন্দ যে সব বিষয়ে উপসংহারবিহীন তত্ত্ব ও যুক্তিজাল বিস্তার করে মানুষের অনুসন্ধানের ভুবনকে প্রসারিত করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে মুসলিম দর্শন একাদশ/ দ্বাদশ খ্রিস্টিয় শতকেই সান্তনাযোগ্য উপসংহার টেনে দিয়েছে হযরত ইমাম গাজ্জালীর (র.) জবানীতে। ইউরোপীয় আধুনিক দর্শনের জনক মহান দর্শনবেত্তা রেনে দেকার্ত (১৫৯৬–১৬৫০ খ্রি.) যেখানে সীমিত মানবিক চিন্তার জালে আটকে পড়েছিলেন, সেখানে আল গাজ্জালী (র.) তাঁর অর্ধসহস্রাধিক বৎসর পূর্বেই সেই ট্যাংরা ডিঙ্গিয়ে যেতে পেরেছিলেন। দেকার্ত বলেছিলেন, আমি আছি, কারণ আমি অভিপ্রায় করি (cogito ergo sum); আর আল-গাজ্জালী আগেই

বলেছিলেন, আমি আছি, কারণ আমি চিন্তা করি (volo ergo sum)। আল গাজ্জালীর সূত্র আল কোরআনের সূরা ইয়াসিনের ৮২নং আয়াতে ব্যক্ত। আর মানবিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আল-কোরআনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত সূত্রগুলোর সারমর্ম সূরা বাক্বারার ২৫৫নং আয়াতে বিবৃত হয়েছে, যা সাধারণ্যে 'আয়াতুল কুরসি' হিসেবে পরিচিত।

সরেন কিয়ার্কেগার্ড জার্মান দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০–১৮৩১ খ্রি.) 'সিস্টেম'–ধারণার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করলেও তাঁর বহু পূর্বে ইবনু আরাবী (১১৬৫–১২৪০ খ্রি.) দৃঢ়তাসহকারে উচ্চারণ করেছিলেন যে, 'মানুষ মূল্যবোধ ও আইন বা নিয়মের জগতে বাস করে।' মুসলিম দার্শনিক এবং তত্ত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে পার্থক্য ও দূরত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হলো; মানুষ, জীবন ও জীবনবোধ সম্পর্কে মৌলিক পার্থক্য। অন্যান্য অনেক দর্শন যেখানে যুক্তির বিলাস কিম্বা তর্কযুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে, সেখানে মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে শুরু থেকেই সক্রিয় রয়েছে সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণমুখী জীবনবোধ। তা যুক্তি ও তর্কের মরুপথে হারিয়ে যায় না, বরং উল্টা মরুপথকে জীবনে-ফুলে-ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলছে। দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তুলনামূলক বা সমীক্ষণবাদী অধ্যয়ন করলে এই ব্যবধান ঘুচে যাবে এবং বিশ্ব মানব-চিন্তার কল্যাণময় আলোকধারা কেবলই বিস্তার লাভ করতে থাকবে।

এখানে পাশ্চাত্যের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের সাথে মুসলিম দর্শন তথা প্রাচ্যের বনেদী ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের তফাতের উপর সামান্য আলোকপাত করলে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। মুসলিম ধর্মতত্ত্বের দুটো প্রকৃতি; (ক) প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব (natural theology), (খ) প্রত্যাদিষ্ট বা ওহীজ ধর্মতত্ত্ব (revealed theology)। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব বহির্জগত ও মানবাত্মার প্রতি লক্ষ্য রেখে পরম সত্তার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে গবেষণা করে, এ জন্যে সেটাকে সমীক্ষণবাদী ধর্মতত্ত্ব (rational theology) বলেও অভিহিত করা হয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মুসলিম ধর্মতত্ত্বের উৎস ওহী (revelation) এবং মুসলিম দর্শনের ভিত্তি বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিমত্তা (reason) [দ্রষ্টব্য: ইমাম গাজ্জালী অধ্যায়; মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী; আলোকধারা বুক্স দ্বিতীয় সংস্করণ,

২০২৩ইং]। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে উদ্দেশ্যবিহীন যান্ত্রিকতা কিম্বা যুক্তির আওতাবহির্ভূত নির্বিচারবাদী জড়ত্বের স্থান নেই। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব প্রধানতঃ ওহী, গৌণতঃ কাশ্‌ফ, ইলহামের সাহায্যে পরম সত্যের অন্বেষণ করে। অন্যপক্ষে পাশ্চাত্য দর্শন হিসেবে পরিচিত ধারা বহুলাংশে স্রেফ যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানচর্চা করে, যা এক স্তরে গাণিতিক মানদণ্ডের সামনেও অবোধ হয়ে পড়ে। মুসলিম দর্শন সাধারণ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণমুখী বাস্তব জীবন ও জীবনবোধ নিয়ে ব্যস্ত থাকছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন বহুলাংশে তত্ত্ব ও বস্তুজগতের ঘেরায় বন্দী হয়ে পড়ে। এই দর্শন তাত্ত্বিক বিতর্ক সৃজন, খণ্ডন ও নবতর তত্ত্ব সৃজনেই পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছে।

এখানে আরো একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ কার্যতঃ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদদেরকে প্রভাবিত করে আসছে। স্যার আইজ্যাক নিউটন বাইবেল এবং আলবার্ট আইনস্টাইন তৌরাহ্‌ থেকে অনেক তত্ব ও তথ্য খুঁজে নিতে পেরেছেন। অন্য দিকে আল-কোরআনের বয়ানের উপর দৃষ্টি দিলে সহজেই ‘ওহীর’ সক্রিয়তা পরিদৃষ্ট হয়, যেমন প্রত্যেক সূরায় নবীজীকে (দ.) লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, “আপনি বলুন, (কুল...)। আল-কোরআনের বয়ান শুরু থেকেই আজ পর্যন্ত অবিকৃতই থেকে গেছে এবং বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি এই গ্রন্থের বয়ানের যথার্থতাকে সর্বদা সপ্রমাণ করে চলেছে। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর দর্শন গ্রন্থ “বেলায়তে মোত্‌লাকা”র বিভিন্ন প্রসঙ্গে আল-কোরআন ও নবীজীর (দ.) দিবালোকসম যথার্থতার প্রতিই বিশ্বমানবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারাক্রমিকে সাধারণতঃ সরেন কিয়ার্কেগার্ডের পরে কার্ল মার্কসকে (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.) স্থান দেওয়া হয়। তাঁর সাথে স্থান পেয়েছেন তাঁর বন্ধু ও সহযোগী সাথী ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫ খ্রি.)। তাঁরা দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে বস্তুবাদকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে তাঁদের ভূমিকা ও প্রভাব মূলতঃ সমাজতাত্ত্বিক ও আর্থনীতিক। ইটালীয় রেনেসাঁ পরবর্তী যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি সমকালীন বিশ্বকে শোষণমূলক পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদ ও শোষকশ্রেণি নিয়ন্ত্রিত এক নবতর সমাজের দিকে ঠেলে দেয়। শোষণ বা মুদ্রা ব্যবসার বিরুদ্ধে হযরত ঈসা (আ.) অর্থাৎ যীশু খ্রিস্ট ছিলেন মারমুখিভাবে সোচ্চার। হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর ইসলাম সকল প্রকার শোষণ-পীড়নমুক্ত এক

বহুত্ববাদী-পালনবাদী-সমতাবাদী বিশ্ব মানবসমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যাভিসারী। সমকালীন ইউরোপে পুঁজিবাদী শোষণ ও উপনিবেশবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিকভাবে সোচ্চার হন কার্ল মার্কস ও তাঁর সাথীরা। শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের তত্ত্ব ও কর্মসূচিতে মুক্তির সূর্যের আলো দেখতে পান। যন্ত্রশিল্পোন্নত ইউরোপে সমকালে পুরোহিততন্ত্র বা গীর্জাতন্ত্র প্রবল প্রতাপে চেপে বসে। ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে রুটির পরিবর্তে পরিবেশন করা হতো বহু সুদৃশ্য সুবিশাল গির্জার ছবি। কার্ল মার্কস ও তাঁর সাথীরা দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে বস্তুবাদের নবতর ব্যাখ্যার পাশাপাশি, নব অভিজ্ঞতাবাদ (empirio criticism), ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রভৃতি দার্শনিক-সামাজিক চিন্তা-সড়ক নির্মাণ করেন। যীশু খ্রিস্টের সময়কাল থেকে আচরিত সামাজিক সমতা তথা সমাজতন্ত্রবাদকে তাঁরা পুঁজিবাদী শোষক সমাজের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁরা ধর্মের (religion) আবরণে পুরোহিততন্ত্রের চরম বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। আল-কোরআনে মানুষ ও তার বাস্তবজীবন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এখানে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, “ধর্ম” বা religion শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও সমাজতাত্ত্বিক ধারণার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারলে বহু গুরুতর প্রশ্নের জবাব পাওয়া সহজ হবে। ইংরেজি ‘রিলিজিয়ন’ শব্দের বঙ্গার্থ বুঝায় ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সন্ন্যাস-জীবন, বৈরাগ্যবাদ, ঈশ্বরনিষ্ঠতা, আশ্রমজীবন, ধর্মাচরণ (A.T.D.EV এবং বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রণীত ইংরেজি-বাংলা অভিধান)। তবে বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধানে ‘বিবেকের বিষয়, অবশ্য কর্তব্য’ শব্দ দুটোও দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদগণ প্রধানত বাইবেল ও তৌরাহ্ গ্রন্থোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষাপটে religion শব্দটার ধর্মতাত্ত্বিক, নৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনাও গ্রহণ করেছেন এবং ঐভাবে নিজেদের চিন্তা ও দর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

কিন্তু প্রাচ্যে ‘ধর্ম বা দ্বীন’ শব্দটা বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রকৃতি জগৎ, জৈবিক জগৎ, বৃক্ষ জগৎ, বস্তুজগৎ, মানব জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবস্থা/অবস্থান্তর/স্বতঃসিদ্ধ/অন্তর্জাত স্বভাব, গতি-প্রকৃতি অর্থাৎ ‘ফিত্‌রাত’ বুঝাতে এমনকি বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ধর্মদেশনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ ধর্ম বা দ্বীন শব্দের ৩৪টিরও বেশি অর্থ, মায়ানি বা

ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করেছেন। সংস্কৃত ‘ধৃ’ ধাতু থেকে উদ্ভুত শব্দ ‘ধর্ম’ এবং আল-কোরআনে ব্যবহৃত “দ্বীন” শব্দটা বাংলা ও আরবিতে প্রায় ১৩৭টা অর্থ বা বিষয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্ম বলতে রাজনীতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বিচার, শিক্ষা, আইনশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বস্তু কিম্বা প্রাণীর অন্তর্জাত প্রকৃতি বা ফিত্‌রাত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। উপনিষদ, মহাভারতের বিভিন্ন শ্লোকে এই অর্থেই ‘ধর্ম’ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী ‘দ্বীন’ শব্দ দ্বারাও জীবন বিধান, সু-নেতৃত্ব, সুবিচার, সততা, ন্যয়নীতিনিষ্ঠতা, ন্যায্যতা, সমতা, সমঅধিকার প্রভৃতি মানবিক চেতনা ও কর্মসমূহকে নির্দেশ করা হয়। ইটালীতে উদ্ভূত ইউরোপীয় এনলাইটেলমেন্টের সীমিত ধারণার অনুসরণে ধর্ম ও রাষ্ট্র, জীবনাচার প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ ধর্ম সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের সমাজতাত্ত্বিক অভিমতের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মার্কসের সব রচনা ছিল জার্মান ভাষায়, লেনিনের সব রচনা ছিল রুশ ভাষায়। এগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে গোড়া থেকেই ধর্মীয় কুসংস্কার, যাজকতন্ত্র প্রভৃতির সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে। বর্তমান একবিংশ শতকের শুরুতে একশ্রেণির আলোকিত আধুনিক বুদ্ধিজীবী অনুবাদগত এই বিভ্রান্তি চিহ্নিত করে তাঁদের রচনায় ব্যবহৃত religion শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট বিষয়াদি আলাদা করে চলেছেন।

[দ্বীন বা ধর্ম শব্দের বহুবিধ অর্থ ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করতে হলে মনীষী আবুল হাশিমের ঈৎববফ ড়ভ ওংষধস, প্রথম যুগের আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৯ইং) শামসুল হকের ‘বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম, আধুনিক গবেষক পিনাকী ভট্টাচার্যের ‘ধর্ম ও নাস্তিকতা বিষয়ে বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব, কাজী আবদুল ওদুদ-এর রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড: “হযরত মোহাম্মদ দ. ও ইসলাম এবং পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদ”, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৫ইং; লালন সঙ্গীতের (সংগ্রহ ও প্রকাশনা, দিলীপ বিশ্বাস, ঢাকা) ‘মারেফাত ও নূরে মোহাম্মদী’ বিষয়ক গানগুলো; বুখারী শরিফ [বঙ্গানুবাদঃ মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মওলানা আজিজুল হক, ঢাকা, ১৯৫৭ইং (১ম-৭ম খণ্ড]–এর হাদিসে কুদসীসহ বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য, হযরত ইমাম গাজ্জালীর (র.) ‘কিমিয়ায়ে সাআদাত’ (১ম-৪র্থ খণ্ড)-প্রভৃতি গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।]

এখানে আমাদের দর্শনীয় বিষয় এই যে, আল-কোরআন যাজকতন্ত্র বা পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কঠোর অবস্থান নিয়েছে (সূরা তওবার ৩৪নং আয়াতসহ অপরাপর আয়াত দ্রষ্টব্য), তা মার্কস ও তাঁর অনুসারীদের চেয়েও ঢের বেশি কঠোর। উপরন্তু, দাসপ্রথা, শ্রমদাস প্রথা, লগ্নি পুঁজিবাদী বা সুদনির্ভর অর্থব্যবস্থা, বর্ণবৈষম্য, বর্ণাশ্রম প্রথা প্রভৃতি অপ্রাকৃতিক সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক কঠোর অবস্থান রয়েছে আল কোরআন ও নবীজীর (দ.)। নবীজী হযরত মুহাম্মদকে (দ.) এবং তাঁর পূর্বে হযরত ঈসাকে (আ.) ঐ বিত্তবান সামাজিক শ্রেণিগুলো হেরেটিক ও প্যাগান (pagan) বলে অভিযুক্ত করে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। তবে এই অর্থ বিত্তবান শ্রেণিটা প্রত্যেক যুগে কোন কোন সময়ে মহারাজনৈতিক বিপর্যের শিকার হয়ে আসছে। তাদের মজবুত অর্থনৈতিক-সামাজিক বাস্তুভিটায় সমতাবাদী গৃহ নির্মাণ একশ্রেণির মানুষের সঙ্কীর্ণ ভোগ লিপ্সার কারণে বারে বারে ব্যাহত হচ্ছে। বেলায়তে মোত্লাকার দিশারী গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী একইভাবে সকল প্রকার যাজকতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, অসাম্য, শোষণ, অবিচার, অনাচার, ভোগসর্বস্ব পাশবিকতা প্রভৃতি অপ্রাকৃতিক অনাচারের বিরুদ্ধে কঠিনভাবে দণ্ডায়মান হয়ে নৈতিক বিজয়ের শিরোপায় শোভিত আছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে মানুষ ও তাদের পার্থিব জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কোরআনে মানুষ ও তার বাস্তব জীবন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারামত এই সব মহান মানবের বহু কষ্টার্জিত সম্পদ ও শক্তি। হযরত সাহেব কেবলার কারামত সম্পর্কে বলতে গিয়ে পুরো বিষয়টা খোলাসা করার লক্ষ্যেই দর্শন, তাসাওউফ, ভাববাদ, বস্তুবাদ প্রভৃতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, ভাববাদী কিম্বা বস্তুবাদী উভয় ধারার দার্শনিক-গুণীরা অনুমান নির্ভর জগতে বিচরণ করেন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম গাজ্জালীর চিন্তায় Vital realities-এর সাথে সম্পর্কহীন শব্দের যুদ্ধে পর্যবসিত। সকল নবী-রাসুল যেমন একেবারে আধুনিক বিশ্লেষণেও শ্রেণিহীন মানুষ হিসেবে উত্তীর্ণ; তেমনি তাঁরা লোক-দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক হিসেবেও সফল। নিরেট বাস্তববাদীতা তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মতো মহান ওলী-আল্লাহ্রা মূলতঃ লোক-দার্শনিকই বটেন। আল-কোরআনে বিবৃত হয়েছে: “তাদের অনেকেই শুধু অনুমানের তাবেদারী করছে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না

(১০:৩৬)। সত্য ত্যাগ করলে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি থাকে? (১০:৩২) [এ প্রসঙ্গে ৫৩:২৩, ২৮ আয়াত এবং ৪৯:১২ আয়তও দ্রষ্টব্য]। আল-কোরআনে অত্যন্ত দৃঢ়তাসহকারে সংশয়াতীতভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "আমি আসমান, জমিন এবং উহাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে অযথা সৃষ্টি করিনি। আর কেয়ামত অবশ্যই আসবে। আপনি ভদ্রাচিতভাবে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনার রব্ মহা স্রষ্টা মহাজ্ঞানী (১৫:৮৫–৮৬)।" "আসমান, জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে আমি তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি, যদি খেল-তামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো, তবে অবশ্যই আমার নিকটস্থ বস্তুকে নিয়েই আমি তা করতাম। যদি তা আমাকে করতেই হতো (২১:১৬–১৭)।" "আমি আসমান, জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। আমি এতদুভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বুঝে না (৪৪:৩৮-৩৯)।" "যে ব্যক্তি তার রব্ প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; সে কী তার ন্যায়, যার কাছে স্বীয় মন্দকর্মগুলো শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশির তাবেদারী করে (৪৭:১৪)।" "তারা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে (৪৭:১৬)।" "তবে এটাও আশ্চর্য নয় যে (হে দুর্বল ইমানদারগণ!) তোমরা ক্ষমা লাভ করলে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে (৪৭:২২)।" "নিশ্চয়ই দুনিয়ার হায়াত তো শুধুমাত্র ক্রীড়া-তামাশা (লায়েবুঁ ওয়া লাহ্‌ছুঁ)! (তবে) যদি তোমরা ইমান আনো, তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি যদি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ চাইতেন এবং তোমাদেরকে পীড়াপীড়ি করতেন, তবে তোমরা অবশ্যই বখিলী (কৃপণতা) করতে, আর তিনি তোমাদের অনীহা প্রকাশ করে দিতেন। দেখো, তোমরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (সবিলিল্লাহ্) ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকেই কার্পণ্য করছে। যারা কার্পণ্য করে, তারা তো নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, আর তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য কওমকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তারা তোমাদের মতো হবে না (৪৭: ৩৬-৩৮)।"

সমাজতাত্ত্বিক, আর্থনীতিক, ব্যবহারিক এসব বিষয়ে সম্যক আধুনিক সমীক্ষণবাদী তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য বাংলা ভাষায় হযরত সৈয়দ দেলাওর

হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ‘বেলায়তে মোত্‌লাকা’; ইংরেজি ভাষায় ড. খলিফা আবদুল হাকিমের ‘Islamic Ideology’ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রাথমিক সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

টীকা:

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড, কারামত, ই. ফা দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮ইং, পৃ. ৪৫৭।
২. মুর্শিদা গান: জসীম উদ্দীন, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ফোকলোর বিভাগ, ১৯৭৭ ইং।
৩. কাশফুল মাহযুব; হযরত আলী হাজবিরী ওরফে হযরত দাতা গঞ্জেবখ্‌শ (র.); অধ্যায়: ‘নবী পরিবারের ত্বরিকতের ইমাম।’
৪. জীবনী ও কেরামত, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
৫. প্র্যাগুক্ত ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
৬. জীবনী ও কেরামত, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
৭. বোখারী শরিফ
৮. আলোকধারা, ওফাত শত বার্ষিকী সংখ্যা, ২০০৬ খৃ. মোঃ মাহবুব উল আলম
৯. গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

হযরত কর্তৃক স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হইতে নিরাপদ রাখার আভাস ও অভয়দান

চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী জনৈক রেঙ্গুন পোস্ট অফিসের কেরানি। বক্তপুর নিবাসী মৌঃ মূফ্তী ফয়েজুল্লাহ্ সাহেবের বন্ধু তাহার সম্মুখে বর্ণনা দেন যে, "১৯৪১ ইংরেজী ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে জাপানী বোমা বর্ষণের পর আমরা বার্মা কামকাউটে চলিয়া যাই। আমাদের মনে নিতান্ত ভয়, কখন কি হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষে এক সন্ধ্যায় হযরতের কাছে আরজ করিয়া শুইয়াছি, তন্দ্রাযোগে দেখিতে পাই, একটি "জানাযা" অসিতেছে। আর লোকেরা বলাবলি করিতেছে, হযরত উমরের (রা.) জানাযা আসিতেছে। দেখিতেছি, জানাযাটি আনিয়া আমাদের ঘরের সামনেই রাখা হইয়াছে। আমি কাফন খুলিয়া দেখিলাম পীর হযরত সৈয়দ আহাম্মদ পেশেয়ারী সাহেবই রয়েছেন কাফন পরা জানাযায়। তাঁর মুর্দাটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আবিহ্ যো চট্গাম মে বোম্বারী হোঁয়া হ্যায়, উহ্ রওজা শরিফ ছে কেত্না দূর হ্যায়!' যেন তিনি ইঙ্গিত দিয়া মাইজভাণ্ডার হযরতের রওজা শরিফের কথা বলিলেন বলিয়া বুঝা গেল। আমি কত মাইল বলিলাম, এখন তাহা আমার স্মরণ হইতেছেনা।

ইহাতে আভাস পাওয়া গেল চট্টগ্রাম বোমা বর্ষণ হইলেও চট্টগ্রাম হযরতের রওজা শরিফের তোফাইলে চট্টগ্রাম শহরের কোন ক্ষতি করিতে পরিবে না। চট্টগ্রাম কোর্টের Public Prosecutor জনাব বদরুল হক খান সাহেব বর্ণনা করেন যে ১৯৪২ ইংরেজী ২৩শে ডিসেম্বর হঠাৎ চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের ফলে শহর হইতে লোকজন প্রায় চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি করি? উপায় নাই। সরকারী কোর্টের কাজ ছাড়িয়া কোনদিকে

যাইতে পারিতেছি না। শহরে থাকিতে বাধ্য। সর্বদা হযরতের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইতেছি। এক সন্ধ্যায় হযরতের কাছে মিনতি করিয়া শুইয়াছি; তন্দ্রায় দেখিতে পাইলাম, হযরত কোট-প্যান্ট পরিয়া ইউরোপীয়ানের পোষাকে আমার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিতেছেন, মিয়া! খওফ নেহী হ্যায়। দোষমন কো সমন্দর কে তরফ ভাগা দিয়া, কুছ্‌ খওফ নেহী হ্যায়।"

তখন থেকে আমি আশ্বস্ত হইয়া সাহস পাইলাম যে, হযরতের সুনজরে খোদায় আমাকে বিপদমুক্ত রাখিবেন। আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম যে, এই যুদ্ধে হযরত ইউরোপীয়ানকে সাহায্য করিতেছেন। নইলে তাহাদের পোষাকে হযরতকে দেখিতাম না। নিশ্চয় ইংরেজ যুদ্ধে জয় লাভ করিবে। এই আশাতে নির্ভয়ে শহরে রহিয়া গেলাম। ইংরেজ যুদ্ধে জয়লাভ করিল। আমি সম্পূর্ণ নিরাপদে রহিলাম।

হযরতের কালাম ও ক'বা মারফত প্রভাব বিস্তারে বিস্ময়কর কেরামত

হযরত আকদছ (ক.)-এর পৌত্র মৌলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা শাহ্‌জাদী মুনিরা খাতুন এক সময় ভীষণভাবে অতিশার জনিত টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। অনেক চিকিৎসায়ও বিফলে সকলের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। তাঁহার পিতা-মাতা জীবনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এমন সময় এক রাত্রে মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সাহেব কন্যার এই দুরারোগ্য অসুখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তিনি সাধারণ তন্দ্রায় দেখিতে পাইলেন, হযরত কেবলা সাহেব তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভয় দানে বলিতেছেন, "আমার হরিরী রঙ্গের ক'বা খানা তাঁহার বদনে ঢালিয়া দাও, ভাল হইয়া যাইবে।" ইহা দর্শনে হঠাৎ তিনি জাগিয়া বসিলেন এবং রওজা শরিফে আসিয়া তাঁহার পবিত্র ক'বা খানা তালাস করিয়া নিলেন। উহা তাঁহার গায়ের উপর চাপাইয়া দিলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পর দেখিতে পাইলেন, তাঁহার শরীরের ভীষণ উত্তাপ ঘর্ম দিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। আর তাহার কন্যা সাহেবা প্রায় শান্তভাবে কাতর অবস্থায় ঘুমাইতেছেন। ইহা দেখিয়া সকলের মনে আনন্দ আসিল। তারপর দিন হইতে দেখা গেল তিনি আরোগ্যের পথে। তিনি কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেলেন।

[অছিয়ে গাউসুল আযম প্রণিত ‘হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত’-এ ১০২টি কারামত এবং ‘বেলায়তে মোত্‌লাকা’য় ২টি কারামতের বিবরণ আছে।]

উপসংহার

উপসংহার

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর সময়কাল পর্যন্ত মানব সভ্যতার বিকাশের আল-কোরআন, হাদিস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা অর্থাৎ critical থিওরীর কষ্টিপাথরে যাচাইপূর্বক মানব-সমাজ শরীর থেকে দূষিত রক্ত পরিশোধনের জন্য যে সালসা রেখে গেছেন; তাঁর ভাষায় : "যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন, এই মোকামের লোক নিজ ধর্ম আচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। ইসলাম বিধান ধর্মের শেষ সংস্কার এবং কোরআনে পাক চির অবিকৃত ও রক্ষিত থাকায় ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত। কোরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্ম-ব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) মানবচরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক, যাহা তাঁহার বিভিন্ন হাদিস ও সুন্নত, আচরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম। লোক যেমন বাজারে যাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী সওদা করিবার অধিকার আছে, সেইরূপ মানবের বিচার-বুদ্ধির তারতম্যের দরুণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মমত বাছিয়া নিবারও অধিকার আছে এবং ইহার রেওয়াজও আছে। কাজেই ইহা অপরিবর্তনীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অপর ধর্মাবলম্বীরা সেই রূপ ধর্মমনন প্রকৃতির সঙ্গে আচার-ধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। মোসলেম বিধান ধর্মাচারীরা তদ্রূপ স্বার্থপর ধর্মবিরোধপন্থী লোকদের পাল্লায় পড়িয়া অর্থাৎ বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নিজ ও পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে।[১]

॥ ২ ॥

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইতিহাসের কোন তথ্য ধামাচাপা থাকেনা। নবীজীর (দ.) সময় থেকেই সুবিশাল রোমক, পারসিক প্রভৃতি জবরদস্ত শোষক-রাজতন্ত্র ও তাদের সেবাদাস যাজকতন্ত্র একযোগে সাধারণতন্ত্রী ইসলামের সততা-সমতা-শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানভিত্তিক নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ নস্যাৎ করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। হযরত ওমর ফারুকের (রা.) হত্যা, হযরত ওসমানের (রা.) হত্যা, হযরত আলীর (ক.) হত্যার পশ্চাতে এই মানবতাবিরোধী অপশক্তি ও তাদের সহযোগী ছদ্মবেশী মুনাফেক ষড়যন্ত্রকারীদের হাত ছিল। সমকালে সমাজ-চেতনার স্তর একটু উন্নত হতে পারলে এ ধরনের মানবতাবিরোধী অপকর্ম ঘটতে পারতোনা। কথিত ইটালীজ রেনেসাঁজাত শিল্প ও যান্ত্রিক অভিযাত্রার সাথে সাথে তাদের অনুগত বুদ্ধিবাজরা কোরআন ও ইসলামের মানবিক নীতিকেই প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে পায়। কিছু নগদ অর্থবাজীর ধান্ধাও এতে প্রকট। ১৬০০ খ্রি. থেকে ১৯০০ খ্রি. পর্যন্ত উপনিবেশবাদী শোষকরা নিজ নিজ রাজতান্ত্রিক সরকারি সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে মনগড়া, কাল্পনিক ইতিহাস ‘বয়ান’ করেছে। আল-কোরআন, নবীজীর (দ.) বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রচনা ও রটনা করেছে। কিন্তু কালের প্রবাহ সব মলিনতা ও নীচতাকে ধুয়ে-মুছে নিয়ে যায়। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনে ধর্ম-বিশ্বাস নির্বিশেষে সত্যসন্ধানীরা এসব আবর্জনা ও মিথ্যাচার উপড়ে ফেলার সাধনায় অবতীর্ণ।

তবু লিখিত ইতিহাসের সাথে কুৎসা ও বিভ্রান্তির সাথে জড়িত সমকালীন বৈদেশিক রাজকর্মচারী বুদ্ধিজীবী ভৃত্যদের অপচ্ছায়া সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। তাই তাঁদের লিখিত বই-পুস্তক সরল বিশ্বাসে গলাধঃকরণ না করে দ্বান্দ্বিক সমালোচনার নীতিতে নতুন করে বিশ্লেষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মানবতা, পৃথিবী, মানবজাতি ও শান্তির স্বার্থেই। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এককালীন প্রধান ডক্টর ওসমান গণীর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মহনাবী (দ.)’ [প্রথম প্রকাশনা, ১৯৮২] থেকে একটা বিতর্কিত পুস্তক তালিকা (প্রথম যুগ) মুদ্রিত হলোঃ

“(1) Boylis Gitical Dictionary. Art, ‘Mahomsbent’. (2) Remarkable Prophecy. John Megee 8th edition. (3) The

Accounts of Prophet in Lithgow’s Travels. (4) Sandy’s Teavels to Turkey. (5) Complete History of the Turks vol. II, Chap III, pp 96, 100, 1701. (6) Islamic - Library. (7) History of Magie, Nandacus, ch. XIV, 1657. (8) Weber's metrical Romance's, vol L vod II., 1810. (9) History of the Crusades, T. (10_ Archer, ch. v., p. 90. Strange and miraculaus News from. Turkey sent to our English (11) Ambassador. Tare news from Turkey, the Downfall of Mahomet’s Religion. (12) Prophecies of Christopher Kellerus et cto. (13) Great and Wonderful Prophecies. (14) The prophecies of A Turk concerning the Downfall of the Mahometanism. (15) A Great vision seen in Turkey land.

তাঁর ভাষায় এই বইগুলো ধর্ম-বিদ্বেষ ও জঘন্যতম মিথ্যার বিশ্বকোষ ছাড়া কিছুই নয়।

পরবর্তীকালে সত্যনিষ্ঠ পাশ্চাত্য বহু লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা মহানবী (দ.) সম্পর্কে সত্য বলতে, সত্য উদ্ধার করতে এবং অসত্যের প্রতিবাদ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি, যেমন– পি. কে হিট্টি. পিকথল প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের চেষ্টা হয়তো প্রথম দিকে সর্বত্র সফলতা অর্জন করতে পারেনি, তবুও বিশ্ব-মুসলমান চিরদিন এঁদের সাধু প্রচেষ্টার জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এই কতিপয় স্বনামধন্য লেখকের সত্যনিষ্ঠা ও সৎ সাহসের ফলেই ইসলাম ও মহানবী সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে শতাব্দীর পর শতাব্দীর মিথ্যা জালকে ছিন্ন করে রাজপথে দাঁড়ানোর শক্তি ও সম্মান লাভ করল। বাদবাকীরা প্রথম যুগের কষ্টকল্পিত লেখকদের মতো মিথ্যা জালে জড়িয়ে গেলেন। পূর্বোক্ত ১৫টি পুস্তকের পর ড. গনী চিহ্নিত আরো কিছু পুস্তক ও লেখকের নাম নিম্নে দেওয়া হলো:

(16) Mohamedis Impasture Imposture. W. Bedwell London, 1615. (17) Mahomet unmasked. W. Bed well London 1642. (18) Religion and Manners of Mohametan Joseph pitts, 1704. (19) The True Nature of the

Impasture. Dean prideaux, London 1718. (20) Life of Mahomet, Count Boulain Villiers. London, 1731. (21) Sales

Translation of the Koran. 1731. (22) Decline and Fall of the Roman Empire, E. Gibbon. London, 1771. (23) The Rise of Mahomet Accounted for N. Alcock, London, - 1976. (24) History of Mahomedanism. C. Mills. London 1817. (25) Mahomedanism unveiled. Rev. C.. Forster, London, 1 An Apology for the life of Mahomed G. Higgins, London, 1829. (26) History of Mahomedanism, W.C. Tyler, London, 1834. (27) Hero As Prophet. Thomas Carlyle, London 1840. (28) Life of Mahammed Rev. George Bush, New York, 1844. (29) Life of Mohammed. Abul Fada, translated by Rev. W. Murry. No. date. (30) Life of Mohamed. A Sprenger, Calcutta, 1851. (31) Life- of Mahomet Washington Issuing. London. 1850. (32) Life of Mahomet William Muir, London, 1858. (33) Imposture Instanced in the Life of Mahomed. Rev. G. Akehurst, London 1858. (34) Apology for Mahomed and the Quran. John Davenport, London, 1869. (35) Mahomed and Mahomedanism R. Bosworth Smith, London, 1874. (36) Notes on Mahomedanism. Rev. T.P Hughes, London, 1877. (37) Islam and its founder. J.W.H. Stobart. London, 1878. (38) Mahomed Budha and Chirst. Marcus Dods. London, 1878. (39) Mahomed D.S. Margoliuth, London, 1906. (40) Rise and Progress of Mahomedanism Dr. Henry stubbe, London. (41) Mahomedanism Dr. G.W. Leitner London. (42) Social structure of Islam: Ruben Lev.y, Cambridge 1955.

এছাড়াও আরো কিছু বই আছে, যেগুলো মিথ্যা ও অপবাদে পরিপূর্ণ। এই সমমত বইগুলোর একটিই উদ্দেশ্য ছিল, ইসলাম ও মহানবীকে যে কোন প্রকারেই হোক ছোট করা। কিন্তু অতীব দুর্ভাগ্যের কথা, মহাকালের কবলে তাঁরাই আজ নীচ ও হীন প্রতিপন্ন হচ্ছেন।"

এখানে একটা ঐতিহাসিক সত্য মনে রাখতে হবে যে, বিতর্কিত পুস্তকগুলোর প্রণেতারা ছিলেন রাজতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার খাদেম ও ভৃত্য। আর

আল-কোরআন, নবীজী (দ.) রাজতন্ত্র, সীজারতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, শক্তিতন্ত্রের সরাসরি বিরোধী।

তাঁদের এই অনেকটা অজ্ঞতাজনিত ঘৃণ্য মিথ্যাচারিতা ও কুৎসার বিরুদ্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, মৌলবী আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, বিখ্যাত তুলনামূলক দর্শনবেত্তা ড. খালিফা আবদুল হাকিম, খাজা গোলাম সরোয়ার, ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ (বাংলা ভাষায়) প্রমুখ সত্যনিষ্ঠ মনীষীরা যুক্তি ও তথ্যসিদ্ধ কলম ধরেন। এখন ঐসব মিথ্যা অপসৃত হচ্ছে দ্রুত। আল কোরআনে বলা হয়েছে : সত্যত্যাগ করলে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি থাকে (১০:৩২)। সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না (১০:৩৬)। তারা তো শুধু অনুমানেরই তাবেদারী করে এবং শুধু মিথ্যাই বলে (১০:৬৬)। তারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তির তাবেদারী করছে (৫৩:২৩)।

লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবীজী হযরত মুহাম্মদ (দ.) সম্পর্কে সেই সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। বিপক্ষীয়রা তাদের তূনে হেন কোন তীর নেই, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নোংরাভাবে তার প্রতি নিক্ষেপ করেনি। প্রতিপক্ষদের বাক্যবাণ বহু আগেই ভোঁতা হয়ে গেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রসারের পাশাপাশি নিত্য নতুনভাবে তাঁর মূল্যায়ন চলছে। প্রত্যেক যুগের মানুষ তাঁর জীবন-কর্ম-বাণী-উপদেশ থেকে নিজেদের সমাজে ও রাষ্ট্র উপকারীভাবে প্রয়োগযোগ্য দিশা আহরণ করে চলেছেন। একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, নবীজী (দ.) বিষয়ক যে কোন আলোচনা 'ইসলাম' সম্পর্কিত মূল্যায়নেই পর্যবসিত হয়। তেমন কিছু ঐতিহাসিক শাশ্বত তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

(ক) "এডোয়ার্ড মন্টেন্ট বলেন, ইসলাম ধর্মের নীতিগুলো জটিল সমস্যাবিহীন, সরল ও সহজে বোধগম্য। এ জন্যে এগুলো মানব হৃদয়ে স্থান লাভ করার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং বাস্তবিকই তা প্রত্যেক হিতাহিত জ্ঞান বিশিষ্ট মানব হৃদয়ে সহজেই অধিকার লাভ করে থাকে।"

(খ) "ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন ফারসী থেকে বঙ্গানুবাদকৃত তাঁর অমূল্য গ্রন্থ তাপসমালা"য় বলেন; স্বর্গ-নরক কয়েকটা বিষয়ের মতগত কুসংস্কার পরিত্যাগ

করিয়া তাঁহাদের (মুসলমানদের) সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঐক্য হইতে পারি, অন্যকোন জাতির সঙ্গে সেরূপ নয়; কেননা মুসলমানগণ অদ্বিতীয় নিরকার ঈশ্বরের উপাসক– কোনরূপ পৌত্তলিকতা বা অবতারবাদ ইত্যাদির সংশ্রব রাখেন না (তাপসমালার ভূমিকা)।

(গ) "সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞান তিমিরে সমাছন্ন ছিল, তখন আরব জাতি কেবল কোরআনের পবিত্র প্রভাবেই গ্রীস দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য জগতে দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও সঙ্গীত বিদ্যার প্রচার করেন। বিজ্ঞানযুগের বর্তমান উন্নতির মূলে কোরআনের প্রভাব যে অলক্ষিতভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।... সুখ, দুঃখ, প্রেম ও বীরত্ব যাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আজও আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে, তাহা প্রেরিত মহাপুরুষের (হযরত মুহাম্মদ (দ.) প্রচারকালে জীবমৃতমন্দ্রে বাজিয়া উঠিত এবং ধর্ম (ইসলাম) প্রচারে করুণ আহ্বান এবং কঠোর সততাই তাঁহার কেবলমাত্র সম্বল ছিল। ইহাতে তিনি পূর্ববর্তী ধর্ম প্রচারকদের কেবলমাত্র সমকক্ষ ছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ঈশ্বর বিশ্বাস এবং অলৌকিক মানব প্রেম অপরাপর সমস্ত ধর্মপ্রচারক অপেক্ষা অনেকাংশ উচ্চ ছিল। কোন প্রকার প্রেম সঙ্গীত, পার্থিব আনন্দ, বৈষয়িক গৌরব, জাতীয় বীরত্ব অথবা পূর্ব পুরুষগণের গৌরবকাহিনী প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা অথবা মৃত্যুর পর চিরবিলয়প্রাপ্ত অবস্থিতি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই্ তিনি কেবল মাত্র সনাতন এসলাম প্রচার করিয়াছিলেন উপরিস্থ আকাশ এবং নিম্নস্থ মর্ত্তদেশ বিদীর্ণ করিয়া স্বর্গ ও নরক, জীবন্ত ও মৃত ব্যক্তিগণের নামে শপথ করিয়া তিনি তাহার প্রচার করিয়াছিলেন (এমানুয়েল ডইচ-Emanuel Deutsch)"।

(ঘ) ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা প্রভাবেই পৌত্তলিকতা সমাচ্ছন্ন খ্রিস্টান জগতে মার্টিন লুথার 'ইউনিটারিয়ান প্রোটেস্টানিজম ধর্মের প্রবর্তন করেন। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা প্রভাবেই রাজা রামমোহন রায় ও কেশব চন্দ্র সেন ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন (The last days in England of the Raja Ram Mohan Roy: Edited by Mary Carpenter)।

(ঙ) 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র তাঁর 'মহাম্মদ চরিত' গ্রন্থে বলেন, সত্যের বলেই তিনি (মোহাম্মদ দ.) একাকী সহস্র শত্রু পরাজয় করিয়া গিয়াছেন। লোকে বলে তরবারি বলে মোসলমান ধর্ম জয়যুক্ত হইয়াছে। যখন মহম্মদ.. খোদেজার নিকট নিজের মর্মকথা প্রকাশ করেন, তখন তরবারি কোথায় ছিল? যখন কোরেশদিগের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় মোসলমানের বিশ্বাস ও বীর্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন তরবারি কোথায় ছিল? যখন দলে দলে লোক বিশ্বাসের জন্য স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া মরুভূমিতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগিল, তখন তরবারি কোথায় ছিল? যখন মদীনার লোক গভীর নিশিথে তাঁহার নিকট অমোঘ প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত হইয়াছিল, তখনই বা তরবারি কোথায় ছিল? বিশ্বাস বলে মোসলমান ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে বিশ্বাস বলে বলীয়ান হইয়াই মোসলমানগণ অন্তত শত্রু সাগরে সন্তরণ দিয়াছেন।

(চ) হযরত মোহাম্মদ (দ.) তথা ইসলামের প্রভাবেই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে পৃথিবী সাম্য, সুবিচার, সাধারণতন্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, স্বাধীন চিন্তার (rationalism and free thinking) নব অভিযাত্রা শুরু হয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রোমের পোপকে ঈশ্বর জ্ঞান করে তার উপাসনা শুরু হয়, জ্ঞান চর্চা মাত্রই যখন ইউরোপে রাজবিদ্রোহিতা বলিয়া পরিগণিত হতো তখন ইসলামের আলো ঐ জনগোষ্ঠীকে জ্ঞানের পথ দেখায় (পণ্ডিত গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ, ডিএসসি মহাশয় আল-কোরআন, নবীজী (দ.)। তাঁর আদর্শ ও সংগ্রাম সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন (নব ভারত পত্রিকা, ১১শ খণ্ড, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা অগ্রহায়ন ও পৌষ)।[৩]

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কয়েকজন মনীষীর মূল্যায়নঃ

(ক) উদ্দেশ্যের মহত্ব, উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা, যদি এই তিনটি বিষয়ই মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য কোন মহামানবকে এনে মোহাম্মদের (দ.) সাথে তুলনা করার সাহস কার আছে?...দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইনপ্রণেতা, যোদ্ধা, মতবাদ বিজয়ী, যুক্তিসঙ্গত ধর্মমতের প্রবর্তক, কুড়িটা পার্থিব সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম রাজ্যের

প্রতিষ্ঠাতা এই মোহাম্মদ (দ.)। মানুষের মহত্বও শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করার যতগুলি মাপকাঠি আছে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেই সবগুলো, যাচাই করলে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কে আছে?[৪]

(খ) "মোহাম্মদ (দ.) ছিলেন, সাম্যের ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের পয়গম্বর"(স্বামী বিবেকানন্দ)।

(গ) ইসলামের আসন অর্জিত হয়েছিল তরবারি দ্বারা নয়, তা ছিল নবীর সরলতা, সম্পূর্ণ অহম বিলোপ, চুক্তির প্রতি সম্মান, বন্ধু ও অনুসারীদের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তাঁর নির্ভীকতা (মহাত্মা গান্ধী)।

(ঘ) "অন্ধকারে তিনি ছিলেন আলো। তাঁর জীবন এতো মহৎ আর খাঁটি যে, আমরা অনুভব করতে পারি তাঁর চার পাশের মানুষের কাছে মহাপ্রভুর বাণী বাহক হিসেবে তাঁকে পছন্দ করার মধ্যে (এ্যানী বেসান্ত)।

(ঙ) মোহাম্মদ (দ.) তাঁর পূর্বের যে কোন নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য (কমরেড এম এন রায়)।

(চ) কলিকাতা বসবাসকালে রামমোহন হযরত মোহাম্মদের (দ.) এক জীবনী লিখিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওই সংকল্প কাজে পরিণত করিতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে বন্ধু এ্যাডামকে তিনি বলিয়াছিলেন, মোহাম্মদের (দ.) গোঁড়া ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী শত্রু এবং সমালোচকগণ কেউই এই মহাপুরুষের প্রতি সুবিচার করেননি। মোহাম্মদের (দ.) প্রকৃত মাহাত্ম্য সম্পর্কে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল জীবনী রচনার উদ্দেশ্য (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধর্মের নব যুগ)।

(ছ) "স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী নবীর কিছু বাণীর যে সংকলন করেছেন, আমি তা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়েছি ও উপকৃত হয়েছি। এগুলো শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং গোটা মানবজাতির অন্যতম রত্ন ভাণ্ডার"– মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, ২৪ মার্চ, ১৯৩৮ইং কলিকাতা।

(জ) "মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন,
"এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই" কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির দীনবেশ নিল যে জন,
বাদশা ফকির এক শামিল করিল যে জন,

এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি কলরোলে।
–কাজী নজরুল ইসলাম

(ঝ) "আমি সব সময়েই হযরত মোহাম্মদের (দ.) ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য জীবনী শক্তির কারণে উচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করে চলেছি। এটা প্রত্যেক যুগের জন্য যুগোপযোগী ধর্ম।... মোহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করছি যে; আগামী দিনে তা গ্রহণীয় হবে, যেমন আজকের ইউরোপের কাছে তা গ্রহণীয় হতে শুরু করেছে। মধ্যযুগীয় পাদ্রীগণ হয় অজ্ঞতা, নয় গোঁড়ামির মাধ্যমে তাঁকে কালো রঙে রঞ্জিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ছিলেন মানুষ মোহাম্মদ ও তাঁর ধর্মকে ঘৃণা করার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁদের কাছে মোহাম্মদ ছিলেন খ্রিস্ট-বিরোধী! আমি তাঁকে, এই সুন্দর মানুষটাকে অধ্যয়ন করেছি। আমার মতে, তাঁকে খ্রিস্ট-বিরোধী বলা তো দূরের কথা, অবশ্যই মানবতার ত্রাণকারী বলতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মতো কোনো ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের এক নায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি এমন এক অজ্ঞাত উপায়ে এর সমস্যা সমাধানে উপনীত হতেন, যা পৃথিবীতে আনতে পারতো বহু আকাংখিত সুখ ও শান্তি (জর্জ বার্নাডশ, ১৯২৯ইং)।

(ঞ) Prof. Snouck Hurgronje তাঁর *The Moslem World of Today* পুস্তকে বলেন:
"The idea of a league of Human Races has indeed been approached by Islam more nearly than by any other: for the league of nations founded on the basis of Mohammed's religion takes the principle of the equality of all human seriously as to put other communities to shame."
races so

(ট) Mr. Gibb Zuvi Whither Islam cy¯Í‡K e‡jb: Islam has still the power to reconcile apparently irreconcilable elements of race and tradition. If ever the opposition of the great societies of the East and the West is to be replaced by co-operation, the mediation of Islam is an indispensable condition.

(ঠ) স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর East and West in Religion গ্রন্থে বলেন:

“We cannot deny that the conception of brotherhood in Islam transcends all barriers of race and nationality, a feature which does not characterize any other religion."

(ত) Sir Thomas Arnold বলেন:

“Islam which claims the allegiance of seven hundred million souls is the only solution for all the ills of the world. ...For it is in Islam only that the idea of a real material league of nations has been approached in the right and practicable way.”

(ঢ) “খেলাফতে রব্বানী বা খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব” সচেতনতাপুষ্ঠ রবুবিয়ত বা সার্বজনীন পালনবাদী নীতির অনুশীলনস্থল মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে এসেছিলেন চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট Mr. Macanangi ১৯৫৮ খৃ. ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার হযরত সাহেব কেবলার ৫২তম ওরস শরিফে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরো তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞ অতিথি। মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে তাঁরা ইসলাম-এর বহুত্ববাদী সহমর্মিতামূলক সহাবস্থানের সামাজিক শোভা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, “আমরা বাংলাদেশে আসিয়া মাইজভাণ্ডার সম্বন্ধে বহু বিরূপ আলোচনা শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, মাইজভাণ্ডার সব কিছু”।.. মাইজভাণ্ডার ও হিন্দুস্থানের আজমীর সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য আমরা আমাদের ধর্মীয় মিশনের পক্ষ হইতে আগমন করিয়াছি। আশা করি, এই সম্বন্ধে একটি সঠিক তথ্য উপহার দিতে সমর্থ হইব, যাহার ফলে উৎসুক মানব সন্তান-সন্ততির জানিবার আগ্রহ পূরণ হইবে এবং বেলায়ত সম্বন্ধে অবহিত হইবার সুযোগ পাইবে; যাহা আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম কনফারেন্সে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। তৎপরবর্তী বৎসর ২৩-১-১৯৫৯ইং তাং একজন আমেরিকান সম্মানিত অতিথি রবার্ট ফাউলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন:- I am extremely hapPz to have been a guest in the home of the religious leader and to view the activities of a great festival as is taking place. We are appreciative of your wonderful hospitability.

Sd. Robert w. Fowler.

J.C.A. Agricultural Advisre 23.10.1959

খাদেমুল ফোক্বারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীঃ বেলায়তে মোত্লাকা (আলোকধারা বুক্স, প্রথম প্রকাশ, ২০২১ খৃ.)

No view of the modern world is complete without an understanding of Islam. To understand Islam, we must understand Muhammad –as prophet and man . More is known about Muhammad's life than that of the founder of any other major faith, yet his story is frequently misunderstood even deliberately distorted.

_Sunday Times, London.

(চ) বর্তমান শতাব্দীর বিশ্ব স্বীকৃত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ Karen Armstrong তাঁর সুপ্রসিদ্ধ MUHAMMAD : PROPHET FOR OUR TIME (Great Britain, 2006) গ্রন্থে বলেন, Most Muslims point to the extraordinary pluralism of the Qur'an, which condemns aggression and sees all rightly guided religions as deriving from the one God. We have a long history of Islamophobia in Western culture that dates back to the time of the Crusades. In the twelfth century, Christian monks in Europe insisted that Islam was a violent religion of the sword, and that Muhammad was a charlatan who imposed his religion on a reluctant world by force of arms; they called him a lecher and a sexual pervert. This distorted version of the Prophet's life became one of the received ideas of the West, and Western people have always found it difficult to see Muhammad in a more objective light. Since the destruction of the World Trade Center on September II, 2001, members of the Christian Right in the United States

and some sectors of the Western media have continued this tradition of hostility, claiming that Muhammad was irredeemably addicted to war. Some have gone so far as to claim that he was a terrorist and a pedophile.

We can no longer afford to indulge this type of bigotry, because it is a gift to extremists who can use such statements to "prove" that the Western world is indeed engaged on a new crusade against the Islamic world. Muhammad was not a man of violence. We must approach his life in a balanced way, in order to appreciate his considerable achievements. To cultivate an inaccurate prejudice damages the tolerance, liberality, and compassion that are supposed to characterize Western culture... Paradoxically, Muhammad became a timeless personality because he was so rooted in his own period. We cannot understand his achievement unless we appreciate what he was up against. In order to see what he can contribute to our own predicament, we must enter the tragic world that made him a prophet nearly fourteen hundred years ago, on a lonely mountain top just outside the holy city of Mecca... Unless Western civilization intellectually and socially, politically and economically, and the Christian church theologically, can learn to treat other men with fundamental respect, these two in their turn will have failed to come to terms with the actualities of the twentieth century. The problems raised in this are, of course, as profound as anything that we have touched on for Islam.

The brief history of the twenty-first century shows that neither side has mastered these lessons. If we are to avoid catastrophe, the Muslim and Western worlds must learn not merely to tolerate but to appreciate one another. A good place to start is with the figure of Muhammad: a complex man, who resists facile, ideologically-driven categorization, who sometimes did things that were difficult or impossible for us to accept, but who had profound genius and founded a religion and cultural tradition that was not based on the sword but whose name "Islam"-signified peace and reconciliation.

(থ) ডেনমার্ক পার্লামেন্টে ১০-১২-২০২৩ ইং পাশকৃত এক আইনে সেই দেশে পবিত্র কোরআন পোড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়।

(দ) "মোহাম্মদ (দ.)-এর যতো সমালোচনাই করা যায়, সমস্ত সমালোচনাই তাঁর প্রশংসায় পরিণত হয় (স্টেনলী লেনপুল)।

এ ধরনের হাজারো প্রশংসা সূচক অভিমত সমগ্র বিশ্বের সকল স্বীকৃত মনীষীদের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) যথাযথই বলেছেন, "কোরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্মব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক, যাহা তাঁহার বিভিন্ন হাদিস ও সুন্নত আচরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম (বেলায়তে মোত্লাকা; দশম পরিচ্ছেদ)। উপরোক্ত মনীষীবৃন্দসহ অসংখ্য সুধীজনের অভিমত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র এই হক্কুল ইয়াকিন বা ধ্রুব সত্যেরই প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রেভারেন্ড চার্লস ফরস্টার তাঁর The Historical Geography of Arabia (আরবের ঐতিহাসিক ভূগোল), জার্মান প্রাচ্যবিদ থিওডর নোলডেকি, ভিলহেম আহ্লওয়ার্ড, স্কটিশ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম রবার্টসন স্মিথ প্রমুখ গবেষণার নামে আন্দাজী ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে ফরাসী প্রাচ্যবিদ সেন্ট হেলপার তাঁদের এসব তথ্য নিয়ে উপহাসও করেছেন। অতীত অমূলক কুৎসা ও কল্পনাশ্রয়ী বিবরণকে সম্বল করে যে ক'জন ব্যক্তি নোংরামীর নিম্নতম স্তরে পতিত হয়েছেন; ডি. এস. মার্গোলিয়াথও তাঁদের দলে রয়েছেন। ড. সুলাইমান নদভি 'আল-কোরআনের ভৌগলিক ইতিহাস' গ্রন্থে (যা ইংরেজি, আরবি ভাষায় অনুবাদিত হয়ে বিশ্বময় স্বীকৃতি ও আস্থা অর্জন করেছে) উপরোক্ত কল্পনাশ্রয়ী রচনাবলীর অসারতা সপ্রমাণ করেছেন।

এখন দরকার যথার্থ ইতিহাস চর্চার। উপরোক্ত গ্রন্থাবলী রচনার সময়ে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কব্জায় ছিল। আর তখন ঐসব অঞ্চল আল-কোরআন ভিত্তিক রবুবিয়াত বা পালনবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাক-কোরআন যুগের রাজতান্ত্রিক তথা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন

ছিল। সুতরাং, আদর্শগতভাবে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ক্ষমতার দ্বন্দ্বই ছিল প্রধান। আরো একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইতিহাস বিশ্লেষণের যে মানদণ্ড ইবনে খালদুনের সময় থেকে নির্মিত হচ্ছিল, তা কার্ল মার্কসের সমাজ বিজ্ঞান সূত্রানুযায়ী শুরু হয়, 'বৈষয়িকভাবে হাজির থাকা সামাজিক কালপর্ব বিচার থেকে।' ঐসব গ্রন্থকার ঐ সূত্র এড়িয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন ইউরোপী ঔপনিবেশিক শক্তির মেধাবী আমলাও। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, অধিকৃত ও শাসিত অঞ্চলের গরিষ্ঠ মানসে হীনমন্যতা সৃষ্টি করা এবং প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক সহায়তায় তাঁরা তাতে সফলও হয়েছেন। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, ছিলনা। ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে মধ্য-পশ্চিম এশিয়া-আফ্রিকায় দুর্বর গতিতে চলেছে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিকৃতির অভিযান। অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, সময়োপযোগী শিক্ষার অভাবের ভারে মুসলিম সমাজ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে এগিয়ে যেতে পারেনি। এখন সময় বদলেছে। পশ্চিমা বিশ্বসহ প্রাচ্যে মানুষের সামাজিক ধ্যান-ধারণায় সত্য ও তথ্যনিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। পূর্বোক্ত গ্রন্থকারদের বিভ্রান্তি, কুৎসা ও অপপ্রচারের বিচ্যুতি, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অজ্ঞতা, অহেতুক দোষ-ত্রুটির বানোয়াট কাহিনীগুলো বাস্তবতার কাছে হার মানছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বৃটিশ তথা পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের 'স্বর্ণযুগে' এবং ক্ষেত্র বিশেষে 'তুর্কী সালতানাত', ভারতসহ বিভিন্ন স্থানে সচেতন বিদ্বান মুসলিমদের সত্যনিষ্ঠ প্রতিবাদী উত্থানকে সাংস্কৃতিকভাবে দুর্বল করার জন্য এক ধরনের মতলবী 'কল্পকথা' রচিত হয়। এরা এমনকি মোহাম্মদ (দ.)-এর নামটিও ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে লিখেছে। যদিও 'মোহাম্মদীজম' বলে কোন শব্দ নেই তবুও বিভ্রান্তি, ঘৃণা ও পরিকল্পিত হীনমন্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এ শব্দ বানিয়েছেন। অথচ 'মোহাম্মদীজম' বলে কিছু নেই, ছিলও না' যা ছিল ও আছে, সেই শব্দটা হচ্ছে 'ইসলাম' এবং এই একটা মাত্র শব্দের মধ্যে একটি গণমুখী-কল্যাণমুখী আদর্শ এবং বাস্তবায়নের রূপরেখা সরলভাবে প্রোথিত ও বিকশিত। স্টেনলী লেনপুল-এর ঐ ঐতিহাসিক উক্তিই অনির্বাণ : **মোহাম্মদ (দ.)-এর সব সমালোচনাই তাঁর প্রশংসায় পরিণত হয়**।

আল-কোরআনের পালনবাদী-মানবতাবাদী তথা রব্বানিয়াত-রবুবিয়াত আদর্শবাদী নবতর মানব সমাজ বিনির্মাণের সুবাতাস বইছে বিশ্বে। পাশ্চাত্যের

একশ্রেণির নির্মোহ গবেষক এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। মুসলিম জাহানের মেধাবী পরিশ্রমী গবেষকদের উচিৎ এই সত্যান্বেষী সাধনায় শরীক হওয়া। পশ্চিমের বর্তমান জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব মানুষে-মানুষে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। পালনবাদী দর্শন মানুষকে অভিন্ন একক জাতিতে পরিণত করে। দার্শনিকভাবে চিন্তাজগতে খণ্ডিত কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ তাত্ত্বিকভাবে ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যাত। পালনবাদ আল-কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী মারণাস্ত্র নির্মাণের বিরোধী। অভাবমুক্ত অবস্থায় মানুষ যাতে মানুষের মতো বাঁচার পরিবেশ পায়, সেটাই পালনবাদের মূলবাণী। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তও এটাই চায়।

সমাপ্ত

টীকা:

১. বেলায়তে মোত্‌লাকা, দশম পরিচ্ছেদ
২. ইবিড
৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদের ‘ক’ থেকে ‘চ’ পর্যন্ত উদ্ধৃতিগুলোর বিস্তারিত জানার জন্য দষ্টব্য : এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, খন্দেকার গোলাম আহমদ, ১৩৪৮ বাংলা, কলিকাতা।
৪. দি হোলি প্রফেট, আলফ্রোড দ্য লা মার্টিন, ফ্রান্স।

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN 978-984-8083-35-2